নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

ইস্পাত

নিকোলাই অস্ত্রভস্কি
ইস্পাত
১

নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

উপন্যাস

প্রথম ভাগ

'রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

অনুবাদ: রবীন্দ্র মজুমদার
সম্পাদনা: অরুণ সোম
অঙ্গসজ্জা: মেদাত কাগারোভ

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Роман

Книга первая

На языке бенгали

NIKOLAI OSTROVSKY

HOW THE STEEL WAS TEMPERED

A Novel

Part One

In Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

$О\frac{4702010200—097}{031(05)—86}$ 092—86

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000723-2
ISBN 5-05-000724-0

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি এবং পাভেল করচাগিন

কোন কোন জীবৎকালে মহা-মহা কীর্তিকলাপ সাধিত হয়। আবার গোটা জীবনই একটা মহাকীর্তি, এমনও হয়। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক এবং এই বইখানির লেখক নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির (১৯০৪—১৯৩৬) জীবন ছিল এমনই। জীবনের শেষ বারো বছর গুরুতর অসুস্থ এবং শেষ আট বছর অন্ধ অবস্থায় থেকে তিনি মারা যান বত্রিশ বছর বয়সে।

তবু, যথার্থ অমর উত্তরাধিকারই তিনি রেখে গেছেন। পুরুষের পর পুরুষ নওজোয়ানের দিশারী আলোক হয়ে রয়েছে তাঁর 'ইস্পাত'।

নিযুত-নিযুতখানা ছাপা হয়েছে এই বইয়ের, বইখানি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পরিচিত। ১৯৩৭ সালে বইখানি ইংরেজী ভাষায় তরজমা হলে লণ্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয় স্তম্ভে এই তরুণ লেখক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, এই উপন্যাস লেখা আরম্ভ করার আগে থেকেই তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী এবং অন্ধ। উপন্যাসখানি বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক; তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মারা গেছেন। ঐ পুস্তক-পরিচয়দাতা লিখেছিলেন, নতুন রাশিয়ার তরুণ বীর-নায়ক পাভেল করচাগিনের পূর্ণাঙ্গ

আলেখ্য তুলে ধরেছেন অস্ত্রভ্স্কি; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুনর্গঠনের কালপর্যায়ের পটভূমিতে তিনি এঁকেছেন এই আলেখ্যখানি। পটভূমি খুবই বাস্তবতাসম্মত, প্রধান চরিত্রটি প্রত্যয়জনক, সমগ্র কাহিনীটিই এক-ফালি বাস্তব জীবন, — খুব জোরালোভাবে, পরমোৎকৃষ্ট রুচিবোধ আর সূক্ষ্ম নাটকীয়তাবোধ অনুসারে সেটাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির উপন্যাসখানি সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। আমরা আশা রাখি, এই নতুন বাংলা সংস্করণটি আরও বহু নতুন পাঠক-পাঠিকার সমাদর পাবে।

অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন: 'বীরত্ব জন্মে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, আর কঠোর অবস্থার ভিতর দিয়ে তার পরীক্ষা হয়।'

তাঁর নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনে কঠোর অবস্থা আর সংগ্রাম এসেছে নিরন্তর...

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে এই লেখকের বয়স ছিল মাত্র তের বছর, তবু কঠোর শ্রম আর দারিদ্র্যের অর্থটা তাঁর জানা ছিল তার আগেই। একটা রেল-স্টেশনের রেস্তোরাঁয় তাঁকে কাজ করতে হত দিনে বার-চোদ্দ ঘণ্টা, সরু আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ভারি-ভারি সামোভার তুলতে-নামাতে হত, চুল্লিতে জ্বালানি যোগানের কাজ করতে হত, বিজলি মিস্ত্রিকে সাহায্য করতে হত।

পনর বছর বয়সে তিনি গৃহযুদ্ধে লড়তে নেমেছিলেন। পরে, কিয়েভ রেলওয়ে মেরামতী কারখানা এবং রেলপথ নির্মাণের কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, নদীতে কাঠ ভাসিয়েও তিনি কাজ করেছিলেন।

অস্ত্রভ্স্কি ইউক্রেনে একজন উৎসাহী কমসমোল সংগঠক ছিলেন। যে-কোন কাজে তিনি হাত দিতেন তাতে তিনি ঢেলে দিতেন নিজের অন্তর-মন।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখা গেল সেটা মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগ। বাল্যে অপুষ্টি আর মাত্রাতিরিক্ত শ্রম, গৃহযুদ্ধের ফ্রন্টে জখম, দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনঃসংস্থাপনের কাজে তাঁর অতিমানুষিক পরিশ্রম — এই সবেরই ফল হল ঐ রোগ। এই সাহসী যোদ্ধা সহসা দেখতে পেলেন তিনি অচল — সারা দেশ তখন পুনরুজ্জীবনের সৃজনী আগুনে উদ্দীপ্ত। নওজোয়ানেরা

তখন সামনের সারিগুলিতে — দেশের নতুন নতুন সম্পদ আর নতুন জীবন গড়ার কাজে তারা ব্যাপৃত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা সেরা ক্লিনিকে সেরা সেরা ডাক্তারেরা অস্ত্রভ্স্কির চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু রোগের অবস্থা ছিল চিকিৎসার অসাধ্য। এই তরুণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে গেল, তারপরে গেল দৃষ্টিশক্তিও। রোগই জিতে গেল — রোগ তাঁকে যোদ্ধাশ্রেণী থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর 'শয্যা-সমাধি' অবধারিত করে দিল।

কী করবেন তিনি তখন? বেঁচে থাকবেন কী ভাবে? ঐভাবে কি বেঁচে থাকা যায়?

তাঁর বইয়ের নায়ক পাভেল করচাগিনের সামনে এল এই সব মর্মান্তিক প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের উত্তর বের করবার জন্য চলল অস্ত্রভ্স্কির অতি কষ্টকর প্রচেষ্টা।

'সংগ্রাম করার ক্ষমতাকেই সে জীবনে সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছে, সেই ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে বসার পর আর বেঁচে রইবে কিসের জন্যে? আজকের আর নিরানন্দ আগামীকালের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তিটা কী? কী দিয়ে ভরে তুলবে সে তার দিনগুলোকে? টিকে রইবে শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আর পান-আহার করবার জন্যে? কমরেডরা সব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে যাবে?'

উদ্ধার পাবার একটা চিন্তা এল: আত্মহনন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি দৃঢ়ভাবে সেই উপায়কে বাতিল করলেন: 'জীবন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কি করে বাঁচতে হয় সেটা শেখো। জীবনটাকে কাজে লাগাও।'

১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অতি নিদারুণ শেষ আঘাত হয়ে এল সম্পূর্ণ অন্ধতা — তখন অস্ত্রভ্স্কি তাঁর বন্ধু পিওৎর্ নভিকভের কাছে চিঠিতে লিখে-ছিলেন:

'নিজের জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার একটা পরিকল্পনা আমার আছে, — নিজ অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্যে সেটা দরকার। পরিকল্পনাটা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। পরিকল্পনাটা যদি কিছু নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে তখন তোমাকে এ বিষয়ে আরও কিছু জানাব।

'...শয্যাশায়ী হলেও আমি অসুস্থ নই। ওসব ভুল। এক-গাদা বাজে কথা। আমি

একদম সুস্থ। আমার পা চলে না, দেখতে পাই নে ছাই কিছুই — সবই একটা নিদারুণ ভুল...'

একেবারে বীরত্ব দিয়েই লেখা এই চিঠিখানা সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষি — মৃত্যু তখন দংষ্ট্রাকরাল-হাসিমুখে তাঁর পাশেই সমুপবিষ্ট। রোগ আরও ছড়িয়েই পড়ছিল, ডাক্তারেরা রোগটাকে শায়েস্তা করতে অক্ষম। আর কখনও তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না, ভোরের আলোয় তাঁর চোখ মেলবে না আর কখনও। তাহলে কী উপায় !

তিনি উঠে দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে হেঁটে এসে যাবেন সোজা জীবনের মাঝখানে — নিজের বইখানির পৃষ্ঠাগুলি থেকে।

পরবর্তী পুরুষের কাছে অস্ত্রভ্স্কি কী বলতে চান সেটা তাঁর জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। বিপ্লবের এক যোদ্ধা, তাঁকে কখনও জোর করে পিছু হঠানো যায় না — তাঁরই জবানবন্দি হবে সেটা।

প্রথমে তাঁকে সাহায্য করবার মতো কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রী কাজে যেতেন সকালে, আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে। অসাড় আঙুলগুলো দিয়ে পেন্সিল চেপে ধরে অস্ত্রভ্স্কি অতি কষ্টে একটা-একটা করে অক্ষর ফুটিয়ে তুলতেন, কিন্তু প্রায়ই এক-একটা পঙ্ক্তি তার আগেরটার উপর পড়ে দুটো পঙ্ক্তিই দুষ্পাঠ্য হয়ে যেত।

তবে হাতখানাকে দিশা দেবার জন্য একটা খাঁজকাটা বোর্ডের ব্যবস্থা হল শিগগিরই। একটা মামুলী পিজবোর্ডের ফাইল থেকে তৈরি এই জিনিসটা ছিল সহজ-সরল। ফাইলটার উপরের পাল্লা থেকে সমান্তরালভাবে ৮ মিলিমিটার চওড়া ফালি-ফালি কেটে নেওয়া হয়েছিল — তখন ফাইলটার ভিতরে একখণ্ড কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া হলে তিনি 'কশি'গুলো বরাবর লিখে যেতে পারতেন।

অস্ত্রভ্স্কি লিখতেন সাধারণত রাত্রে — যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত। তাঁর স্ত্রী কিংবা মা পঁচিশ-ত্রিশ খণ্ড কাগজ ফাইলে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেন, আর সরু করে কাটা কয়েকটা পেন্সিল রেখে যেতেন বিছানার পাশে। সাধারণত তিনি রাতারাতি সমস্ত কাগজই লিখে ফেলতেন। তখন তাঁর পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকে কেউ পাঠোদ্ধার করে সেই লেখা টাইপ করে দিত।

'এই বইয়ের কাজই হয়ে উঠেছে আমার সমগ্র জীবন,' অস্ত্রভ্স্কি লিখেছিলেন

এক বন্ধুর কাছে। 'কাজ ধরেছি 'রাতের শিফটে', ভোরে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রে সব খুব শান্ত, কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই। আমার সামনে ঘটনার পর ঘটনা উঠে আসে, যেন ফিল্মের মতো, মনশ্চক্ষে আবার ফুটে ওঠে কত যে ছবি আর গোটা দৃশ্য...'

সেই ভয়ঙ্কর বছরগুলোতে অস্ত্রভ্স্কিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল তাঁর অদম্য মনোবল, সংকল্পের দৃঢ়তা আর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি।

'ইস্পাত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

তার পরে — মস্কো, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাস। অস্ত্রভ্স্কি সবে সোচি থেকে রাজধানীতে এসেছেন। সোভিয়েত সাহিত্যক্ষেত্রে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি লেনিন অর্ডার পেয়েছেন। 'ঝঞ্ঝায় উদ্ভব' নামে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখা শুরু করেছেন তিনি।

কেটে-যাওয়া সময়ের মাঝে ফিরে গিয়ে ৪০ নং গোর্কি স্ট্রীটে লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে আমরা ঢুকলাম।

অস্ত্রভ্স্কি শুয়ে আছেন, তাঁর গায়ের নিচের দিকটা কম্বলে ঢাকা। তাঁর একটা টান-টান ভাব। এ মন কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না — তারই অনুপ্রাণিত অভিব্যক্তি তাঁর মুখে। তাঁর উঁচু কপালখানায় ডাইনের ভ্রূর উপরে একটা ছোট খাঁজ — একটা পুরন জখমের দাগ। কোটরগত চোখদুটো একেবারে খোলা — মনে হয় যেন তিনি দেখতে পান। গায়ে একটা খাকি শার্ট। তাঁর বুকে এঁটে দেওয়া হল লেনিন অর্ডার।

...কামরাটায় আবছা আলো। রাস্তার আওয়াজ আটকাবার জন্য বড় জানলাটায় ভারি পর্দা টানা।

বিছানার উপরে দেয়ালে লেনিনের প্রতিকৃতি। আসবাব সাদাসিধে। একটা ডেস্ক, একখানা চামড়া-বাঁধানো কৌচ, একটা পিয়ানো, একটা বইয়ের শেল্ফ, আঁরি বারবুস্যের একটা আবক্ষ মূর্তি।

কামরাটায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকবার সময়ে শোনা গেল তরুণ বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রীতি-সম্ভাষণ। নিজের পাশে বসতে বলে অস্ত্রভ্স্কি বাড়িয়ে দিলেন বাঁ হাতখানা। তাঁর কবজিতে কিছু চলনশক্তি অবশিষ্ট আছে। ক্ষীণভাবে তিনি হাতে

চাপ দেন, যতক্ষণ থাকা হয় তিনি হাত ছাড়েন না। বেশ বোঝা যায় এই হাত-আঁকড়ে-থাকা, আর যেভাবে তিনি মাঝে মাঝে হাতে হঠাৎ একটা অস্থির চাপ দেন, সেটা একটা সেতুর মতো, মানুষটি কেমন সেটা বুঝতে তাঁর সুবিধে হয় ঐ সূত্র দিয়ে।

তাঁর পাশে যত বেশি সময় বসে থাকা যায়, মানুষটির সাংঘাতিক রোগের কথা মনে আসে ততই কম। তাঁর কথাবার্তায়, তাঁর অনুপ্রাণিত চিন্তার দ্রুত সঞ্চরণে কোথায়ও অশক্তের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। তিনি বলতে থাকেন, 'যখন চোখ বুঁজি', তখন মনেই হয় না ঐ চোখদুটি বুঁজে আছে কত বছর হয়ে গেল। তিনি বলেন, 'ফ্লুর এই ভীষণ উৎপাত', মনে হয় আর কোন কষ্টই তাঁর নেই। তাঁর কথার ধরনধারন এই রকমের — 'এখন পড়ছি', 'এখন লিখছি', 'ভাবছি যাবো...', 'মহাফেজখানায় গিয়ে দেখব', 'কংগ্রেসের জন্যে আমার বক্তৃতা তৈরি করছি'।

তিনি শুয়ে রয়েছেন, তাঁর রোগে মৃত্যু নিশ্চিত — কিন্তু তাঁর থেকে বিকীর্ণ হয় এমন আমেজ আর কর্মোদ্যোগ যাতে করুণা-সমবেদনার বদলে এই চমৎকার যোদ্ধার জন্য বিপুল গর্ববোধই আসে।

লেখক এবং তাঁর সৃষ্টি করা চরিত্রগুলির মধ্যে সাধারণত একটা পার্থক্য টেনে দেখা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু লেখক এবং তাঁর নায়ক অভিন্ন, উভয়ে একই জীবনের ভাগীদার, তাঁদের প্রকৃতির ইস্পাত পোড় খেয়ে মজবুত হয়ে উঠেছে একই আগুনে।

অস্ত্রভ্স্কির বইয়ে বর্ণিত সময় এবং ঘটনাবলি এখন অতীতের বস্তু, তবু আমাদেরই এ যুগের বীর-নায়ক হয়ে রয়েছেন পাভেল করচাগিন।

তাঁর প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই কিসের জন্য ?

প্রথমত, সেটা হল জীবনের সেই 'সুড়ঙ্গগুলো' দিয়ে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলার ক্ষমতা, — সেগুলোর বর্ণনা করেছিলেন মহান ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর এক তরুণ বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে: 'তোমার মতো বয়সে আমার উপর ধাক্কা এসেছিল মাত্রা ছাড়িয়েই। তেমনটা ঘটলে নিজের মনে বলো (আমার এই উপলব্ধি এসেছিল অনেক পরে — গোটা জীবৎকালের অভিজ্ঞতার ফলে) ওগুলি রাস্তা পারাপারের সুড়ঙ্গের মতো: ওগুলোর ভিতর দিয়ে পার হওয়াটা অবধারিত, সেটা আমাদের

করতেই হবে — কেননা, সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে বেরিয়ে পাওয়া যায় ঝলমলে রোদ আর তাজা হাওয়া... অন্তরে বলিষ্ঠতা নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলাই প্রধান জিনিস।'

আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সুড়ঙ্গগুলো: গতকালের, আজকের, আগামীকালের। সেগুলোর ভিতর দিয়ে পার হবার জন্য চাই সাহস। তাতে আনুকূল্য পাওয়া যায় অস্ত্রভ্স্কি-করচাগিনের কাছ থেকে।

অস্ত্রভ্স্কি কিংবা তাঁর নায়ককে ঘিরে নেই কোন অলৌকিক মহিমা, তাঁরা দু'জনেই খুবই মানুষের মতো।

নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ আর ভুলভ্রান্তির ষোল-আনা অর্থই জানা ছিল শেপেতোভ্কার এই কালো-চোখ ছেলেটি পাভেল করচাগিনের।

নিজের জীবনের সারমর্মটি ফুটিয়ে তুলে সে একবার বলেছিল, লড়াইগুলোকে তার এড়িয়ে যেতে হয় নি, তীব্র সংগ্রামের মধ্যে সে পেয়েছিল নিজের জায়গাটি, বিপ্লবের লাল পতাকায় রয়েছে তারও কয়েক ফোঁটা রক্ত, এজন্য সে আনন্দিত।

করচাগিন যে ভাব-ধারণা থেকে প্রেরণা পেয়েছে তার পরাক্রমের মধ্যেই তার শক্তি নিহিত।

বহুবার আমি আলাপ করেছি 'আসল করচাগিনের' সঙ্গে। একদিন তিনি বলেছিলেন:

'আত্মসর্বস্ব মানুষ শেষ হয়ে যায় সবার আগে। তার অস্তিত্ব কেবল তার নিজেরই জন্যে, তার 'আমি'টা ঘা খেলেই তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু, সমাজের স্বার্থের ভাগীদার হয় যে-জন, যে-জন তার ভাগ্যকে মিলিয়ে দেয় মানুষ-ভাইদের সঙ্গে, তাকে চূর্ণ করা যায় না সহজে... সৈন্যশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে যে সৈনিক প্রাণ দেয়, তার কমরেডরা এগিয়ে চলেছে এটাই যার সর্বশেষ সচেতন অনুভূতি, সে পায় চূড়ান্ত আর পরিপূর্ণ তৃপ্তি।'

১৯৩৬ সালে মারা যাবার স্বল্পকাল আগে সোচিতে অস্ত্রভ্স্কির সঙ্গে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্ল্' পত্রিকার সংবাদদাতার একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ফ্যাশিবাদ, যুদ্ধ এবং আগামী বিজয় সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ চলেছিল। এই সংবাদদাতা বলেছিলেন, বহু বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাতাদি হয়েছে, তবু এই সাক্ষাৎকারের কথা, কিংবা এর থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা তিনি কখনও ভুলবেন না।

'আপনি অত্যন্ত সাহসী,' বলেছিলেন এই সংবাদদাতা। 'কমিউনিজমে বিশ্বাস থেকেই আপনি পান এই সাহস, নয় কি?'

'ঠিক,' উত্তরে অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন, 'আরও পাই সুখ।'

করচাগিনের জীবনকাহিনী থেকে প্রত্যয়জনকভাবেই প্রমাণিত হয় যে, মহৎ লক্ষ্য থাকলে, একমাত্র তবেই মানুষের জীবন মহৎ হয়ে উঠতে পারে।

করচাগিনকে, এই সাধারণ মেহনতী তরুণটিকে যথার্থ মহৎ করে তুলেছে ঐ মহৎ লক্ষ্যই।

যা হতে পারত সেটা নয়, যা ছিল বাস্তব জীবনে তারই কথা লিখেছেন অস্ত্রভ্স্কি। নিজেরই জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর বইখানি; আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব সেটা যদি সম্ভব হয়ে উঠে থাকে, সেটা লেখকের কল্পনার দরুন নয়, সেটা হয়েছে জীবনেরই ফলে, বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করেছে এমনসব মানুষ যারা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। অস্ত্রভ্স্কি না লিখে পারেন নি — তিনি জানতেন সেটাই ছিল তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে একমাত্র যুক্তি।

রূঢ় এবং যথার্থ বাস্তবতা নিয়েই তাঁর এই বইখানি।

রোমাঁ রোলাঁ এই লেখক সম্বন্ধে বলেছেন: 'বিপ্লবের যুগের শিল্পকলার মহত্তম সৃষ্টি হল এই বিপ্লব থেকে উদ্ভূত মানুষগুলি। এমনই একজন হলেন নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি।'

সেমিয়ন ত্রেগুব

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

'তোমাদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দেবার জন্যে ইস্টারের ছুটির আগে আমার বাড়ি এসেছিলে, তারা উঠে দাঁড়াও!'

কথাটা যিনি বললেন, মোটাসোটা তাঁর দেহের ওপর পাদ্রীর আলখাল্লা-পরা, গলায় ঝুলছে একটা ভারি ক্রুশ। তাঁর তীব্র চোখের চাউনিতে গোটা ক্লাস-ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল আর তাঁর ছোট ছোট চোখের কঠিন দৃষ্টি যেন তাদের ভেতর পর্যন্ত কুরে নিল। যে চারটি ছেলে দু'টি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এরা আশঙ্কার চোখে তাকাল আলখাল্লা-পরা লোকটির দিকে।

'তোমরা বসো,' বললেন পাদ্রীমশাই মেয়ে দু'টির দিকে হাত নেড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল তারা।

ফাদার ভাসিলির চেরা-চোখের দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হল বাকি চারজনের ওপর।

'তোরা এদিকে আয় দিকি, বাছাধনরা আমার!' চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার ভাসিলি, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো-সড়ো হয়ে দাঁড়ানো ছেলেগুলির দিকে।

'তোদের এই ক'জন গুণ্ডা চ্যাংড়ার মধ্যে কে বিড়ি খাস?'

'বিড়ি আমরা খাই না, ফাদার,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল চারজন।

লাল হয়ে উঠল ফাদার ভাসিলির মুখ।

'বিড়ি খাস্ না, না? শয়তান! আমার কেক্-এর জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় তাহলে তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল কে? দেখছি এখুনি — বিড়ি খাস্ কিনা। দেখি, পকেটগুলো তোদের উল্টে দেখা! কই, যা বলছি কর! উল্টে দেখা পকেটগুলো!'

তিনজন তাদের পকেট থেকে জিনিসপত্র বের করে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল। পাদ্রীমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলাইয়ের ভাঁজগুলো পরীক্ষা করলেন তামাকের গুঁড়ো পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু না পেয়ে তিনি তাকালেন চার-নম্বর ছেলেটির দিকে। কালো-চোখ কিশোর, ধূসর রঙের শার্ট গায়ে, নীল পাৎলুনের হাঁটুর কাছটায় পটি মেরে সেলাই করা।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন পুতুলের মতো?'

প্রশ্নকর্তার দিকে একটা চাপা ঘৃণার দৃষ্টি হেনে রুষ্ট গলায় ছেলেটি বলল, 'আমার পকেট নেই।'

'পকেট নেই, না? আচ্ছা! এমন শয়তানি করে কে আমার কেক্-এর জন্যে তৈরি ময়দা নষ্ট করে দিয়েছিল সেদিন, ভেবেছিস — জানি নে আমি! এবারও তোকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? না হে বাছাধন, মজাটা টের পাইয়ে দেব এবার। গতবারে তোর মা এসে কাকুতি-মিনতি করাতেই তোকে ইস্কুলে রেখেছিলাম। কিন্তু এবারে আর পার পাবি নে। যা, বেরিয়ে যা!' নির্মমভাবে ছেলেটার কান মুচ্ড়ে ধরে ফাদার ভাসিলি তাকে হিঁচড়ে করিডরে ঠেলে দিয়ে জোরে বন্ধ করে দিলেন ক্লাস-ঘরের দরজাটা।

নিস্তব্ধ, সন্ত্রস্ত ক্লাস-ঘর। কেন পাভেল করচাগিনকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তা একমাত্র পাভেলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সের্গেই ব্রুঝাক ছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউই বুঝে উঠতে পারল না। সে-ই দেখেছিল পাভেলকে ফাদার ভাসিলির রান্নাঘরে গিয়ে ইস্টার-ভোজের কেক্-এর জন্য মেখে-রাখা ময়দায় একমুঠো ঘরে-তৈরি তামাক গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে। ওরা ছ'জন ক্লাসের পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ে, তখন ফাদার ভাসিলির কাছে আরেকবার পরীক্ষা দেবার জন্য গিয়ে তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিল সেই রান্নাঘরে।

স্কুল-বাড়ির দেউড়ির শেষ ধাপটায় এসে বসল বিতাড়িত পাভেল। বিষণ্ন মনে ভাবছিল, মা তার মুখে ঘটনাটা শুনে কী বলবে। গরিব মা তার, আবগারি-দারোগার বাড়িতে রাঁধুনির কাজে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

কান্নায় গলা বুজে এল পাভেলের।

'কী করি এখন ? এই হতভাগা পাদ্রীটার জন্যেই এই কাণ্ড। কেক্-এর ময়দায় তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দেবার দুর্বুদ্ধিটা যে কোথা থেকে এসে ভর করেছিল মাথায়! মতলবটা জুগিয়েছিল সেরিওঝ্কাই। বলেছিল, 'আয়, বুড়ো ঘাগীটাকে একটু জব্দ করি,' আর তাই করেছিলাম। এখন কিনা সেরিওঝাটা পার পেয়ে গেল আর আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হবে হয়তো!'

ফাদার ভার্সিলির সঙ্গে তার শত্রুতা অনেকদিনের। যেদিন মিশ্‌কা লেভচুকভ-এর সঙ্গে মারামারি করার শাস্তি হিসেবে পাভেলকে লাঞ্চ খেতে না দিয়ে স্কুলে আটকে রাখা হয়, ব্যাপারটার শুরু সেদিন থেকেই। খালি ক্লাস-ঘরে যাতে সে দুষ্টুমি করতে না পারে, তার জন্য মাস্টারমশাই তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ক্লাস-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। পেছনের একটা জায়গায় বসেছিল পাভেল। কালো কোর্তাগায়ে, হাড়জিরজিরে, ছোটখাটো মাস্টারমশাইটি তখন পৃথিবী আর গ্রহতারকা সম্বন্ধে বলছিলেন। পৃথিবীর বয়স কোটি কোটি বছর আর তারাগুলো সব এক-একটা পৃথিবীর মতোই — একথা শুনে তো পাভেলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল অবাক বিস্ময়ে। শুনতে শুনতে পাভেলের এতোই চমক লেগে গিয়েছিল যে আর-একটু হলেই সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলে ফেলেছিল আর-কি, 'কিন্তু বাইবেলে তো তা বলে না!' কিন্তু পাছে আরও কিছু শাস্তি কপালে জোটে এই ভয়ে সে কিছু বলে নি।

পাদ্রীমশাই বাইবেলের পরীক্ষায় তাকে বরাবর পুরো নম্বর দিয়ে এসেছেন। প্রার্থনার শ্লোকগুলো পাভেলের প্রায় সবই মুখস্থ, বাইবেলের পূর্বভাগ আর উত্তরভাগও তাই। সপ্তাহের কোন্ দিনে ঈশ্বর কোন্ কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন সেসব ঠিকঠাক জানা আছে তার। ফাদার ভার্সিলির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করবে বলে সে মনে মনে ঠিক করল। পরের ক্লাসেই — পাদ্রীমশাইয়ের জুৎ করে চেয়ারে বসামাত্রই — পাভেল হাত তুলল। বলবার অনুমতি পেয়েই সে উঠে দাঁড়াল, 'ফাদার, ওপরের ক্লাসে মাস্টারমশাই বলছিলেন, পৃথিবীর নাকি কোটি কোটি বছর বয়েস। কিন্তু বাইবেলে তো বলে পাঁচ হাজা...' ফাদার ভার্সিলির কর্কশ চিৎকারে কথা বন্ধ হয়ে গেল তার।

'কী বললি রে শয়তান ? এই বুঝি তোর বাইবেল শেখা হচ্ছে!'

কী যে ব্যাপারটা ঘটল, তা ভাল করে বুঝবার আগেই পাদ্রীমশাই পাভেলের কান ধরে দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে দিতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে ভয়ে আর যন্ত্রণায় অস্থির পাভেল দেখতে পেল যে সে করিডরে দাঁড়িয়ে আছে।

তার মাও সেবার তাকে খুব বকাঝকা করেছিল।

পরের দিন সে গিয়ে ফাদার ভার্সিলিকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল পাভেলকে

স্কুলে ফিরিয়ে নিতে। সেই দিন থেকে পাভেল মনেপ্রাণে পাদ্রীকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে আর ভয় করে। যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার কিশোর-হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে — তা সে অন্যায় যতোই সামান্য হোক না কেন। বিনা কারণে এই মার খাবার জন্য সে পাদ্রীমশাইকে ক্ষমা করতে পারে নি। ফলে, তিত-বিরক্ত হয়ে উঠল তার মন।

তারপর থেকে ফাদার ভার্সিলির কাছ থেকে পাভেল নানান লাঞ্ছনা ভোগ করে আসছে। সর্বদাই তাকে ক্লাস-ঘর থেকে বের করে দিতেন পাদ্রীমশাই। যৎসামান্য ত্রুটির জন্য তাকে তিনি ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেন দিনের পর দিন, সপ্তাহ-ভর। কখনও তাকে পড়া জিজ্ঞেস করেন না। তার ফলে, ইস্টারের ছুটির আগের দিন ক্লাসের লেখাপড়ায় পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের সঙ্গে পাভেলকে পাদ্রীমশাইয়ের বাড়ি যেতে হয়েছিল পরীক্ষা দেবার জন্য। সেখানেই সেদিন রান্নাঘরে গিয়ে সে কেক তৈরির জন্য মেখে-রাখা ময়দায় তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল।

ব্যাপারটা কেউ দেখে নি, তবু পাদ্রীটা ঠিক ধরেছেন দোষটা কার।

...শেষ পর্যন্ত ক্লাস শেষ হল, ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল বাইরের আঙিনায়, ভিড় জমিয়ে তুলল পাভেলকে ঘিরে। পাভেল বিষণ্ণ আর গম্ভীর। সেরিওঝা ব্রুঝাক শুধু পেছনে থেকে গিয়েছিল ক্লাস-ঘরে। তার মনে হচ্ছিল সেও অপরাধী, কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করার মতো তার কিছু করবার নেই।

মাস্টারমশাইদের ঘরের খোলা জানলাটার ফাঁকে হেডমাস্টার এফ্রেম ভার্সিলিয়েভিচ তাঁর মাথাটা বের করে হাঁক দিলেন, 'করচাগিনকে এখুনি পাঠিয়ে দাও আমার কাছে!'

চমকে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল হেডমাস্টারের জলদ্-গম্ভীর স্বরে। তারপরে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল হুকুম তামিল করতে।

* * *

রেল-স্টেশনের রেস্তোরাঁর মালিক, ফ্যাকাসে আর মধ্যবয়সী লোকটা তার নিষ্প্রভ বিবর্ণ চোখ তুলে একটু দেখে নিল পাভেলকে।

'বয়স কতো এর ?'

'বারো,' মা বলল।

'বেশ, থাকুক এখানে। মাসে আট রুবল আর কাজের দিনে খেতে পাবে। একদিন-অন্তর এক-নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কিন্তু ছিঁচ্কেমি চলবে না, মনে থাকে যেন।'

'আজ্ঞে না, কর্তা, চুরিচামারি করবে না ও। সেজন্যে আমি দায়ী থাকলাম,' মা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল ভয়ে ভয়ে।

'আজ থেকেই কাজে লাগুক,' হুকুম দিল রেস্তোরাঁর মালিক। তার পাশেই কাউণ্টারের পেছনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বলল, 'জিনা, ছেলেটাকে বাসন ধোবার ঘরে নিয়ে যাও। ফ্রসিয়াকে বলো, গ্রিশ্‌কার জায়গায় একে কাজে লাগাতে।'

কাউণ্টারের মেয়েটা হ্যাম কাটা ছেড়ে ছুরিটা নামিয়ে রেখে পাভেলের দিকে মাথা নেড়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেল হলঘর পার হয়ে একপাশের একটা দরজার দিকে — সেই দরজার ওধারে থালা-বাটি ধোওয়া-মাজা-রাখা হয়। পাভেল চলল তার পিছু-পিছু। তার মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কানে কানে বলল, 'দেখিস্, পাভ্‌লুশ্‌কা, লক্ষ্মী ছেলে, ভাল করে কাজ করিস বাবা। নিন্দের ভাগী হোস্ নে।'

বিষণ্ন চোখে মা তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে, তারপর চলে এল।

বাসনপত্তর ধোবার ঘরে পুরোদমে কাজ চলছিল। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে থালা, কাঁটাচামচ, ছুরি। জনকতক মেয়ে কাঁধে ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে সেগুলো মুছে নিচ্ছে।

পাভেলের চেয়ে একটু বড়ো, ঝাঁটার মতো ঝাঁকড়া আর লাল চুলওলা একটি ছেলে তদ্বির করছিল দুটো বিরাট সামোভারের।

একটা বড়ো পাত্রে জল ফুটছে, তারই মধ্যে ডিশ্‌গুলো ধোওয়া হচ্ছে আর বাষ্পে ভরে গেছে বাসনপত্তর ধোবার ঘরটা। প্রথমে তাই পাভেল মেয়েদের মুখগুলো দেখতে পায় নি। অনিশ্চিতভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ — কেউ তাকে বলে দেবে কী করতে হবে না-হবে, তারই অপেক্ষায়।

ডিশ-ধোওয়া একটি মেয়ের কাছে গিয়ে কাউণ্টারের মেয়ে জিনা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এই যে, ফ্রসিয়া, গ্রিশ্‌কার জায়গায় এই নতুন ছেলেটিকে নেওয়া হল। কী করতে হবে ওকে বলে দাও।' তারপর, সে ফ্রসিয়া বলে যাকে ডেকেছিল, তাকে দেখিয়ে পাভেলকে বলল, 'ও এখানকার কাজকর্ম চালায়। কী করতে হবে তা ওই তোমাকে বলে দেবে।' বলেই জিনা ঘুরে চলে গেল খাবার হল-ঘরে।

'আচ্ছা,' মৃদু গলায় বলে পাভেল প্রশ্নভরা চোখে তাকাল ফ্রসিয়ার দিকে। কপালের ঘাম মুছে ফ্রসিয়া তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল — যাচাই করে নিল মনে মনে। তারপর কনুইয়ের ওপর পড়া জামার হাতাটা গুটিয়ে নিয়ে গভীর আর আশ্চর্যরকম মিষ্টি গলায় বলল, 'কাজটা বিশেষ কিছু না, খোকা, কিন্তু খাটতে হবে তোমায় সমস্তক্ষণ। সকালবেলায় গরম করতে হবে ওই তামার পাত্তরটা, সমস্তক্ষণ গরম রাখতে হবে ওটাকে যাতে সবসময় ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। তাছাড়া, কাঠ কেটে রাখতে হবে, সামোভারগুলোরও তদ্বির করতে হবে। কাঁটাচামচ আর ছুরিগুলো মাঝে মাঝে তোমায় মেজে দিতে হবে, এঁটোকাঁটাগুলো আর নোংরা জল বাইরে ফেলে আসতে

হবে। অনেক কিছুই করতে হবে, খোকা!' ফ্রসিয়ার উচ্চারণের ভঙ্গিটা স্পষ্ট কস্ত্রমা অঞ্চলের লোকদের মতো, 'আ'-কারগুলো টানা-টানা। তার কথা বলার ভঙ্গি, লাল হয়ে ওঠা মুখ, ছোট অল্প-বোঁচা নাক সব মিলিয়ে পাভেলের একটু ভাল লাগল।

'মাসিটি দিব্যি কিন্তু,' সিদ্ধান্ত করল পাভেল। তারপর লজ্জা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করতে হবে আমায়, মাসি ?'

বলেই সে থতমত খেয়ে গেল। কথাটা শুনে এক দমক উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল — ডিশ-ধোওয়া মেয়েরা।

'ও মা! ফ্রসিয়া এক বোন-পো জুটিয়ে এনেছে, দ্যাখ্...'

সবচেয়ে বেশি মন-খুলে হাসল ফ্রসিয়া নিজে। ঘন বাষ্পের জন্য পাভেল লক্ষ্য করে নি যে, ফ্রসিয়া অল্পবয়সী মেয়ে — আঠারো বছরের বেশি তার বয়েস নয়।

ঘাবড়ে গিয়ে পাভেল সেই ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে আমায় এখন ?'

ছেলেটা শুধু চাপা হেসে বলল, 'মাসিকে জিজ্ঞেস করো, বলে দেবে সব। আমি চলি।' বলেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের দিককার দরজাটা দিয়ে।

ডিশ ধুচ্ছিল যারা, তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মেয়ে ডাক দিল, 'এদিকে এসো, কাঁটাগুলো মুছে ফেলতে হাত লাগাও।' অন্যদের ধমক দিয়ে বলল, 'হাসাহাসি বন্ধ করো। এমন কিছু হাসির কথা বলে নি ছেলেটা। এই যে, এটা নাও,' পাভেলের দিকে একটা ডিশ-মোছার তোয়ালে এগিয়ে দিল সে। 'একটা দিক দাঁতে চেপে অন্য দিকটা টান করে ধরো। এই নাও একটা কাঁটা, কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে তোয়ালেটা ঢুকিয়ে চালাচালি করে নাও। দেখো, যেন ময়লা-টয়লা লেগে না থাকে। এ ব্যাপারে এখানে এদের বড়ো কড়া নজর, খদ্দেররা সবসময় কাঁটাগুলো পরখ করে দেখে — এক কণা ময়লা পেলেই দারুণ গণ্ডগোল বাধাবে আর গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবেন এক মুহূর্তে।'

'গিন্নি ?' পাভেল প্রতিধ্বনি করল, 'আমাকে কাজে লাগাল যে কর্তা, তাকেই তো মালিক বলে ভেবেছিলাম।'

হেসে উঠল মেয়েটা, 'না রে খোকা, কর্তাটি এখানে শুধু ঘর-সাজানো আসবাব গোছের। আসল মালিক হলেন গিন্নিটি। আজ এখানে নেই। দু'দিন কাজ করো এখানে, নিজেই সব দেখতে পাবে।'

বাসন-ধোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ময়লা ডিশে স্তূপীকৃত বারকোশগুলো নিয়ে তিনজন ওয়েটার ঢুকল। তাদের মধ্যে কাঁধ-চওড়া, ট্যারা-চোখে, বড় চৌকা মুখ আর ভারি-চোয়াল লোকটি বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করো বরং! বারোটার

গাড়ি যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে আর এদিকে তোমরা কি-না নিট্‌পিট্‌ লাগিয়েছ।'

পাভেলকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

'ও নতুন লাগল কাজে,' বলল ফ্রসিয়া।

'নতুন কাজে লাগল বুঝি? বেশ, শোনো খোকা।' পাভেলের কাঁধে ভারি হাতটা দিয়ে তাকে সামোভারগুলোর দিকে ঠেলে নিয়ে এসে বলল, 'এই দুটো যাতে সবসময় ফুটতে থাকে—সেদিকে নজর রাখা তোমার কাজ। এই দেখো, একটা গেছে নিভে, আরেকটাও নিভন্ত। আজকের মতো আর কিছু বলব না, কিন্তু যদি ফের এরকমটা হয়, তাহলে মেরে বদন বিগড়ে দেব কিন্তু!'

একটাও কথা না বলে পাভেল সামোভারগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল।

তার মেহনতের জীবন আরম্ভ হল এইভাবে। প্রথম এই দিনটির মতো আর কোনদিন পাভেল এতো খাটে নি। এটুকু বুঝেছিল যে এটা বাড়ি নয় যেখানে মা-র কথা না শুনলেও পার পেয়ে যাবে। কথামতো কাজ না করলে যে মার খেতে হবে—সেটা ওই ট্যারা-চোখ ওয়েটারটা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল।

চিম্‌নির মুখে উঁচু বুটজোড়ার একটা ধরে হাপরের মতো চালিয়ে দিল পাভেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট-মোটা বড়ো বড়ো সামোভারদুটোর মধ্যে থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুতে থাকল। ময়লা জলের পাত্রটা তুলে নিয়ে ছুটল জঞ্জাল ফেলার জায়গাটার দিকে। জল ফোটার পাত্রটার নিচে জ্বালানি কাঠ গুঁজে দিল। ডিশ-মোছার ভিজে তোয়ালেগুলো গরম সামোভারদুটোর গায়ে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিল। এক কথায়, যা যা করতে বলা হল, সবই করল। সেদিন অনেক রাত্রে ক্লান্ত পাভেল ঢুকল গিয়ে নিচে, রান্নাঘরে। তার পেছনে বন্ধ হয়ে আসা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ডিশ-ধোয়া মেয়েদের মধ্যে সেই মধ্যবয়সী আনিসিয়া মন্তব্য করল, 'অদ্ভুত ছেলেটা। দেখেছ কেমন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। ওকে কাজে লাগাবার বিশেষ কোন কারণ আছে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, ছোঁড়াটা কাজের বটে,' বলল ফ্রসিয়া, 'তাড়া দিতে হয় না।'

'শিগগিরই মিইয়ে আসবে,' মত প্রকাশ করল লুশা, 'প্রথম প্রথম সবাই খুব খাটে...'

একটা গোটা রাত্রি না ঘুমিয়ে অনবরত ছুটোছুটি করে কাজ করার পর, পরের দিন সকাল সাতটায় অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে পাভেল ফুটন্ত সামোভারদুটো জিম্মা করে দিল তার জায়গায় যে-ছেলেটি কাজে এসেছে তার কাছে।

গোলগাল-মুখ এই ছেলেটার চাউনিতে একটা স্পর্ধা। ফুটন্ত সামোভারদুটোকে পরখ করে সব ঠিক আছে দেখে নিশ্চিত হবার পর সে তার পকেটে হাতদুটো

ঢুকিয়ে নিয়ে উপরওয়ালার মতো অবজ্ঞা-মেশানো ভঙ্গিতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলল। বর্ণহীন চোখে পাভেলকে বিঁধে ঝগড়াটে গলায় বলল, 'আচ্ছা, শোন হে পোঁটা-নাক ছোঁড়া, কাল ঠিক ছ'টায় কাজে হাজির থাকা চাই, বুঝলে?'

'ছ'টায় কেন?' জিজ্ঞেস করল পাভেল, 'কাজের সময়-বদলি হয় তো সাতটায়, নাকি?'

'কাজ-বদলির সময় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ছ'টায় হাজির থাকবে। বেশি বকবক করবি তো মেরে মুখের চেহারা পালটে দেব। আস্পর্ধা দেখ না! আজই কাজে লেগে এর মধ্যেই কিনা ওস্তাদি মারতে লেগেছে।'

ডিশ-ধোওয়া মেয়েদের যাদের সবে কাজের সময় শেষ হয়েছে, তারা কৌতূহলের সঙ্গে এই দুটি ছেলের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুনছিল। ওই ছেলেটার নির্লজ্জ কথার ধরন আর বেয়াড়াপনায় রেগে গেল পাভেল। প্রতিপক্ষের দিকে একপা এগিয়ে এসে উত্তম-মধ্যম দিতে যাবে, এমন সময়ে নতুন-পাওয়া চাকরিটা হারাবার ভয়ে থেমে গেল সে। রাগে মুখ কালো করে বলল, 'বেশি চেঁচাস্ নে, থাম্। মুখ সামলে কথা বলবি, নইলে টের পাইয়ে দেব মজাটা। কাল সাতটায় আসব আমি, আর মনে রাখিস — হাত চালাতে আমিও কম যাই নে। দেখবি নাকি? আসবি তো চলে আয়!'

পাভেলের ক্রুদ্ধ ভঙ্গি দেখে আশ্চর্য হয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে তার প্রতিপক্ষ গুটিয়ে নিল নিজেকে, পিছু হঠে জল ফোটার পাত্রটা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। এতটা শক্ত পালটা জবাব সে আশা করে নি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

চাকরির প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটেছে। কাজের শেষে এই যে ছুটি, এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই — এরকম একটা মনোভাব নিয়েই পাভেল তাড়াতাড়ি চলল বাড়ির দিকে। এখন থেকে সেও তো শ্রমজীবী, কেউ আর তাকে পরগাছা বলে দোষ দিতে পারবে না।

করাত-কলের এলোমেলো ছড়ানো বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে তখন সূর্য উঠে আসছে। একটু বাদেই লেশ্চিনস্কিদের খামার বাড়ির পেছনে পাভেলদের ছোট বাড়িটা দেখা দেবে।

'মা নিশ্চয়ই উঠে গেছে, আর আমি এই কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি,' শিস দিতে দিতে জোরে পা চালিয়ে পাভেল ভাবছিল, 'ইস্কুল থেকে বের করে দেওয়াটা খুব মন্দ হয় নি দেখছি। হতচ্ছাড়া পাদ্রীটা তা এক মুহূর্ত শান্তি দিত না আমায়, চুলোয় যাক ব্যাটা এখন।' বাড়ি পেঁাছে বেড়ার দরজা খুলতে খুলতে পাভেল মনে মনে বলল, 'আর ওই শণচুলোটা, ওর মুখে ঠিক ঝাড়ব একটা ঘুষি।'

আঙিনায় মা সামোভারটায় আগুন ধরাতে ব্যস্ত ছিল, পাভেলকে আসতে দেখে মুখ তুলে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কেমন ?'

'দিব্যি,' বলল পাভেল।

মা আরও কী যেন বলে সতর্ক করে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় খোলা জানলাটা দিয়ে পাভেল তার দাদা আর্তিওম-এর চওড়া পিঠের দিকটা দেখতে পেল।

'আর্তিওম এসেছে বুঝি ?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, কাল রাতে এসেছে। ও থাকবে এখন এখানে। ডিপোয় কাজ করবে।'

একটু ইতস্ততই করে পাভেল ঘরের দরজাটা খুলল।

দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিলের ধারে বসে ছিল আর্তিওম। পাভেল ঢুকতে বিরাট দেহটা ঘুরিয়ে সে তার কালো ঘন ভুরুর নিচে দুই চোখের কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল পাভেলের দিকে, 'এই যে, তামাকু-ছোঁড়া এসে গেছে। তারপর, চলছে কেমন ?'

কথাবার্তাটা কোন্ দিকে মোড় নেবে আন্দাজ করে শঙ্কিত হয়ে উঠল পাভেল। 'আর্তিওম সবই জানে দেখছি,' ভাবল মনে মনে, 'আর্তিওমের কাছ থেকে বকুনি জুটতে পারে, এমন কি পিটুনিও !'

আর্তিওমকে ভয় করত পাভেল। কিন্তু আর্তিওম মারধোরের মধ্যে গেল না। টুলটার ওপরে বসে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে পাভেলকে লক্ষ্য করতে লাগল কৌতুক আর বিদ্রূপ মেশানো চাউনিতে।

'তাহলে, তুই তো পাশ করে বেরিয়ে এলি দেখছি ইউনিভার্সিটি থেকে, অ্যাঁ ? সেখানে শেখার যা ছিল সব শিখে নেবার পরে এখন থেকে তাহলে এঁটোকাঁটা সাফ করা নিয়েই থাকবি, কি বল্ ?' আর্তিওম বলল।

মেঝেয় একটা তক্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটা পেরেকের মাথা লক্ষ্য করতে থাকল পাভেল। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আর্তিওম চলে গেল রান্নাঘরে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল ভাবে 'যাক্, মারধোর করবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

পরে চা খেতে খেতে আর্তিওম পাভেলকে স্কুলের সমস্ত ঘটনাটা জিজ্ঞেস করল। যা যা ঘটেছিল সবই বলল পাভেল।

মা দুঃখিতভাবে বলল, 'বড়ো হয়ে যদি এমন বেয়াড়া হয়ে উঠিস, তাহলে কী হবে তোর ? কী করব তোকে নিয়ে ? কার মতো যে হলি, তাই ভাবি ! হায় ভগবান, কী ভোগান্তিই না ভোগাচ্ছে আমায় ছেলেটা !' বিলাপ করল মা।

খালি কাপটা ঠেলে দিয়ে পাভেলের দিকে ফিরে বলল আর্তিওম, 'আচ্ছা, শোন ভাই। যা হয়ে গেছে তার আর কোন চারা নেই। কিন্তু এখন থেকে খেয়াল রেখো, ভালো করে কাজ করতে হবে। ওসব বাঁদরামি চলবে না। এখান থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়,

তাহলে ধোলাই দেব তোমায় একচোট — মনে থাকে যেন। মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ। সবসময় একটা গোলমাল পাকাতেই আছ দেখছি। ওসব আর চলবে না। এখানে বছরখানেক কাজ করা হলে পর চেষ্টা করব যাতে তোকে আমাদের ডিপোয় শিক্ষানবিস হিসেবে নেওয়া হয় — জীবন-ভোর খাবার-দোকানের এঁটো-ময়লা পরিষ্কার করে তো আর চলবে না। একটা-কিছু কাজ শিখতে হবে। এখন তোর বয়েস খুব কম — দেখব বছরখানেক বাদে কী করা যায় না যায়। নিতেও পারে তোকে হয়তো। আমি তো এখন এখানেই কাজ করব। মাকে আর কাজ করতে যেতে হবে না। যথেষ্ট খেটে মরেছে মা যতসব শুয়োরগুলোর ঝি-গিরি করে। কিন্তু তোকে মানুষ হতে হবে পাভেল — এইটে খেয়াল রাখিস।'

দাঁড়িয়ে উঠল আরতিওম, তার বিরাট দেহটার তুলনায় ঘরের অন্য সবকিছুকে নেহাত খাটো দেখাল। চেয়ারে ঝোলানো কোর্তাটা গায়ে দিয়ে মাকে বলল, 'ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমাকে একবার বেরুতে হবে।'

একটু ঝুঁকে দরজাটা পেরিয়ে চলে গেল সে। উঠোনে জানলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেতরে তাকিয়ে পাভেলকে বলল, 'এক জোড়া বুটজুতো আর একখানা ছুরি এনেছি তোর জন্যে। মা তোকে দেবে এখন।'

* * *

স্টেশনের রেস্তোরাঁটা সারা দিনরাত খোলা থাকে।

পাঁচটা আলাদা আলাদা রেল-লাইন এসে মিশেছে এই জংশনে, সর্বদাই লোকের ভিড়ে জমজমাট স্টেশনটা। কেবল রাত্রিবেলায় দুটো ট্রেন আসার ফাঁকে এক সময় দু'-তিন ঘণ্টার জন্য জায়গাটা কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। চতুর্দিকে শত শত ট্রেন এই স্টেশনের ওপর দিয়ে যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে হাজার হাজার আহত আর পঙ্গু মানুষ ফিরিয়ে এনেছে আর ফ্রণ্টের দিকে একঘেয়ে ধূসর গ্রেটকোট পরা নতুন নতুন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে নিয়ে গেছে।

দু-বছর কাজ করা হল এখানে পাভেলের — এই দু-বছরে সে বাসন-ধোবার ঘর আর রান্নাঘর ছাড়া আর কিছুই দেখে নি। মাটির নিচুতলার প্রকাণ্ড রান্নাঘরে কুড়ি জনেরও বেশি লোক হন্যে হয়ে কাজ করে। খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে দশজন ওয়েটার অনবরত হুড়মুড়িয়ে যায় আর আসে।

এখন আট রুবলের জায়গায় দশ রুবল করে পাচ্ছে পাভেল। এই দু-বছরে সে লম্বায় আর চওড়ায় বেড়েছে, অনেক কিছু ঝক্কিও গেছে তার ওপর দিয়ে। ছ'মাস পাভেল রান্নাঘরে খানসামার কাজ করেছে, কিন্তু তাকে আবার ফেরত পাঠানো হয়

বাসন-ধোবার ঘরে। বাতিল করে দিয়েছে সর্বশক্তিমান বড়ো বাবুর্চি। পছন্দ হয় নি গোঁয়ার ছোঁড়াটাকে — কি জানি, বলা যায় না, বেশি বেশি ঘুষি-টুসি মারলে আবার কখন হয়তো ছুরি-টুরি মেরে বসবে। সত্যিই, পাভেলের দারুণ রাগী মেজাজের জন্য তার চাকরিটা হয়ত অনেক আগেই চলে যেত, কিন্তু সে যে থেকে যায় তা শুধু ওর পরিশ্রম করার প্রচণ্ড ক্ষমতার জন্যই। অন্য যেকোন লোকের চেয়ে সে বেশি পরিশ্রম করতে পারত, ক্লান্ত হত না যেন কখনও।

যে-সব সময়ে খাবার-ঘরে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে, ও তখন ডিশে ভর্তি বারকোশগুলো নিয়ে এক-এক লাফে চার-পাঁচটা সিঁড়ি পার হয়ে ঝড়ের বেগে নিচে, রান্নাঘরে যায় ও ফিরে আসে।

রাত্রিবেলায় যখন রেস্তোরাঁর হল-ঘর দুটোয় গোলমাল থেমে আসে, ওয়েটাররা তখন এসে জড়ো হয় নিচে রান্নাঘরের ভাঁড়ারগুলোয় — উদ্দাম আর বেপরোয়া তাস-বাজি শুরু হয়ে যায় তখন। পাভেল প্রায়ই ওদের টেবিলে প্রচুর টাকা দেখেছে। আশ্চর্য হয় নি সে এত টাকার ছড়াছড়ি দেখে। পাভেল জানে, প্রতি শিফ্‌ট্‌-এ এক-একজন ওয়েটার মোট তিরিশ থেকে চল্লিশ রুবল পায় বখ্‌শিশের এক রুবল আর আধ-রুবল মিলিয়ে। এই টাকাটা তারা পরে খরচ করে মদ খেয়ে আর জুয়ো খেলে। ঘৃণা করে এদের পাভেল।

'হতভাগা শুয়োর যত সব!' মনে মনে ভাবে সে, 'আরতিওম — প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ কারিগর — সে কিনা সর্বসাকুল্যে পায় মাসে আটচল্লিশ রুবল, আর আমি পাই দশ। আর এরা শুধু খাবারের থালাগুলো বয়ে নিয়ে যায় আর আসে — তাতেই এক-দিনেই পায় এতো। তারপরে সবটা উড়োয় মদে আর তাসে।'

পাভেলের কাছে তার মালিকদের মতোই এই ওয়েটাররাও ভিন্ন আর শত্রুভাবাপন্ন জগতের লোক। 'এখানে তো এই শুয়োরগুলো হুজুরে-হাজির থাকে সবসময়, আর ওদিকে এদের বৌ-ছেলেপুলে শহরে চলা-ফেরা করে বড়োলোকের মতো।'

মাঝে মাঝে ওদের বৌ আর ছেলেরা এখানে আসে। ছেলেদের গায়ে থাকে কেতাদুরস্ত স্কুলের উর্দি, বৌগুলো ভাল থাকে, ভাল খায়-দায়, তাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কোমল-শরীর। 'যেসব ভদ্দরলোকদের ওরা খানসামাগিরি করে, তাদের চেয়ে এদের পয়সা বেশি — বাজি রেখে বলতে পারি,' ভাবে পাভেল। রাত্রে রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে কোণে কিংবা ভাঁড়ারঘরে যে-সব কাণ্ড ঘটে, তা দেখেও ছেলেটা আর অবাক হয় না। খুব ভালো করেই ও জানে যে ডিশ্‌-ধোবার কিংবা খদ্দেরদের মদ জোগাবার কাজে যে মেয়েরা আছে, তাদের বেশি দিন চাকরি থাকবে না যদি তারা এখানে ক্ষমতাধর প্রত্যেকের কাছে কয়েক রুবলের জন্য নিজেদের বিকিয়ে না দেয়।

জীবনের প্রতি, নূতনত্ব ও অজ্ঞাতপূর্ব সবকিছুর প্রতি পাভেলের আগ্রহ অসীম — সে এখানে জীবনের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত দেখে নিয়েছে, কুৎসিত সে-গর্তটার একেবারে তলা থেকে পাঁকে ভরা নর্দমার পচা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উঠে এসেছে।

ডিপোয় ভাইকে শিক্ষানবিস হিসেবে ঢুকিয়ে নিতে পারে নি আরতিওম। পনের বছরের কম বয়সী কাউকে সেখানে নেওয়া হয় না। কিন্তু পাভেল ওই কালি-পড়া ইঁটের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কবে যে এই রেস্তোরাঁটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তারই আশায় সে দিন গোণে।

সে প্রায়ই ডিপোয় গিয়ে আরতিওমের সঙ্গে দেখা করে, তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাড়িগুলো দেখে, পারলেই তার কাজে সাহায্য করে।

বিশেষ করে ফ্রসিয়া চলে যাবার পর থেকে তার বড়ো একা লাগে। হাসিখুশি আর আমুদে এই মেয়েটা চলে যাবার পরে পাভেল আরও বেশি করে অনুভব করেছে ফ্রসিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বটা তার কী জিনিস ছিল। আজকাল সকালে বাসন-ধোবার ঘরটায় এসে পাভেল সেখানে উদ্বাস্তু মেয়েগুলির তীক্ষ্ম গলার ঝগড়া শোনে আর একটা একাকিত্ব আর শূন্যতার বোধ তাকে কুরে কুরে খায়।

* * *

একদিন রাত্রে, কাজে যখন চাপ কম, বয়লারে কাঠ দিতে দিতে খোলা চুল্লিটার সামনে পাভেল উবু হয়ে বসে আছে শিখাগুলির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে — উনুনের উষ্ণতায় ভালোই লাগছিল। বাসন-ধোবার ঘরে কেউ ছিল না। আপনা থেকেই ফ্রসিয়ার কথা এসে গেল পাভেলের মনে; কিছুদিন আগে দেখা একটা দৃশ্য ভেসে উঠল তার মনের পটে।

শনিবার রাত্রে কাজের বিরতির সময়টুকুতে পাভেল রান্নাঘরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এমন সময় কৌতূহলী হয়ে সে জ্বালানি কাঠের একটা স্তূপ বেয়ে উঠে নিচ তলার ভাঁড়ারঘরটার দিকে তাকাল যেখানে জুয়াড়ীরা সাধারণত জড়ো হয়।

তখন পুরোদমে খেলা চলেছে। জালিভানভ তখন বাজি জিতছে, উত্তেজনায় তার মুখ লাল।

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘুরে তাকিয়ে প্রশকাকে দেখে পাভেল সিঁড়ির নিচে সেঁধিয়ে গেল যতক্ষণ না লোকটা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। সিঁড়ির নিচে অন্ধকার, তাই প্রশকা তাকে দেখতে পেল না। সে যখন সিঁড়ির বাঁকটা ঘুরছে তখন পাভেল তার চওড়া পিঠ আর বিরাট মাথাটা দেখতে পেল।

এই সময়ে কে যেন হালকা পায়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওয়েটারটার পিছু পিছু। একটা পরিচিত গলার ডাক শুনতে পেল পাভেল, 'দাঁড়াও, প্রশকা!'

প্রশকা থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ওপর-মুখো তাকাল।

'কি চাই?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

পায়ের শব্দটা নেমে আসতেই ফ্রসিয়াকে দেখা গেল।

ওয়েটারটার আস্তিন চেপে ধরল সে। ভাঙা আর রুদ্ধস্বরে বলল, 'লেফটেন্যাণ্ট তোমায় যে টাকাটা দিয়েছে, সেটা কই, প্রশকা?'

হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রশকা বলল, 'কিসের টাকা? তোমাকে তো দিয়েছি টাকা, নাকি দিই নি?' তীক্ষ্ণ আর ভয়ঙ্কর তার গলার স্বর।

'কিন্তু ও তো তোমাকে তিন-শো রুবল দিয়েছিল,' চাপাকান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্রসিয়ার গলা।

'তাই নাকি? তিন-শো!' নাক সিটকে বিদ্রূপ করল প্রশকা, 'সবটাই পেতে চাও, অ্যাঁ? ডিশ-ধোনেওয়ালীর পক্ষে বড্ড বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে নাকি, সুন্দরী? ওই পঞ্চাশ যা দিয়েছি, তাই প্রচুর। তোমার চেয়ে ঢের ভাল দেখতে—এমন কি লেখাপড়া-জানা মেয়েরাও অতো পায় না। যা পেয়েছ তাতেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—এক রাত্তিরের জন্যে পুরো পঞ্চাশ রুবল তো খাসা! বোকা পেয়েছ! আচ্ছা, আরও দশ দিচ্ছি—যাক গে, না হয় কুড়িই হল, ব্যস! বোকা না হও তো এমনি আরও রোজগার করতে পারবে। আমি সাহায্য করব।' বলেই প্রশকা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল রান্নাঘরটায়।

'বদমাইশ! শুয়োর!' চিৎকার করে উঠল ফ্রসিয়া তার উদ্দেশে। কাঠের স্তূপে ঠেস দিয়ে জ্বালাধরা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কাঠের পাঁজার ওপরে ফ্রসিয়া পাগলের মতো মাথা ঠুকছে—সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে পাভেল যে কী আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু নিজেকে দেখতে দেয় নি পাভেল। শুধু তার আঙুলগুলো কেঁপে চেপে চেপে ধরেছিল সিঁড়ির পাশের লোহার শিকগুলো।

'ওরা তাহলে ফ্রসিয়াকেও বেচেছে—জাহান্নমে যাক ওরা! ফ্রসিয়া, ফ্রসিয়া...'

প্রশকার প্রতি ঘৃণা আরও বেশি জ্বালা ধরিয়ে দিল পাভেলের মনে। চতুর্দিকের সবকিছু অত্যন্ত ঘৃণ্য আর ন্যক্কারজনক। 'আমার গায়ে তেমন জোর থাকলে মেরে খুন করতাম শয়তানটাকে! আহা, আর্তিওমের মতো লম্বা-চওড়া আর জোয়ান হতাম যদি!'

বয়লারের নিচে আগুনের শিখা জ্বলে উঠে মিইয়ে এল, তাদের লাল জিভগুলো কেঁপে কেঁপে পরস্পরের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে লম্বা আর নীলচে একটা সর্পিল আকার নিতে থাকল। পাভেলের মনে হল কে যেন তার দিকে জিভ বের করে ভেংচি কেটে বিদ্রূপ করছে।

ঘরটা নিস্তব্ধ — শুধু আগুনে কাঠ ফাটার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে আর কলটার মুখে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় একটা মাপা সময়ের ব্যবধানে।

চকচকে করে মাজা শেষ পাত্রটা ক্লিমকা তাকের ওপর রেখে হাত মুছল। আর কেউ নেই রান্নাঘরে। এই সময়টায় যে-বাবুর্চির হাজিরা রাখার কথা, সে আর তার সহকারী মেয়েরা পোশাক রাখার ঘরটায় ঘুমুচ্ছে। রাত্রির তিন ঘণ্টার শান্তি নেমেছে রান্নাঘরটায়। এই সময়টুকু ক্লিমকা রোজ ওপরতলায় পাভেলের সঙ্গে কাটায়। রান্নাঘরের ফাইফরমাস-খাটা এই কিশোরটির সঙ্গে কালো-চোখ ওই বয়লার-বরদার ছেলেটির একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ওপরে এসে ক্লিমকা দেখে, মুখ-খোলা চুল্লিটার সামনে উবু হয়ে বসে আছে পাভেল। দেয়ালের গায়ে তার পরিচিত ঝাঁকড়া-চুলো দেহের ছায়াটা পড়তে দেখে পাভেল তার দিকে না ফিরেই বলল, 'বোস্, ক্লিমকা।'

ছেলেটি কাঠের পাঁজার উপর উঠে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে নির্বাক পাভেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেসে বলল ক্লিমকা, 'কপালের লিখন পড়ছিস বুঝি আগুনে?'

আগুন-শিখার হিসহিসে জিভগুলোর দিকে আটকে-যাওয়া দৃষ্টি ছিনিয়ে এনে ক্লিমকার দিকে তাকাল পাভেল — বড়ো বড়ো চকচকে তার চোখদুটোয় উপচে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা। ক্লিমকা তার বন্ধুকে এত বিষণ্ন দেখে নি আর কোন দিন।

'কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে আজ, পাভেল?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল সে, 'ঘটেছে নাকি কিছু?'

পাভেল উঠে এসে ক্লিমকার পাশে বসল। নিচু গলায় বলল, 'ঘটে নি কিছু। এখানে আমার পক্ষে টেকা খুব কঠিন, ক্লিমকা।' হাঁটুর ওপরে রাখা তার হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল।

'কী হয়েছে আজ তোর?' কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে পীড়াপীড়ি করতে লাগল ক্লিমকা।

'আজই শুধু? এ কাজে ঢোকার পর থেকে বরাবরই আমার এই রকম লাগছে। এখানে কী কাণ্ডকারখানা হচ্ছে একবার তাকিয়েই দ্যাখ না! আমরা গাধার মতো খাটি, আর ভাল কথার বদলে পাই ঘুষি — যে-কেউ ধরে তোকে মার লাগাতে পারে, কিন্তু তোর হয়ে কথাটি বলার কেউ নেই। মালিকরা আমাদের নেয় তাদের কাজ করে

দেবার জন্যে, কিন্তু গায়ে যার জোর আছে তারই অধিকার আছে আমাদের ধরে পেটাবার। ছুটোছুটি করে মরে গেলেও সবাইকে খুশি করা যাবে না কিছুতেই, আর যাদের খুশি করতে পারবে না, তাদের হাতে মার খেতেই হবে সবসময়। যাতে কেউ তোমার কাজে খুঁত ধরতে না পারে তার জন্যে যতোই চেষ্টা করো না কেন, সবাইকে তো সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। আর, একজনের বেলায় দেরি হলেই গর্দানের ওপর এসে পড়বে একটি ঘুষি...'

'চেঁচাস নে অমন করে,' ভয় পেয়ে বাধা দিল ক্লিমকা, 'কেউ এসে পড়লে শুনে ফেলবে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল।

'শুনুক গে, আমি ছেড়ে তো দেবই কাজটা। এখানে আটকে থাকার চেয়ে বরং রাস্তায় বরফ সাফ করব সেও ভালো... যত সব জোচ্চোরের আস্তানা! কী টাকাটা করেছে এরা একবার দ্যাখ! আমাদের সঙ্গে তো এমন ব্যবহার করে যেন আমরা নেহাতই নোংরা জিনিস, আর মেয়েগুলোকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। যারা ভাল মেয়ে তারা যদি এদের খুশিমতো না চলে, তাহলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেয় আর তাদের জায়গায় কাজে নেয় উপোসী উদ্বাস্তু মেয়েদের যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এ ধরনের মেয়েরা যা-হোক করে থেকে যায়, কারণ এখানে অন্তত তারা দুটো খেতে পায় আর এদের অবস্থা এতোই খারাপ যে এরা একটুকরো রুটির জন্যে সবকিছুই করতে পারে।'

এমন ক্রোধের সঙ্গে পাভেল কথাগুলি বলে গেল যে ক্লিমকা তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল — পাছে কেউ কথাগুলো শুনে ফেলে এই ভয়ে। আর পাভেল তার মনে ছাপিয়ে ওঠা সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বলে চলল।

'আর ক্লিমকা, তুই তো সমস্ত মার পড়ে পড়ে পিঠ পেতে নিস। কখনো মুখ খুলিস নে কেন?'

টেবিলের কাছে একটা টুলের ওপর বসে পড়ল পাভেল, হাতের তেলোয় মাথাটা রাখল ক্লান্তভাবে। আগুনে কিছু কাঠ গুঁজে দিয়ে ক্লিমকাও বসল টেবিলটার পাশে।

'আজ পড়বি না?' জিজ্ঞেস করল সে পাভেলকে।

'পড়বার কিছু নেই,' বলল পাভেল, 'বইয়ের দোকানটা বন্ধ।'

'আজকে বন্ধ কেন?' একটু অবাক হল ক্লিমকা।

'পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বইওয়ালাকে। কি যেন পেয়েছে তার কাছে,' বলল পাভেল।

'ধরে নিয়ে গেছে? কেন?'

'লোকে তো বলছে রাজনীতি করার জন্যে।'

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে ক্লিমকা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে। 'রাজনীতি ? সে আবার কী ?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাভেল বলল, 'কী তা শয়তানই জানে ! লোকে তো বলে, জারের বিরুদ্ধে গেলেই নাকি রাজনীতি করা হয়।'

চমকে গেল ক্লিমকা, 'সে রকম কোন কাজও করে নাকি লোকে ?'

'কি জানি,' বলল পাভেল।

দরজাটা খুলে গেল, বাসন-ধোবার ঘরে ঢুকল গ্লাশা, ঘুম পেয়ে তার চোখদুটো ফোলা-ফোলা।

'ঘুমোস নি কেন তোরা দুটি ? ট্রেনটা আসার আগে ঘণ্টাখানেক তো ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে। একটু বরং জিরিয়ে নে পাভেল। আমি ততক্ষণ বয়লারটা দেখব এখন।'

* * *

পাভেল যা ভেবেছিল তার আগেই তাকে চাকরিটা ছাড়তে হল। আর এমনভাবে যে ছাড়তে হবে তাও সে ভাবে নি।

একদিন বরফ-ঝরা জানুয়ারির সকালে পাভেল তার কাজের শিফ্‌ট শেষ করে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হয়ে ছিল, দেখল যে-ছেলেটি এসে তার কাজের ভার নেবে সে তখনও আসে নি। মালিকের গিন্নির কাছে গিয়ে পাভেল জানাল, সেই ছেলেটি আসুক বা না আসুক, সে চলে যাচ্ছে, কিন্তু গিন্নি শুনবে না সে কথা। কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় রইল না — যদিও পুরো একটা দিন-রাত্রির কাজের শেষে সে একেবারে শ্রান্ত। সন্ধ্যের দিকে পাভেল যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়। রাত্রিতে কাজের অবসর সময়টুকুতে তার বয়লারগুলো ভর্তি করে রাখার কথা — যাতে তিনটের ট্রেন আসার সময়ে সেগুলো ফুটন্ত অবস্থায় এসে যায়।

কলের মুখটা খুলে দিল পাভেল, কিন্তু জল নেই; বোঝা গেল পাম্প্‌ চলছে না। কলের মুখটা খোলা রেখে কাঠের ঢিবির ওপর সে শুলো একটু; কিন্তু ক্লান্তির কাছে হার মানতে হল — অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

কয়েক মিনিট পরেই কলের মুখে হিস্‌হিস শব্দে জল এসে গেল, কুলকুল শব্দে জল পড়তে লাগল বয়লারটায়, ভর্তি হয়ে উপচে উঠে জল ছড়িয়ে পড়ল বাসন-ধোবার ঘরের টালি-লাগানো মেঝেটায় — এই ঘরটা তখন ফাঁকা ছিল। জল ঝরে পড়তে পড়তে

গোটা ঘরের মেঝেটা ভর্তি হয়ে উপচে উঠে দরজাটার ফাঁক দিয়ে হল-ঘরটার ভেতরে এসে পড়ল। ঘুমে ঝিমন্ত ট্রেন-যাত্রীদের প্যাঁটরা-থলি-পুঁটুলির নিচে জল জমে উঠল। কিন্তু মেঝের ওপর শুয়ে থাকা একজন যাত্রীর গায়ে জল না লাগা পর্যন্ত কেউ তা লক্ষ্য করে নি। চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল লোকটি। এবার ছোটাছুটি পড়ে গেল জিনিসপত্রগুলো সামলাবার জন্য, শুরু হয়ে গেল দারুণ হৈ-হল্লা।

আর জল ঝরে পড়তেই থাকল সমস্তক্ষণ।

দু-নম্বর হল-ঘরটায় প্রশকা টেবিলগুলো পরিষ্কার করছিল। গণ্ডগোল শুনে ছুটে এল সে। জল-জমে-ওঠা জায়গাগুলো লাফিয়ে পার হয়ে দরজাটার ওপর পড়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দরজায় আটকে রাখা ভেতরে জমে-ওঠা জলের রাশি ধারাবেগে এসে পড়ল হল-ঘরে।

শুরু হয়ে গেল আরও বেশি চেঁচামেচি। ডিউটিরত ওয়েটাররা ছুটে এল বাসন-ধোবার ঘরটায়। প্রশকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত পাভেলের ওপর।

ঘুষির ওপর ঘুষি এসে পড়ল ছেলেটার মাথায়, অভিভূত করে দিল তাকে।

তখনও আধা-ঘুমন্ত পাভেল বুঝতেই পারে নি কী ঘটল ব্যাপারটা। চোখের সামনে ধাঁধা লাগানো কতকগুলো বিদ্যুতের চমক আর সমস্ত দেহে নিদারুণ যন্ত্রণার খোঁচা — শুধু এইটুকুর চেতনা তার ছিল।

এতো প্রচণ্ড মার খেয়েছে পাভেল যে সে কোনরকমে নিজেকে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।

সকাল বেলায় ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে আরতিওম তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছিল।

সবই বলল পাভেল।

'কে মেরেছিল তোকে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল আরতিওম।

'প্রশকা।'

'ঠিক আছে। এখন শুয়ে থাক্ চুপ করে।'

আর কোন কথা না বলে আরতিওম বেরিয়ে গেল তার কোর্তাটা পরে নিয়ে।

* * *

ডিশ-ধোওয়া মেয়েদের একজনকে সে জিজ্ঞেস করল এসে, 'ওয়েটার প্রখোরকে কোথায় পেতে পারি?'

বাসন-ধোবার ঘরে এসে-যাওয়া মজুরের পোশাক-পরা অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে গ্লাশা বলল, 'এখুনি সে এসে যাবে এখানে।'

দরজার চৌকাঠে তার বিরাট দেহের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইল মজুরটি, 'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।'

একটা বারকোশের ওপর ডিশের পাহাড় নিয়ে দরজাটা পায়ের ধাক্কায় খুলে প্রখোর বাসন-ধোবার ঘরটায় ঢুকল।

দেখিয়ে দিয়ে প্লাশা বলল, 'এই যে সে।'

এক পা এগিয়ে এসে প্রখোরের কাঁধে ভারি হাত একখানা রেখে আরতিওম সোজা তার চোখে চোখ রাখল।

'আমার ভাই পাভেলকে মেরেছ কেন?'

ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল প্রখোর, কিন্তু প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর; উঠবার চেষ্টা করতেই আরও ভীষণ আরেকটা ঘুষি তাকে যেন গেঁথে দিল মেঝের সঙ্গে।

আতঙ্কগ্রস্ত ডিশ-ধোওয়া মেয়েরা ছুটোছুটি আরম্ভ করল চারদিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আরতিওম বেরিয়ে এল।

চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল প্রশকা মেঝের ওপর, থেঁৎলে-যাওয়া মুখখানা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সেদিন সন্ধ্যেয় ডিপো থেকে বাড়ি ফিরল না আরতিওম।

মা জানতে পারল, তাকে পুলিসে আটকেছে।

ছ'দিন পরে গভীর রাত্রে ফিরে এল আরতিওম — মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাভেল উঠে বসেছিল বিছানায়, তাকে আরতিওম কোমল গলায় বলল, 'এখন ভাল তো?' পাভেলের পাশে বসে আরতিওম বলল, 'এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হয়!' তারপরে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, 'যাক গে, তুই বিদ্যুৎ-স্টেশনে কাজ করবি। আমি ওদের বলে রেখেছি তোর কথা। সত্যিকারের একটা কাজ শিখবি তুই ওখানে।'

আরতিওমের বলিষ্ঠ হাতখানা পাভেল দু-হাতে চেপে ধরল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো সেই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এই ছোট্ট শহরটায়: 'জারকে উৎখাত করা হয়েছে!'

শহরের লোকে বিশ্বাস করতে চাইল না কথাটা।

তারপরে শীতের একদিন ঝড়ের মধ্যে গুঁড়ি মেরে একটা ট্রেন এসে থামল স্টেশনে আর তার ভেতর থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল দু'জন ছাত্র — তাদের পরনে সামরিক ওভারকোট, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, সঙ্গে একদল বিপ্লবী সৈন্য, তাদের বাহুতে লাল

ফিতে বাঁধা। তারা স্টেশনের পুলিসদের, একজন বৃদ্ধ কর্নেলকে আর শহরে মোতায়েন সৈন্যদলের কর্তাকে গ্রেপ্তার করল। এবারে খবরটায় বিশ্বাস হল শহরবাসীদের। হাজারে হাজারে তারা বরফ-ঢাকা রাস্তা বেয়ে এসে জমা হল শহরের ময়দানে।

আগে যে সব কথা তারা কখনও শোনে নি সেই সব কথা তারা সাগ্রহে শুনল: স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।

কয়েকটা উদ্দাম দিন কেটে গেল — উত্তেজনা আর আনন্দে ভরা দিন। তারপরে একটা ঝিমিয়ে পড়া ভাব এসে গেল। শুধু যেখানে মেন্শেভিকরা আর বুন্দপন্থীরা এসে ঘাঁটি গেড়েছিল, সেই টাউন-হলের মাথায় উড়ন্ত লাল নিশানটা পরিবর্তনটুকু মনে করিয়ে দিতে লাগল। আর সবকিছুই যেমনটি ছিল তেমনিই থাকল।

শীতের শেষ দিকে অশ্বারোহী গার্ডের একটা রেজিমেণ্টকে শহরে মোতায়েন করা হল। সকাল বেলায় তারা দলে দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ত রেল-স্টেশনের দিকে — যারা দক্ষিণপশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে পালিয়ে লুকিয়ে ফিরছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য।

এই সৈন্যরা সব বিরাট-দেহ, মেদবহুল লোক, মুখ দেখে বোঝা যায় এরা ভাল খায়-দায়। এদের অফিসারদের বেশির ভাগই রাজারাজড়া-জমিদার। কাঁধে তাদের সোনালি পট্টি আর পাৎলুনে রুপোর কাজ, ঠিক জারের সময়ে যেমনটি ছিল — যেন কোন বিপ্লবই হয় নি।

১৯১৭ সাল কাটতে থাকল। পাভেল, ক্লিমকা আর সের্গেই ব্রুঝাক্-এর পক্ষে কিছুই অদলবদল হল না। ওপরওয়ালারা ঠিকই আগেকার মতো রইল। শেষে নভেম্বর থেকে অসাধারণ কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকল। নতুন ধরনের একদল লোক দেখা দিল স্টেশনে, তারা কিছু কিছু তৎপরতা লাগিয়ে দিল, এদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকল, — তাদের একটা বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে সামনের সারির লোক। 'বল্শেভিক' — এই অদ্ভুত নামে তাদের পরিচয়।

কেউ জানে না কোথা থেকে এই ধ্বনিমুখর আর ভারি কথাটা এসেছে।

গার্ড-ফৌজের লোকদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে-আসা সৈন্যদের আটকানোটা ক্রমশই বেশি করে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। রাইফেলের দুম্দাম্ আর কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝন্ঝনানি স্টেশন থেকে ক্রমশই বেশি করে শোনা যেতে লাগল। ফ্রণ্ট থেকে দল বেঁধে লোক আসছে আর আটক করতে গেলেই তারাও বেয়নেট নিয়ে লড়ছে। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তারা আসতে লাগল ট্রেন-বোঝাই হয়ে।

গার্ড-সৈন্যেরা তোড়জোড় করে স্টেশনে আসে ফ্রণ্ট-ফিরতি সৈন্যদের রুখবার জন্য, কিন্তু মেশিনগানের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রেলগাড়ির কামরা থেকে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে নামে, মরা তাদের গা-সহা।

ধূসর কোট-পরা ফ্রণ্টের লোক গার্ড-ফৌজকে তাড়িয়ে দিল শহরের মধ্যে। তারপরে ফিরে এল স্টেশনে, যে যার গন্তব্যস্থানের দিকে রওনা হল ট্রেনের পর ট্রেন ভর্তি হয়ে।

* * *

১৯১৮ সালের বসন্তকালে একদিন তিনটি কিশোর বন্ধু সের্গেই ব্রুঝাকদের বাড়ি থেকে তাস খেলে ফিরবার পথে করচাগিনদের বাগানে ঢুকে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বড় একঘেয়ে লাগছে তাদের। সাধারণত তারা সময় কাটানোর জন্য যা যা করে, তার সবই নীরস হয়ে উঠছিল। তাই দিন কাটানোর জন্য নতুন ধরনের কোন উপায়ের সন্ধানে যখন তারা ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। রাস্তা বেয়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। রাস্তা আর বাগানের নিচু বেড়ার মাঝখানকার খানাটাকে এক লাফে পার হয়ে এল ঘোড়াটা। পাভেল আর ক্লিমকার দিকে চাবুকটা নেড়ে সওয়ারটি বলল, ‘এই খোকারা, এদিকে এসো তো একটু।’

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল পাভেল আর ক্লিমকা বেড়াটার কাছে। ধুলোয় ভরে গেছে ঘোড়সওয়ারের শরীর। মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া তার টুপির ওপরে, খাকি রঙের কোর্তায় আর ব্রিচিজে ধূসর ধুলোর পুরু স্তর জমেছে। তার ভারি ফৌজী কোমরবন্ধনীটায় ঝুলছে একটা রিভলভার আর দুটো জার্মান হাত-বোমা।

‘একটু খাবার জল এনে দিতে পার, খোকারা?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার। পাভেল বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল জল আনবার জন্য। সের্গেই ঘোড়সওয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার দিকে ফিরে ঘোড়সওয়ার বলল, ‘তোমাদের শহরে এখন কোন সরকার আছে বলো দেখি খোকা?’

এক নিঃশ্বাসে সের্গেই সমস্ত স্থানীয় খবর বলে গেল এই আগন্তুকটিকে, ‘দু-সপ্তাহ ধরে এখানে কোন সরকার নেই। নিজেরাই নিজেদেরই এখন রক্ষা করি। বাসিন্দারা সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে পালা করে রাত্রে ঘুরে ঘুরে শহর পাহারা দেয়। আচ্ছা, আপনি কে?’ পাল্টা জিজ্ঞেস করল সের্গেই।

হাসল ঘোড়সওয়ারটি, ‘বেশি জেনে ফেললে আবার তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে, জান তো?’

বেরিয়ে এল পাভেল এক-মগ জল নিয়ে। তৃষ্ণার্ত ভঙ্গিতে ঘোড়সওয়ার এক চুমুকে মগটা খালি করে ফিরিয়ে দিল পাভেলকে। তারপর ঘোড়ার রাশে ঝাঁকুনি দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল পাইন বনের দিকে।

'কে লোকটা ?' পাভেল জিজ্ঞেস করল ক্লিমকাকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'কী করে জানব ?'

'মনে হচ্ছে কর্তৃত্বের বদল হবে ফের। সেইজন্যই তো লেশ্চিনস্কিরা কাল শহর ছেড়ে গেছে। বড়লোকরা পালাচ্ছে, তার মানেই পার্টিজানরা আসছে,' রাজনীতিক প্রশ্নটাকে দৃঢ়ভাবে ফয়সালা করে দিয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত দেবার ভঙ্গিতে বলল সের্গেই।

তার কথার যুক্তিটা এতই নিশ্চিত রকমের প্রমাণ-নির্ভর যে পাভেল আর ক্লিমকা তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একমত হল।

এরা কথাটার আলোচনা শেষ করার আগেই বড় রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। তিনজনেই ছুটে ফিরে এল বেড়াটার কাছে।

প্রধান বনপরিদর্শকের বাড়িটা গাছের ফাঁকে কোনক্রমে দেখতে পাওয়া যায়। সেই বাড়িটার পাশ কাটিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়ি-ঘোড়া আর লোকজন, আর অদূরে বড় রাস্তার ওপরে আড়াআড়ি রাইফেল ঝোলানো আরও জন-পনেরো ঘোড়সওয়ার। তাদের সামনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে দু'জন: একজন বয়স্ক লোক, গায়ে খাকি কোর্তা, অফিসারের কোমরবন্ধনী আর বুকের ওপর ঝোলানো সামরিক দূরবীন, আর যার সঙ্গে এই ছেলেরা এইমাত্র কথা বলেছে সেই লোকটি তার পাশে। বয়স্ক লোকটির বুকের ওপর একটা লাল ফিতে পরানো।

'কী বলেছিলাম তখন ?' পাভেলের পাঁজরায় কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলল সের্গেই, 'দেখেছিস লাল ফিতেটা ? বলেছি না, পার্টিজান ওরা ! আমার চোখ ফেটে যাক, বুঝলি... ?' আর আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে বেড়া ডিঙিয়ে যেন পাখির মতো হাওয়ায় ভর করে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল সে। বাকি দু'জন তাকে অনুসরণ করল। সবাই মিলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সওয়াররা যখন বেশ কাছাকাছি এসে গেছে, তখন তাদের সেই চেনা লোকটি ওদের দিকে মাথা নেড়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে থাকে ?'

সওয়ারের পাশাপাশি থাকার চেষ্টায় পাভেল ছুটতে ছুটতে বলল, 'উকিল লেশ্চিনস্কি। কাল পালিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনাদের ভয়ে...'

'কী করে জানলে আমরা কে ?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বয়স্ক লোকটি।

'ওই তো, ওটা কী ?' লাল ফিতেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল পাভেল, 'সবাই বলতে পারে...'

লোকজন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল শহরে ঢোকা এই ফৌজীদলটার দিকে। এই তিনটি কিশোর বন্ধুও দাঁড়িয়ে এই ধুলো-মাখা ক্লান্ত লাল-রক্ষী দলটাকে এগিয়ে যেতে দেখল।

তারপরে যখন রাস্তার খোয়া-নুড়ির ওপর দিয়ে সৈন্যদলটির একমাত্র কামান আর মেশিনগান বয়ে-নিয়ে-যাওয়া গাড়িগুলো শব্দ তুলে চলে গেল, ছেলেরা তখন পার্টিজানদের পিছু ধরল। দলটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শহরের মাঝখানটায় এসে থেমে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কেউ বাড়ি ফিরল না।

* * *

সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় লেশিচনস্কিদের প্রশস্ত বসার ঘরে ভারি আর পায়া-খোদাই-করা প্রকাণ্ড টেবিলের চারধারে চারজন লোক বসেছিল: সৈন্যদলের অধিনায়ক কমরেড বুলগাকভ — বয়স্ক, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, এবং দলের অন্য তিনজন কম্যাণ্ডার।

এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর নখ দিয়ে চেপে দাগ কাটলেন বুলগাকভ।

'কমরেড ইয়েরমাচেঙ্কো, তুমি বলছ, আমাদের এই জায়গাটায় একটা লড়াইয়ের ঘাঁটি গাড়া উচিত,' উঁচু চোয়াল আর বড় বড় দাঁতওয়ালা যে লোকটি সামনে বসেছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন বুলগাকভ, 'কিন্তু আমার তো মনে হয়, সকালেই আমাদের রওনা দেওয়া দরকার। আরও ভাল হত যদি রাত্রেই চলা শুরু করা যেত, কিন্তু আমাদের সৈন্যদের খানিকটা বিশ্রাম দরকার। কাজাতিন-এ জার্মানরা আসার আগেই সেখানে সরে আসাটা হচ্ছে আমাদের কাজ। আমাদের যা সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে শত্রুকে রুখতে যাওয়াটা হাস্যকর হবে। একটা কামান আর ত্রিশ রাউণ্ড গোলা, দু'শো পদাতিক সৈন্য আর ষাটজন ঘোড়সওয়ার। জার্মানরা যখন ইস্পাতের বন্যার মতো এগিয়ে আসছে, তখন এটাকে খুব একটা জোরদার সামরিক শক্তি নিশ্চয়ই বলা চলে না। অন্য সব হঠে-আসা লাল দলগুলির সঙ্গে যোগ দিতে না পারা পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না। তাছাড়া, কমরেড, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জার্মানরা ছাড়াও পথে আমাদের অসংখ্য প্রতিবিপ্লবী ফৌজীদলকে রুখতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি, সকালে প্রথমে স্টেশনের ওধারে রেল-সাঁকোটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা সরে যাব। ওটা মেরামত করে নিতে জার্মানদের দু'-তিন দিন লাগবে।

ইতিমধ্যে রেলপথ ধরে তাদের এগিয়ে আসাটা আটকে থাকবে। কী বল তোমরা, কমরেড ? আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে...' টেবিলের চারপাশে যারা বসে ছিল তাদের দিকে তাকালেন।

বুলগাকভের কোনাকুনি উল্টোদিকে বসেছিল স্ত্রুঝকভ। ঠোঁট চিবিয়ে সে প্রথমে ম্যাপটার দিকে, তারপরে বুলগাকভের দিকে তাকাল। শেষে অতি কষ্টে ঠেলে ঠেলে শব্দ বার করে বাধো বাধো গলায় বলল, 'আ-আমি বুলগাকভের সঙ্গে এ-একমত।'

এদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়সী, মজুরের কোর্তা-পরা লোকটিও মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল, 'বুলগাকভ ঠিক বলেছেন।'

কিন্তু ইয়েরমাচেঙ্কো — যে কয়েক ঘণ্টা আগে পাভেলদের সঙ্গে কথা কয়েছিল সে মাথা নাড়ল, 'তাহলে আমরা এই সৈন্যদলটাকে জড়ো করতে গিয়েছিলাম কিসের জন্যে ? লড়াই না করেই জার্মানদের সামনে থেকে সরে আসার জন্যে ? আমি যতদূর বুঝেছি, এইখানেই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। পিছু হটতে হটতে তো একেবারে হদ্দ হয়ে গেছি। আমার ওপরে যদি ভার থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানেই ওদের সঙ্গে লড়তাম...' চেয়ারটা পেছন দিকে সজোরে ঠেলে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করল।

কথাটায় সায় না দিয়ে বুলগাকভ তাকালেন তার দিকে, 'আমাদের মাথা খাটাতে হবে, ইয়েরমাচেঙ্কো। যে-লড়াইয়ে আমরা মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য, সে রকম কোন লড়াইয়ের মধ্যে সৈনিকদের ঠেলে দিতে পারি না আমরা। তাছাড়া, হাস্যকর ব্যাপার হবে সেটা। আমাদের ঠিক পেছনেই রয়েছে ভারি কামান আর সাঁজোয়া-গাড়িতে সুসজ্জিত একটা পুরো ডিভিশন... ছেলেমানুষি করার সময় এটা নয়, কমরেড ইয়েরমাচেঙ্কো।' অন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন: 'তাহলে তাই ঠিক হল, আমরা কাল সকালে এখান থেকে সরে যাচ্ছি...'

'আচ্ছা, এখন পরের প্রশ্নটায় আসা যাক — যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটা কী করা যায়,' বলে যেতে লাগলো বুলগাকভ, 'আমরাই শেষ দল যারা জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছি, সুতরাং জার্মান সৈন্যসারির পেছনে কাজ চালানোটাকে সংগঠিত করা আমাদেরই কাজ। মস্তবড়ো একটা রেল-জংশন এটা, দুটো স্টেশন আছে শহরটায়। রেলপথে কাজ চালাবার জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য কমরেড যাতে থাকেন সে-ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। কাজটা চালিয়ে যাবার জন্যে এখানে কাকে রেখে যাওয়া যায় সেটা আমাদের এখনই ঠিক করতে হবে। তোমাদের মনে আসছে কারুর কথা ?'

ইয়েরমাচেঙ্কো টেবিলটার দিকে আসতে আসতে বলল, 'আমার মনে হয়,

নৌবাহিনীর ফিওদর ঝুখ্রাই-এর এখানে থাকা উচিত। প্রথমত, সে স্থানীয় লোক। দ্বিতীয়ত, সে ফিটার মিস্ত্রি, স্টেশনে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে একটা। আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে কেউ তাকে দেখে নি — আজ রাত্রের আগে সে এখানে আসছে না। কাঁধের ওপর মাথাটা তার দিব্যি খোলসা, সে ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, সে এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।'

মাথা নাড়লেন বুলগাকভ, 'ঠিক। আমি তোমার সঙ্গে একমত। কোন আপত্তি নেই তো অন্য কমরেডদের ?' অন্যদের দিকে তাকালেন তিনি, 'কোন আপত্তি নেই তাহলে। আচ্ছা, তাহলে এ ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে গেল। ঝুখ্রাই-এর কাজের জন্যে লাগতে পারে এমন কিছু টাকা আর পরিচয়পত্র আমরা তার কাছে দিয়ে যাব... আচ্ছা, এবারে তাহলে তৃতীয় আর শেষ আলোচনাটা। এই শহরে জমা করে রাখা অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে। কুড়ি হাজার রাইফেলের বেশ বড়ো রকম একটা স্তূপ জমা আছে এই শহরে জারের সময়কার যুদ্ধের আমল থেকে — সবাই ভুলে গেছে ব্যাপারটা। এক চাষীর চালাঘরে পাঁজা হয়ে আছে। খবরটা জানলাম সেই চালার মালিকের কাছ থেকে, সে তো ওগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ব্যস্ত। আমরা তো ওগুলো জার্মানদের জন্যে ফেলে যেতে পারি না। আমার মতে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত, এবং সেটা এখনই, যাতে সকালের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে যায়। শুধু একটা মুশকিল আছে — আশেপাশের কুঁড়েঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা হল শহরের বাইরের সীমানায় যেখানে গরিব চাষীরা থাকে।'

স্ত্রুঝ্কভ নড়েচড়ে বসল তার চেয়ারে। গড়নটা তার বলিষ্ঠ, তার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেশ কয়েকদিন ক্ষুরের স্পর্শ পায় নি। 'পো-পো-পোড়াবো কেন ? তা-তার চেয়ে শ-শহরের লোকদের মধ্যে বি-বিলি করে দেওয়াই তো ভাল।'

বুলগাকভ তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন তার দিকে, 'বিলি করে দিতে বলছ ?'

'চমৎকার প্রস্তাব !' উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল ইয়েরমাচেঙ্কো। 'মজুরদের, আর অন্য যারা চায়, তাদের দিয়ে দাও ওগুলো। জার্মানরা যখন জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, তখন পাল্টা মার দেবার মতো অন্তত কিছু একটা হাতে থাকবে। ওরা তো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা করবেই। তারপরে যখন ব্যাপারটা বেশ পাকিয়ে উঠবে, তখন লোকে অস্ত্র-হাতে দাঁড়াতে পারবে। স্ত্রুঝ্কভ ঠিক বলেছে: রাইফেলগুলো বিলি করেই দিতে হবে। কিছু রাইফেল গ্রামে নিয়ে গেলেও মন্দ হয় না। চাষীরা লুকিয়ে রাখবে আর জার্মানরা যখন সৈন্যদের জন্যে সবকিছু নিয়ে নিতে থাকবে তখন রাইফেলগুলো কাজে লাগবে।'

বুলগাকভ হাসলেন, 'তা ঠিক। কিন্তু জার্মানরা নিশ্চয়ই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলবে, আর সবাই তখন হুকুম মানবে।'

'সবাই না,' আপত্তি তুলে বলল ইয়েরমাচেঙ্কো, 'কিছু লোকে মানবে, কিন্তু বাকি লোকে মানবে না।'

সপ্রশ্ন চোখে বুলগাকভ টেবিলের চারপাশে লোকদের দিকে তাকালেন।

'আমি রাইফেলগুলি বিলি করে দেওয়ার পক্ষে,' অল্পবয়সী মজুরটি ইয়েরমাচেঙ্কো আর স্ত্রুঝ্কভকে সমর্থন করল।

'আচ্ছা, তাহলে তাই ঠিক হল,' মত দিলেন বুলগাকভ। চেয়ার থেকে উঠে বললেন, 'এখনকার মতো তাহলে এই। সকাল পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম করতে পারি। ঝুখ্রাই এলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ইয়েরমাচেঙ্কো, তুমি বরং সান্ত্রীদের পাহারার জায়গাগুলো একবার তদ্বির করে এসো।'

আর সবাই চলে যাবার পর বুলগাকভ পাশের শোবার ঘরে গিয়ে গদিটার ওপরে ওভারকোট বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

* * *

পরের দিন সকালে পাভেল বাড়ি ফিরছিল বিদ্যুৎ-স্টেশন থেকে। সেখানে সে আজ পুরো একবছর হল কাজ করছে — চুল্লিতে যারা কয়লা জোগান দেয় তাদের একজন সাহায্যকারী হিসেবে।

রাস্তায় পড়েই সে বুঝল চলছে একটা বিশেষকিছু। শহর জুড়ে একটা অসাধারণ উত্তেজনা। যতই এগুতে থাকে ততই বেশি বেশি লোক দেখতে পায়, প্রত্যেকের কাঁধে একটা, দুটো, কখনও তিনটে করে রাইফেল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি চলে এল সে। লেশ্চিনস্কিদের বাগানবাড়িটার সামনে পাভেল তার আগের দিনের পরিচিত ফৌজী-লোকজনদের ঘোড়ায় চড়তে দেখতে পেল।

ছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পাভেল তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিল। আরতিওম তখনও বাড়ি আসে নি — মার কাছ থেকে শুনেই আবার ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সের্গেই ব্রুঝাকের সঙ্গে দেখা করতে এল। সে থাকে শহরের আরেক প্রান্তে।

সের্গেইয়ের বাবা ইঞ্জিন-ড্রাইভারের একজন সাহায্যকারী। নিজের ছোট্ট বাড়ি আর এক ফালি জমি আছে। সের্গেই বাড়ি নেই। মোটাসোটা ফ্যাকাশে-মুখ তার মা পাভেলের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকাল, 'শয়তান জানে গেছে কোথায়! সকালে উঠেই ছুটে বেরিয়ে গেল যেন ভূতে পেয়েছে। বলে গেল, কোথায়

যেন রাইফেল বিলি করছে। ওইখানেই গেছে বলে মনে হচ্ছে। তোদের এই শিকনি-ঝরা লড়্‌নেওয়ালাদের একচোট ধরে মার দেওয়া দরকার — একেবারেই বয়ে গেছিস তোরা। মায়ের দুধ মুখে শুকোতে না শুকোতেই একেবারে বন্দুক ধরবার জন্যে ছুটেছিস! হারামজাদাটাকে বলে দিস, এ বাড়িতে যদি একটাও কার্তুজ এনে ঢোকায়, তাহলে আমি ওকে জ্যান্ত ধরে চামড়া ছাড়িয়ে নেব। কে জানে কী এনে ঢোকাবে বাড়িতে আর আমাকে তখন তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। তুইও চলেছিস সেখানে, নাকি?'

কিন্তু সের্গেই-এর মায়ের বকুনি শেষ হবার আগেই পাভেল ছুট লাগাল রাস্তা বেয়ে।

বড় রাস্তার ওপর দুই কাঁধে দুই রাইফেল ঝোলানো একটা লোকের সঙ্গে তার দেখা।

ছুটে গেল পাভেল তার কাছে, 'কোথায় পেলেন এগুলো, হাঁ কাকা?'

'ওই ভের্খোভিনায়।'

যত তাড়াতাড়ি পারে চলল পাভেল। দুটো রাস্তার পরেই সে ধাক্কা খেল একটি ছেলের সঙ্গে — বেয়নেট-আঁটা একটা ভারি পদাতিকবাহিনীর রাইফেল টেনে নিয়ে চলেছে ছেলেটি। পাভেল থামাল তাকে, 'কোথায় পেলে বন্দুকটা?'

'পার্টিজানরা এগুলো দিয়ে দিচ্ছিল সবাইকে — ওইখানে, ইস্কুলের সামনে। কিন্তু আর তো নেই। সব খতম। সারা রাত্রি ধরে বিলি হয়েছে। এই আমার আরেকটা হল,' গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল ছেলেটি।

অত্যন্ত দমে গেল পাভেল খবরটা শুনে। 'হায়রে কপাল! বাড়ি না গিয়ে সরাসরি ওখানে গেলেই পারতাম।' নিজের ওপর ভারি রাগ হল তার, 'কী সুযোগটাই না হাতছাড়া হয়ে গেল!'

হঠাৎ একটা ফন্দি এসে গেল তার মাথায়। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'-তিন লাফে সে ধরে ফেলল এগিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে, এক টানে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা তার হাত থেকে।

'তোমার একটাই যথেষ্ট। এটা আমার,' এমন স্বরে সে বলল কথাটা যার কোন প্রতিবাদ নেই। উন্মুক্ত দিবালোকে এই রাহাজানির ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেটি ছুটে এল পাভেলের দিকে। কিন্তু সে একলাফে পিছিয়ে এসে বেয়নেটটা উঁচিয়ে ধরল তার প্রতিপক্ষের দিকে।

'দেখিস, নইলে জখম হবি,' চেঁচিয়ে উঠল পাভেল।

প্রচণ্ড ক্ষোভে কেঁদে ফেলল ছেলেটি, অসহায় ক্রোধে গাল দিতে দিতে ছুটে

পালাল। নিজের ওপর ভারি খুশি হয়ে বাড়ির দিকে পা চালাল পাভেল। এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে ঢুকল চালাঘরটায়, চালার নিচে আড়কাঠের ওপর জোগাড়-করা জিনিসটিকে রেখে খুশিতে শিস দিতে দিতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

* * *

ইউক্রেনে গরমকালের সন্ধ্যাগুলি অতি সুন্দর — বিশেষ করে শেপেতোভ্কার মতো ছোট শহরগুলোয়, যেখানে প্রান্তসীমা গ্রামের সঙ্গেই মেলে বেশি।

এখানকার শান্ত গ্রীষ্মসন্ধ্যা সমস্ত অল্পবয়সীদের টেনে আনে ঘরের বাইরে। জোড়ায় জোড়ায়, দলে দলে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে বারান্দায়, বাড়ির সামনে ছোট ছোট বাগানগুলিতে, কিংবা রাস্তার পাশে জড়ো করা কাঠের স্তূপের ওপর বসে থাকতে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় তাদের খুশি-ভরা হাসি আর গানের প্রতিধ্বনি ওঠে।

ফুলের গন্ধে ভারি বাতাস কেঁপে কেঁপে যায়। আকাশের গভীরে তারাগুলি সূচীমুখের মতো সূক্ষ্ম অস্পষ্টতায় জ্বল জ্বল করে, আর দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যায় গলার স্বর...

পাভেল অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে বড় ভালবাসে। মিষ্টি সুরে ভরা এই যন্ত্রটিকে সে কোলের ওপর সাবধানে রেখে ডবল-সারি চাবিগুলোর ওপরে আলতোভাবে আঙুলগুলি দ্রুত চালিয়ে দেয়। বেরিয়ে আসে খাদের সুরে একটা দীর্ঘশ্বাস আর এক দমক মন-নাচানো সুরঝঙ্কার...

বাজনাটির ভাঁজ-করা হাপর ক্রমান্বয়ে খুলে গিয়ে আর বন্ধ হয়ে যখন খুশির আমেজ-ভরা সুর বের করতে থাকে, তখন কি আর চুপ করে থাকা যায়! জানতে পারার আগেই পা-দুটি সুরের গভীরতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার কী আনন্দ!

সেদিন সন্ধ্যেটা ছিল একটু বিশেষ আনন্দের। পাভেলদের বাড়ির বাইরে একটা কাঠের স্তূপের ওপরে ভিড় জমিয়ে তুলেছে আমুদে একদল তরুণ। এদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিতে উচ্ছল গালোচ্কা — পাভেলদের পাশের বাড়ির রাজমিস্ত্রির মেয়ে। নাচতে আর গাইতে ভালো লাগে গালোচ্কার। তার গলার স্বর গভীর, নরম আর চড়া।

গালোচ্কাকে একটু ভয় ভয় করে চলে পাভেল, কারণ বড়ো মুখরা মেয়েটা। পাভেলের পাশে বসে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসছিল গালোচ্কা।

'কী আশ্চর্য মানুষ হয়ে যাও তুমি ওই বাজনাটা বাজাবার সময়!' বলল গালোচ্‌কা, 'বড্ড ছোট তুমি — এই যা আপসোস, নইলে দিব্যি বর হতে পারতে তুমি আমার! অ্যাকর্ডিয়ন বাজানেওয়ালা ছেলেদের ভারি ভালবাসি আমি, মনটা আমার একেবারে গলে যায়।'

চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে গেল পাভেলের — ভাগ্যিস অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই কেউ দেখতে পেল না সেটা। প্রগল্‌ভা মেয়েটির কাছ থেকে একটু সরে বসল পাভেল, কিন্তু মেয়েটি তাকে জাপটে ধরেই রইল। হাসতে হাসতে বলল, 'ওগো পালিয়ে যেও না আমায় ছেড়ে। তুমি যে আমার বড় ভালোবাসার মানুষ।'

তার উন্নত বুকের স্পর্শ লাগল পাভেলের কাঁধে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত নাড়া খেল পাভেলের মন নিজের অজ্ঞাতেই, আর অন্য সবার উচ্ছ্বসিত হাসি উঠে পথের অভ্যস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দিল।

গালোচ্‌কার কাঁধে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে পাভেল বলল, 'সরে বোসো। বাজাবার জায়গা নেই।'

ফলে আরেক দমক হাসি, কৌতুক আর ঠাট্টার হুল্লোড় উঠল।

পাভেলের উদ্ধারে এগিয়ে এল মারুসিয়া, 'করুণ সুরের কিছু একটা বাজাও, পাভেল, মনের মোচড় লাগাবার মতো একটা কিছু।'

ধীরে ধীরে ভাঁজ ছড়ানো হাপরটার চাবিগুলোকে সযতনে আদর করে গেল পাভেলের আঙুল, আর একটা পরিচিত প্রিয় গানের সুরে ভরে উঠল বাতাস। গালোচ্‌কাই প্রথম গলা মেলাল, তারপরে মারুসিয়া, তারপরে আর সবাই:

কুটির-কোণে বিহানবেলায়
জুটল যত নেয়ে,
বিধুর মোরা মধুর
সেই ব্যথার গান গেয়ে...

তরুণ গাইয়েদের কেঁপে কেঁপে ওঠা কচি তাজা গলার স্বর ভেসে ভেসে গেল দূর বনপ্রান্ত পর্যন্ত।

'পাভেল!' আর্তিওমের গলার ডাক।

বাজনার হাপরটা চেপে বন্ধ করে পাভেল বাঁধনগুলো আটকে দিল, 'আমাকে ডাকছে ওরা। আমি চলি।'

মারুসিয়া তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বসাবার চেষ্টা করল, 'আর একটু বাজাও না! এত তাড়া কিসের গো?'

কিন্তু বাধা মানল না পাভেল, 'পারব না। কাল আবার গান-বাজনা হবে, এখন যেতে হবে আমাকে। ডাকছে আরতিওম।' বলেই সে রাস্তাটা ছুটে পার হয়ে সামনে ছোট্ট বাড়িতে ঢুকল।

আরতিওম ছাড়া আরও দু'জন মানুষকে ঘরে দেখতে পেল সে: রমান — আরতিওমের এক বন্ধু, অন্যজন অপরিচিত। একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল তারা।

'ডেকেছ আমাকে?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

তার দিকে মাথা নেড়ে অপরিচিত মানুষটিকে বলল আরতিওম, 'এই সেই আমার ভাই, যার কথা বলছিলাম।'

অপরিচিত মানুষটি পাভেলের দিকে গিঁটেপড়া হাত বাড়িয়ে দিল।

'শোন্ পাভেল,' আরতিওম বলল তার ভাইকে, 'বিদ্যুৎ-স্টেশনের ইলেকট্রিশিয়ানের অসুখ করেছে বলেছিলি। তার জায়গায় কোন ভাল লোক পেলে ওরা নেবে কিনা, সেটা তুই কাল খোঁজ নিবি — এটা করতে হবে তোকে। যদি নেয়, তাহলে জানাবি আমাদের।'

অপরিচিত মানুষটি বাধা দিয়ে বলল, 'না তা করার দরকার নেই। আমি বরং কাল ওর সঙ্গে গিয়ে মালিকের সঙ্গে নিজেই কথা বলব।'

'ওদের লোক দরকার তো বটেই। স্তান্কোভিচ অসুস্থ বলেই তো আজ বিদ্যুৎ-স্টেশনে কোন কাজ হয় নি। মালিক দু'বার দেখতে এসেছিল — স্তান্কোভিচের জায়গায় কাজ করতে পারে এমন একজনের খোঁজে চুঁড়ে বেরিয়েছে সে, কাউকে পায় নি। মোটে একজন কয়লা-জোগানদারকে নিয়ে মেশিন চালাতে সে ভরসা পায় নি। এদিকে ইলেকট্রিশিয়ানের টাইফাস হয়েছে।'

'তাহলে তো ঠিক আছে,' বলল অপরিচিত লোকটি, 'আমি কাল এসে তোমায় ডেকে নিয়ে একসঙ্গে যাব ওখানে।'

'বেশ।'

পাভেলের দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত মানুষটির শান্ত ধূসর চোখের দিকে। সে পাভেলকে খুঁটিয়ে দেখছিল। দৃঢ় আর অচঞ্চল সন্ধানী চাউনির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল পাভেল। আগন্তুকের গায়ে ধূসর রঙের একটা কোর্তা, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোতাম লাগানো। জামাটা যে তার গায়ে বেশ একটু আঁটসাঁট হয়েছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায় — কারণ, তার চওড়া বলিষ্ঠ পিঠের দিকে সেলাইটায় রীতিমতো টান পড়েছে। পেশীবহুল, ষাঁড়ের মতো গলাটায় তার মাথা আর ঘাড় জোড়া পড়েছে। লোকটার সমস্ত শরীরে পুরনো ওক্ গাছের দৃঢ় বলিষ্ঠতার আভাস।

আরতিওম আগন্তুককে ঝুখ্‌রাই-নাম ধরে সম্বোধন করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানিয়ে বলল, 'কাল তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কাজটা ঠিক করে ফেলবে।'

* * *

সৈন্যদলটা চলে যাবার তিনদিন পরে জার্মানরা শহরে ঢুকল। স্টেশনটা ইদানীং জনহীন হয়ে থাকছিল, তাদের আসার খবরটা ঘোষিত হল সেই স্টেশনে একটা ট্রেনের সিটি দিয়ে। শহরে বিদ্যুতের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ল, 'জার্মানরা আসছে!'

খোঁচা-খাওয়া পিঁপড়ের ঢিবির মতো চঞ্চল হয়ে উঠল শহরটা। শহরবাসীরা যদিও কিছুদিন থেকে জানত জার্মানদের আসার কথা, তবু তারা কেমন যেন কথাটা ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর জার্মানরা শুধু যে কাছাকাছি এসে গেছে তাই নয়, বাস্তবিকপক্ষে তারা এখানে, এই শহরের মধ্যেই চলে এসেছে। বেড়া আর দরজার পিছন থেকেই শহরবাসীরা উঁকি দিল, রাস্তায় বেরুতে সাহস হয় না।

একজনের পেছনে আর একজন — এইভাবে বড় রাস্তার দু'পাশে দুই সারি বেঁধে জার্মানরা ঢুকল। পরনে জলপাই-রঙের মেটে সবুজ সামরিক উর্দি, তারা রাইফেল বাগিয়ে চলেছে। চওড়া ছুরির মতো বেয়নেট গোঁজা তাদের রাইফেলের ডগায়, মাথায় ভারি লোহার হেল্‌মেট, পিঠে বাঁধা বিরাট বোঁচকা। স্টেশন থেকে শহরে ঢুকছে তারা এক অফুরন্ত ধারায় — সন্তর্পণে, যেকোন মুহূর্তে আক্রমণ রুখবার জন্য তৈরি — যদিও তাদের আক্রমণ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

সামনে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে দু'জন অফিসার, হাতে তাদের মাউজার-পিস্তল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে তাদের দোভাষী — সে হেট্‌ম্যান বাহিনীর সার্জেণ্ট-মেজর, গায়ে একটা নীল ইউক্রেনীয় কোট, মাথায় লম্বা পশমী টুপি।

শহরের মাঝখানে ময়দানটায় সারবন্দি হয়ে দাঁড়াল জার্মানরা। দামামা বেজে উঠল। শহরবাসীদের মধ্যে যারা একটু বেশি সাহসী, তাদের একটা জোট ভিড় জমে উঠল। ইউক্রেনীয় কোট-পরা হেট্‌ম্যানের লোকটা ডাক্তারখানার উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠে জার্মান কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর কর্ফ-এর একটা হুকুমনামা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাল সবাইকে:

১

এতদ্দ্বারা আমি আদেশ জারি করিতেছি:

এই শহরের সমস্ত অধিবাসীকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই জমা দিতে হইবে। এই আদেশ অমান্যের শাস্তি — গুলিতে মৃত্যু।

২

এতদ্দ্বারা শহরে সামরিক আইন জারি করা হইল এবং শহরের অধিবাসীদিগকে রাত্রি আটটার পর রাস্তায় বাহির হইতে নিষেধ করা যাইতেছে।

মেজর কর্ফ
শহরের কম্যাণ্ড্যাণ্ট

আগে যে বাড়িটা পৌরশাসনসভা ব্যবহার করত এবং বিপ্লবের পরে যেটা শ্রমিক-প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যালয় হয়েছিল, জার্মান কম্যাণ্ডাটুর সেইখানে ঘাঁটি গাড়ল। দেউড়িতে একজন সান্ত্রী খাড়া হল — বিরাট একটা রাজকীয় ঈগল-শোভিত কুচকাওয়াজের শিরস্ত্রাণ তার মাথায়। নাগরিকরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবে, তার জন্য গুদামের জায়গা ওই বাড়িটারই পেছনের আঙিনায়।

গুলি করে মারার শাসানিতে ভয় পেয়ে শহরবাসীরা সারাদিন ধরে অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা দিতে লাগল। বড়োরা দেখা দিল না, কিশোর আর বাচ্চা ছেলেরা নিয়ে এল সেগুলো। কাউকে আটকাল না জার্মানরা।

যারা সশরীরে আসতে চাইল না, তারা রাত্রে অস্ত্রগুলো পথের ওপর ফেলে রেখে গেল। সকালে জার্মান চৌকিদাররা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা সামরিক গাড়িতে জড়ো করে কম্যাণ্ড্যাটুরে নিয়ে গেল।

বেলা একটায় অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবার চব্বিশ ঘণ্টা সময় শেষ হবার পর জার্মান সৈন্যরা তাদের সংগৃহীত মালের হিসেব নিতে বসল: চোদ্দ হাজার রাইফেল। তার মানে ছ'হাজার জমা পড়ে নি। যে ব্যাপক খানাতল্লাশি তারা চালাল, তাতে ফল হল নগন্য।

দু'জন রেলশ্রমিকের বাড়িতে লুকানো রাইফেল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের শহরের বাইরে ইহুদিদের পুরনো গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে পরের দিন ভোরবেলায় গুলি করে মারা হল।

*   *   *

কম্যাণ্ড্যাণ্টের হুকুম শুনেই আরতিওম ছুটে বাড়ি এল। পাভেলকে আঙিনায় দেখে তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন অস্ত্র এনেছিলি নাকি বাড়িতে?'

রাইফেলের কথা মোটেই বলার ইচ্ছে ছিল না পাভেলের, কিন্তু দাদার কাছে মিথ্যা বলতে পারল না। সোজাসুজি বলল সব কথা।

দু'জনে মিলে তারা গেল সেই চালাঘরটায়। আড়কাঠের ওপর লুকানো জায়গাটা থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিয়ে আরতিওম সেটার বল্টু আর বেয়নেট খুলে নলটা ধরে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আছাড় মারল বেড়ার একটা খুঁটির ওপর — চুরমার হয়ে গেল বাঁটটা। রাইফেলটার বাকি অংশটুকু বাগানের ওপারে একটা পোড়ো জমিতে ছুঁড়ে দিয়ে আরতিওম বেয়নেট আর বল্টুটা পায়খানার গর্তে ফেলে দিল।

কাজটা শেষ হলে আরতিওম তার ভাইয়ের দিকে ফিরল, 'তুই আর কচি খোকাটি নোস্, পাভেল। বন্দুক নিয়ে খেলা করা চলে না, তাও তোর জানা উচিত। খবরদার, এরকম কোন কিছু আনবি না বাড়িতে — ভয়ানক জরুরী কথা এটা। ইদানীং এ ধরনের ব্যাপারে প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। আর ওসব চালাকি-টালাকি করবি না কক্ষণো — কারণ ওরকম কোন জিনিস যদি তুই বাড়িতে নিয়ে আসিস আর ওরা সেটা ধরে ফেলে, তাহলে প্রথমেই আমাকে গুলি করে মারবে। তোর মতো বাচ্চাকে তো ওরা ছোঁবে না। ভয়ানক সাংঘাতিক দিনকাল — বুঝলি তো!'

পাভেল প্রতিজ্ঞা করল।

দুই ভাই যখন আঙিনা পার হয়ে বাড়ি ঢুকছে, তখন লেশ্চিনস্কিদের ফটকে একটা গাড়ি এসে থামল। উকিলমশাই, তাঁর বউ আর দুই ছেলেমেয়ে — নেলি আর ভিক্তর — নামল।

'এই যে, সুখের পায়রাগুলো আবার ফিরে এসেছে দেখছি বাসায়,' রেগে গজগজ করল আরতিওম, 'এইবার তো মজা জমবে। হতভাগা ব্যাটারা!' ভেতরে চলে গেল সে।

রাইফেলটার কথা ভেবে সারাদিন মন খারাপ হয়ে রইল পাভেলের। ইতিমধ্যে ভীষণ কাজে ব্যস্ত তার বন্ধু সের্গেই। পুরনো পরিত্যক্ত একটা চালাঘরের দেয়ালের ঠিক পাশেই মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ছিল সে। শেষ পর্যন্ত তৈরি হল খোঁদলটা। ভালো করে চটে মোড়া আনকোরা রাইফেল তিনটি তার মধ্যে রাখল সের্গেই। লালরক্ষী দলটা যখন জনসাধারণের মধ্যে রাইফেল বিলি করছিল, তখনই ও এগুলো জোগাড় করেছিল,

জার্মানদের কাছে এগুলো ফেরত দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না। সারা রাত সে কঠিন পরিশ্রম করেছে যাতে এগুলোকে নির্বিঘ্নে লুকিয়ে রাখা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

গর্তটা ভরাট করে, মাটিটা পায়ে চেপে সমান করে দিয়ে সে তার ওপরে একরাশ জঞ্জাল জমা করে দিল। পরিশ্রমের ফলটা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সে তার টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছল, 'এইবার তল্লাশি করুক ওরা। যদিও বা পায় খুঁজে, কে যে এখানে রেখেছে তা জানতে পারবে না, কারণ এই চালাঘরটার তো মালিক নেই কেউ।'

* * *

পাভেল আর সেই গম্ভীর-মুখ ইলেকট্রিশিয়ানটির মধ্যে ওদের নিজেদের অজানতেই একটা দৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ঝুখ্‌রাইয়ের এই বিদ্যুৎ-স্টেশনে পুরো একমাস কাজ করা হল। সে এই কয়লা-জোগানদারের সহকারীটিকে দেখিয়ে দিয়েছে কী ভাবে ডাইনামোটা তৈরি, কী করে সেটা চলে।

বুদ্ধিমান চটপটে কিশোরটিকে এই জাহাজী মানুষটির ভালো লেগেছে। ছুটির দিনে সে প্রায়ই আরতিওমের কাছে যায়। মায়ের সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট-ভাবনাচিন্তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে শোনে, বিশেষ করে ছোট ছেলেটার দুষ্টুমির কথা বলে মা যখন অভিযোগ করে। মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার ওপরে চিন্তাশীল আর ধীর ঝুখ্‌রাই একটা শান্ত নিশ্চয়তার প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গ পেয়ে পাভেলের মা তার দুঃখ ভোলে আর হাসিখুশি হয়ে ওঠে।

একদিন পাভেল যখন বিদ্যুৎ-স্টেশনের আঙিনায় জ্বালানি কাঠের উঁচু উঁচু স্তূপগুলির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, ঝুখ্‌রাই তাকে আটকাল।

'তোমার মা বলছিলেন, তুমি নাকি মারামারি করতে খুব ভালোবাস,' হেসে বলল ঝুখ্‌রাই, 'উনি বলছিলেন, ছেলেটা লড়াইয়ের মোরগের মতো ডানপিটে।' সমর্থনের হাসি হেসে ঝুখ্‌রাই বলল, 'আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, লড়ুনেওয়ালা হলে কোন ক্ষতি নেই যদি জানা থাকে কার সঙ্গে লড়তে হবে আর কেন লড়াই করতে হবে।'

পাভেল ঠিক বুঝতে পারল না ঝুখ্‌রাই ঠাট্টা করছে, না সত্যিই বলছে কথাগুলো। সে জবাব দিল, 'আমি বিনা কারণে লড়াই করি না। যা ন্যায্য আর ঠিক তার জন্যেই লড়ি।'

'ঠিকমতো লড়াই কী করে করতে হয়, আমার কাছে শিখতে চাও?' অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞেস করে বসল ঝুখ্‌রাই।

'ঠিকমতো মানে ?' পাভেল তাকাল তার দিকে অবাক হয়ে।

'দেখবে।'

তারপর মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে পাভেল একটা ছোট বক্তৃতা শুনল ঝুখ্রাইয়ের কাছে।

এ ব্যাপারে পাভেল খুব সহজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি। অনেকবার তাকে ঝুখ্রাইয়ের ঘুষির ধাক্কায় হড়কে মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে হয়েছে। কিন্তু সে নিজেকে একাগ্র আর ধৈর্যবান শিষ্য বলে প্রমাণ করল — শেষে কৌশলটা আয়ত্ত করে ফেলল।

একদিন যখন গরম পড়েছে, পাভেল ক্লিমকাদের বাড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে কী করবে ভাবতে ভাবতে ঠিক করল — তাদের বাড়ির পেছনে বাগানের কোণে চালাঘরটার চালে তার প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে বসবে। পেছনের উঠোন পার হয়ে বাগানে এসে ভাঙা তক্তাগুলো বেয়ে চালাটার ওপরে উঠল সে। চালাটার ওপর নুয়ে পড়া চেরি গাছগুলোর ঘন শাখা ফাঁক করে করে চালের মাঝখানে এগিয়ে এসে শুয়ে পড়ে রোদ পোয়াতে লাগল পাভেল।

চালাটার একটা পাশ লেশ্চিন্স্কিদের বাগানের ওপর কিছুটা এগিয়ে গেছে। চালের এক প্রান্ত থেকে গোটা বাগানটা আর বাড়িটার একটা দিকের সবটাই দেখা যায়। ধার দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে পাভেল উঠোনের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। লেশ্চিন্স্কিদের ওখানে যে জার্মান লেফ্টেন্যাণ্ট্ বাসা নিয়েছে, তার আর্দালিটা কর্তার পোশাক ঝাড়ছে।

এই লেফ্টেন্যাণ্ট্টিকে পাভেল কয়েকবার ফটকের কাছে দেখেছে। বেঁটে, মোটা, লালমুখো লোকটির ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে প্যাঁশ্নে-চশমা, মাথায় চকচকে চামড়ার কানাওয়ালা টুপি। পাভেল আরও জানত, লোকটা থাকে পাশের ঘরে, যার জানলাটা বাগানের দিকে খোলে, আর ওই চালাটার চাল থেকে দেখা যায় ঘরটা।

লেফ্টেন্যাণ্ট্ সেই সময় টেবিলে বসে লিখছিল। একটু পরেই লেখাটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে গেল। কাগজটা আর্দালিকে দিয়ে বাগানের পথ ধরে ফটকের দিকে গেল। লতাপাতায় ছাওয়া বাগান-ঘরটার কাছে এসে সে ভেতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। বাগান-ঘর থেকে নেলি লেশ্চিনস্কায়া বেরিয়ে এল। লেফ্টেন্যাণ্ট্ তার হাত ধরল, দু'জনে একসঙ্গে ফটকের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

পাভেল তার ঘাঁটি থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমের আমেজ আসতেই সে চোখ বন্ধ করতে যাবে — এমন সময় দেখতে পেল আর্দালিটা লেফ্টেন্যাণ্টের ঘরে ঢুকছে। একটা উর্দি ঝুলিয়ে রেখে বাগানের দিকে জানলাটা

খুলে ঘরটা ঝাড়পোঁছ করল সে। তারপর বেরিয়ে গেল পেছনের দরজাটা বন্ধ করে। এর পরে পাভেল তাকে দেখতে পেল আস্তাবলের কাছে যেখানে ঘোড়াগুলো বাঁধা।

খোলা জানলাটা দিয়ে সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল পাভেল। টেবিলের ওপরে রাখা একটা কোমরবন্ধনী আর চকচকে কি একটা জিনিস।

অদম্য একটা কৌতূহলের টানে পাভেল চুপিসারে নিঃশব্দে চাল থেকে চেরি গাছ বেয়ে নেমে এল লেশ্চিনস্কিদের বাগানে। গুঁড়ি মেরে বাগানটা পার হয়ে জানলার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে। সামনেই টেবিলের ওপরে কাঁধ-টানা পরানো একটা কোমরবন্ধনী আর একটা চামড়ার খাপে চমৎকার বারো-টোটার একটা মানলিশের পিস্তল।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো পাভেলের। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল, কিন্তু বেপরোয়া দুঃসাহসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। ঘরে ঢুকেই খাপটাকে হাতিয়ে নতুন কালো চকচকে অস্ত্রটাকে টেনে বের করে নিয়েই বাইরে লাফিয়ে পড়ল। চারিদিকে দ্রুতচোখে দেখে নিয়ে সাবধানে পিস্তলটাকে পকেটে ফেলেই একছুটে বাগান পেরিয়ে এল চেরি গাছটার কাছে। বাঁদরের মতো তড়তড় করে সে উঠে এল চালে, তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াল পেছনে দেখবার জন্য। আর্দালিটা তখনও খোশ মেজাজে সহিসটার সঙ্গে কথা বলছে, বাগানটা নিস্তব্ধ আর জনহীন। অন্য দিক দিয়ে নেমে এসে পাভেল ছুটে বাড়ি এল।

মা রান্নাঘরে খাবার রাঁধতে ব্যস্ত, তাকে বিশেষ লক্ষ্য করল না।

একটা তোরঙ্গের পাশ থেকে খানিকটা ছেঁড়া কাপড় টেনে নিয়ে পকেটে গুঁজে মা'র অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে উঠোনটা পার হয়ে, এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ল বনের দিকে যাবার রাস্তায়। উরুর ধাক্কায় ভারি পিস্তলটির দোলানি বন্ধ করার জন্য সেটাকে চেপে ধরে যত তাড়াতাড়ি পারে পাভেল বনে ছুটে এল একটা পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজার ধ্বংসাবশেষের দিকে।

পাদুটো তার যেন মাটি ছোঁয় নি, বাতাস শিস দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে।

পুরনো পাঁজাটার চারিদিক নিস্তব্ধ। কাঠের চাল এখানে-ওখানে ধসে পড়েছে, ভাঙা ইঁটের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ, ভেঙে পড়া উনুন—দৃশ্যটা মনকে দমিয়ে দেবার মতো। আগাছায় ভর্তি জায়গাটা। পাভেল আর তার দুই বন্ধু এখানে মাঝে মাঝে খেলতে আসে, তাছাড়া আর কেউ এদিকে আসে না। পাভেলের অনেকগুলো গোপন জায়গা জানা আছে, যেখানে চুরি করা এই সম্পদটাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যায়।

একটা চুল্লির ফাঁকে উঠে সে সাবধানে চারিদিকে দেখল, কিন্তু কাউকে দেখা গেল

না। শুধু পাইন গাছগুলো একটা নরম নিঃশ্বাস ফেলল আর মন্থর বাতাস নাড়া দিয়ে গেল রাস্তার ধুলোকে। বাতাসে কড়া রজনের গন্ধ।

কাপড়ে জড়ানো পিস্তলটাকে পাভেল চুল্লির মধ্যে মেঝের এক কোণে রেখে সেটাকে পুরনো ইঁটের একটা স্তূপের নিচে চাপা দিল। বেরোবার সময় পুরনো পাঁজাটার ঢোকার মুখ আলগা ইঁটে ভরাট করে ঠিক জায়গাটা বেশ ভালো করে দেখে নিল, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হল আস্তে আস্তে। লক্ষ্য করল, হাঁটুদুটো তার কাঁপছে।

'এর ফল কী হবে কে জানে!' ভাবতে ভাবতে বিপদের আশঙ্কায় তার মন ভারি হয়ে উঠল।

বাড়ি ফেরাটা এড়াবার জন্য সে এল বিদ্যুৎ-স্টেশনে — সাধারণত যে-সময়ে আসে তার একটু আগেই। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে মেশিন-ঘরের চওড়া দরজা খুলে ফেলল। ছাই পরিষ্কার করে বয়লারে জল পাম্প্ করে নিয়ে আগুনটা জ্বালাতে জ্বালাতে ভাবতে লাগল — লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে এতক্ষণ না-জানি কী হচ্ছে।

এগারোটা নাগাদ ঝুখ্রাই এসে পাভেলকে বাইরে ডাকল। খাটো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়িতে আজ খানাতল্লাশি হল কেন?'

চমকে উঠল পাভেল, 'খানাতল্লাশি?'

অল্প একটু থেমে বলল ঝুখ্রাই, 'আমার ভাল মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কিসের খোঁজে ওরা এসেছিল আন্দাজ করতে পারো কিছু?'

কিসের খোঁজে যে ওরা এসেছিল তা পাভেল খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু পিস্তল-চুরির কথাটা ঝুখ্রাইকে বলার ঝুঁকি সে নিতে পারল না। আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি আরতিওমকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'গ্রেপ্তার কেউ হয় নি, কিন্তু ওরা বাড়ির সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।'

কথাটায় সামান্য একটু আশ্বস্ত হল পাভেল, যদিও তার উদ্বেগ কাটল না। কয়েক মিনিট সে আর ঝুখ্রাই দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইল প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে। একজন জানে খানাতল্লাশি কেন হয়েছে, ফলাফল ভেবে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অন্যজন সেটা জানে না বলেই সচকিত।

ঝুখ্রাই ভাবছিল, 'হতভাগারা বোধহয় আমার সম্বন্ধে কোনকিছু টের পেয়েছে। আরতিওম আমার কথা কিছু জানে না, কিন্তু খানাতল্লাশিটা হল কেন? আরও সাবধান হতে হবে।'

একটাও কথা না বলে দু'জনে যে যার কাজে চলে গেল।

ওদিকে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে দারুণ গণ্ডগোল বেধে গেছে।

পিস্তলটা নেই দেখে লেফ্টেন্যাণ্ট্ ডেকে পাঠিয়েছিল তার আর্দালিকে। আর্দালি

বলল, অস্ত্রটা নিশ্চয়ই চুরি গেছে। ফলে, অফিসারটি মহা রেগে তার সংযম হারিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একটি ঘুষি ঝেড়ে বসল আর্দালির কানের ওপর। ঘুষিতে টলতে টলতেও আর্দালি কাঠের পুতুলের মতো কেতামাফিক খাড়া দাঁড়িয়ে কাচুমাচু হয়ে নিরীহভাবে চোখ পিটপিট করতে লাগল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তারই প্রতীক্ষায়।

জবাবদিহি করার জন্য ডাকা হল উকিলমশাইকে। চুরির ঘটনায় ভয়ানক চটেমটে তিনি তো লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন তাঁর বাড়িতে এমন-ধারা ব্যাপার ঘটতে পেরেছে বলে।

ভিক্তর লেশ্চিন্‌স্কি তার বাবাকে বলল, পিস্তলটা পড়শীরা — বিশেষ করে ওই ক্ষুদে শয়তান পাভেল করচাগিন — চুরি করে থাকতে পারে। ছেলের সিদ্ধান্তটা বাবা লেফ্‌টেন্যাণ্টের কানে তুলে দিতে দেরি করলেন না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশির হুকুম দিল।

খানাতল্লাশিটা নিষ্ফল হল এবং হারানো পিস্তলের এই ঘটনাটায় পাভেল দেখল যে এমন ঝুঁকির কাজও অনেক সময়ে সফল হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে তোনিয়া তাকিয়ে দেখছিল জমকালো পপ্‌লার গাছের সারি দেওয়া তার বড় পরিচিত বাগানটিকে। মৃদু হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে গাছগুলো। যেন বিশ্বাসই হয় না যে এই যে জায়গায় তার ছেলেবেলা কেটেছে, সেখান থেকে যাবার পর পুরো একটি বছর পার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মাত্র গতকাল বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আবার আজ সকালের ট্রেনেই ফিরে এসেছে।

বদলায় নি কিছুই: সারি সারি র‍্যাস্প্‌বেরির ঝাড়গুলো সযতনে ছাঁটাকাটা আছে বরাবরের মতোই। জ্যামিতিক নির্দিষ্টতায় টানা বাগানের পথগুলো দু'ধারে মায়ের সেই প্রিয় প্যান্‌সি-ফুলের গাছে সাজানো। বাগানের সবকিছুই তকতকে ঝক্‌ঝকে। সর্বত্র যেন এক উদ্যানপালনবিশারদের নিপুণ হাতের ছাপ। পরিষ্কার আর নিখুঁতভাবে টানা পথগুলো দেখতে একটু একঘেয়ে লাগল তোনিয়ার।

যে উপন্যাসটা পড়ছিল, তুলে নিল সেটা। বারান্দার দরজাটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বাগানে। রঙ্‌-করা ছোট ফটকটা ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে জল-পাম্পের স্টেশনটার পাশে পুকুরটার দিকে।

সাঁকোটা পার হয়ে এসে পড়ল গাছের সারি-দেওয়া রাস্তাটায়। তোনিয়ার ডান দিকে উইলো আর অ্যাল্‌ডার-ঝোপে ঘেরা পুকুরটা, বাঁ দিকে শুরু হয়েছে বন।

পুরনো পাথর-খনিটার কাছে পুকুরটার ধারে যাবে তোনিয়া — এমন সময়ে জলের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মাছ-ধরা ছিপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা বাঁকা উইলো গাছের গুঁড়ির ওপরে ভর দিয়ে ডালপালাগুলো ফাঁক করে সামনে দেখল — রোদে-পোড়া, খালি-পা, হাঁটুর ওপরে প্যাণ্ট-গুটানো একটা ছেলে, তার পাশে মরচে-ধরা একটা টিনের পাত্রে কতকগুলো কেঁচো। ছেলেটা মাছ ধরায় নিবিষ্ট বলে তাকে দেখতে পায় নি।

'এখানে মাছ পাওয়া যাবে বলে মনে করেছ নাকি ?'

ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্তভাবে তাকাল পাভেল।

উইলো গাছটা ধরে জলের ধারে ঝুঁকে-পড়া একটি মেয়ে, তার পরনে সাদা নাবিক-ছাঁদের একটা ব্লাউজ, গলায় নীল ডোরা-কাটা কলার, হালকা-ধূসর খাটো স্কার্ট। রোদে-পোড়া তার নিটোল পায়ে খয়েরি রঙের জুতো আর রঙীন বেড়-দেওয়া ছোট আঁটো মোজা। বাদামী চুলের গোছা মোটা বিনুনিতে বাঁধা।

ছিপ-ধরা হাতখানার অল্প একটু কাঁপুনিতে সুতোয় বাঁধা হাঁস-পালকের ফাৎনাটা নড়ে উঠল মসৃণ জলের বুকে ঢেউয়ের চক্র তুলে।

'দেখ, দেখ, টোপ গিলেছে !' উত্তেজিত গলায় স্বর উঠল পাভেলের পেছনে।

এইবারে পাভেল তার স্থৈর্য সম্পূর্ণ হারিয়ে সুতোটায় এত জোরে টান দিল যে ডগায় বেঁধা পাক-খাওয়া পোকাটা সমেত বঁড়শিটা জল থেকে বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠল।

অত্যন্ত বিরক্ত মনে পাভেল ভাবল, 'মাছ ধরার দফা রফা হল, ধুত্তোরি ছাই ! কোথা থেকে জুটল এসে মেয়েটা এখানে !' ছিপ টানার বোকামিটুকু সামলে নেবার জন্য আরও দূরে ছুঁড়ে দিল বঁড়শিটা ঠিক এমন একটা জায়গায় যেখানে সেটা ফেলা উচিত ছিল না — বঁড়শিটা গিয়ে পড়ল দুটো কাঁটা-শ্যাওলার মাঝখানে যেখানে সুতোটার সহজেই আটকে যাবার সম্ভাবনা।

কী ঘটেছে সেটা বুঝতে পারল পাভেল এবং মাথাটা না ফিরিয়ে তীব্র ফিসফিসানির স্বরে ওপরে পাড়ে বসা মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'চুপ করে থাকুন ত। চেঁচিয়ে মাছগুলোকে ভড়কে দেবেন দেখছি।'

ওপর থেকে ঠাট্টার স্বরে শোনা গেল, 'আপনাকে দেখা মাত্রই অনেক আগে মাছ ভেগেছে। তাছাড়া, দিনের বেলায় আবার কেউ মাছ ধরে নাকি ? ওঃ, কি আমার মাছ-শিকারী !'

পাভেল ভদ্র ব্যবহার করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এটা বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হল তার। দাঁড়িয়ে উঠে চোখের ওপর নামিয়ে দিল টুপিটা ঠেলে — চটে গেলে সে এরকম করে। দাঁত চেপে, যতদূর সম্ভব ভদ্র ভাষায় বিড়বিড় করে বলল, 'এখান থেকে আপনি সরে পড়লেই ভালো হয়।'

তোনিয়ার চোখদুটো একটু কুঁচকে এল, সেই চোখে হাসির নাচ, 'আমি কি সত্যিই আপনার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি?'

তার গলায় ঠাট্টার সুরটা চলে গেছে, বন্ধুত্বমূলক একটা আপোসের সুর এসেছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ভদ্র মহিলাটিকে সত্যিই দুটো কড়া কথা শোনাবে বলে পাভেল মনস্থির করেছিল, কিন্তু এখন সে নিরস্ত্র হয়ে পড়ল।

'দেখতে চান তো দেখুন। জায়গার জন্যে আমার কোন আফশোস নেই,' বলল সে, তারপর আবার বসে পড়ল ফাৎনাটার দিকে মন দেবার জন্য। ওটা আটকে গেছে একটা কাঁটা-শ্যাওলায়। বঁড়্শিটা যে শেকড়ে গেঁথে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টান দিতে ভয় হল পাভেলের। যদি আটকে গিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়াতে পারবে না আর নিশ্চয় হেসে উঠবে মেয়েটা। ওর চলে যাওয়াই কামনা করল সে।

তোনিয়া ততক্ষণে অল্প দূরে থাকা উইলো গাছের গুঁড়িটার ওপরে আরাম করে বসেছে। হাঁটুর ওপর বইটা নিয়ে দেখছে এই রোদে-পোড়া কালো-চোখ অমার্জিত ছেলেটাকে, যে তাকে এমন অভদ্র অভ্যর্থনা জানিয়েছে আর এখন ইচ্ছে করেই তাকে উপেক্ষা করছে।

পুকুরের আয়নার মতো বুকে পাভেল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার প্রতিবিম্ব। বইয়ের মধ্যে সে যখন ডুবে গেছে বলে তার মনে হল, তখন সে সাবধানে জড়িয়ে যাওয়া সুতোটায় টান দিল। ফাৎনাটা ডুবে গেল জলে, টান-টান হয়ে এল সুতোটা।

'আটকে গেছে, আরে গেল যা!' কথাটা চট করে খেলে গেল তার মনে, আর সেই মুহূর্তেই দেখল জলের মধ্যে থেকে মেয়েটার হাসিমুখ তাকে লক্ষ্য করছে।

ঠিক সেই সময়ে পাম্প্-স্টেশনের সাঁকোটা পার হয়ে আসছিল দু'জন তরুণ — দু'জনেই হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এদের মধ্যে একজন ডিপোর কর্তা ইঞ্জিনিয়র সুখারুকো-র সতের বছর বয়সী ছেলে — ফ্যাকাসে চুলওয়ালা, ছুলিতে ভরা মুখ, চোয়াড়ে, নিষ্কর্মা গোছের। স্কুলের সহপাঠীরা তার নাম দিয়েছে 'দাগীমুখো শুরুকা'। একটা শৌখীন ছিপ আর সুতো তার হাতে, মুখের কোণে বেপরোয়া ভঙ্গিতে একটা সিগারেট আটকানো। তার সঙ্গে আসছে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি — সুঠাম, কোমল গড়নের ছোকরা।

সঙ্গীর দিকে ঝুঁকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে সুখারুকো বলেছিল, 'দেখ, এই

মেয়েটা একটা টুকটুকে পাকা ফল। এরকমটি এদিকে আর কেউ নেই। একেবারে অসাধারণ — যাকে বলে, রো-মা-ন্-টিক — এই যা বললাম মনে রেখো। ক্লাস সিক্সে পড়ে কিয়েভের ইস্কুলে। এখন এসেছে ওর বাবার কাছে গরমের ছুটি কাটাতে। ওর বাবা এখানকার প্রধান বনপরিদর্শক। আমার বোন লিজার সঙ্গে ওর আলাপ আছে। আমি একবার ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম — কিছুটা আবেগের সঙ্গেই আর কি। 'আমি আপনার প্রেমে পাগল,' তুমি তো ধরনটা জানোই, 'দুরু দুরু বুকে রয়েছি আপনার উত্তরের অপেক্ষায়।' এমন কি, নাদসন থেকে কিছু জুৎসই কবিতাও উদ্ধৃতি করেছিলাম।'

'তা ফলটা কী হল?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ভিক্তর।

'ঢং করে আর কি, ভারি দেমাক,' বলল সুখারুকো মিইয়ে যাওয়া গলায়, 'আমায় বলে কিনা চিঠি লিখে যেন কাগজ নষ্ট না করি, হেন-তেন কত কি। কিন্তু গোড়ার দিকে ওই রকমই হয় সব সময়। এসব ব্যাপারে আমি তো পাকা লোক। সত্যি কথা বলতে কি, ওসব ঝামেলা পোষায় না — দিনের পর দিন কাকুতি-মিনতি কর আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল। তার চেয়ে ঢের সহজে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে মিস্ত্রিদের পাড়ায় চলে যাও, সেখানে তিন রুবল দিয়ে এমন সুন্দর মেয়ে পাবে যে জিভে জল আসবে তোমার। ওসব ঢং নেই। আমি ওখানে যেতাম ভাল্কা তিখোনভের সঙ্গে। সেই রেল-কারখানার ফোরম্যানকে চেনো না?'

তাচ্ছিল্যভরে ভুরু কুঁচকাল ভিক্তর, 'কী বলছ শুরা? তুমি এই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে যাও নাকি?'

সিগারেটটা চিবিয়ে থুতু ফেলে খেঁকিয়ে উঠল শুরা, 'অত সাধুপনা কোর না। তোমরা কে যে কী কর আমার জানা আছে।'

ভিক্তর তাকে বাধা দিল, 'তা এর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়। চল তাড়াতাড়ি যাই, নইলে ও আমাদের এড়িয়ে কেটে পড়বে। কাল সকালে ও একাই মাছ ধরতে গিয়েছিল।'

দুই বন্ধুতে তোনিয়ার কাছাকাছি এল। মুখের সিগারেটটা নামিয়ে নিয়ে সুখারুকো তাকে খুব একটা কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানাল, 'কেমন আছেন, শ্রীমতী তুমানভা? মাছ ধরতে এসেছেন নাকি?'

'না, এই দেখছি আর কি,' বলল তোনিয়া।

ভিক্তরকে বাহু ধরে টেনে এনে সুখারুকো তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনাদের আলাপ নেই, না? এই আমার বন্ধু ভিক্তর লেশ্চিনস্কি।'

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভিক্তর তোনিয়ার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আলাপটা চালিয়ে যাবার চেষ্টায় সুখারুকো জিজ্ঞেস করল, 'আজ মাছ ধরছেন না কেন ?'

তোনিয়া উত্তর দিল, 'আমার ছিপটা আনতে ভুলে গেছি।'

'আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি আরেকটা,' বলল সুখারুকো, 'ইতিমধ্যে আপনি আমারটা নিতে পারেন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

তোনিয়ার সঙ্গে ভিক্তরের আলাপ করিয়ে দেবার কথা সে রেখেছে। এখন সে ওদের দু'জনকে একটু একা থাকতে দেবার জন্য ব্যস্ত।

তোনিয়া বলল, 'না, আমি বরং মাছ ধরব না। শুধু শুধু ব্যাঘাত করা হবে। এখানে আরেকজন মাছ ধরছে।'

'কাকে ব্যাঘাত করা হবে ?' জিজ্ঞেস করল সুখারুকো, 'ও, এই এটাকে ?' এই প্রথম সে ঝোপের নিচে বসে থাকা পাভেলকে দেখতে পেল। 'আচ্ছা, এটাকে দুই ধাক্কায় ভাগিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে।'

তোনিয়া বাধা দেবার আগেই সে নেমে গেছে ছিপ আর সুতো নিয়ে ব্যস্ত পাভেলের কাছে।

সুখারুকো পাভেলকে বলল, 'ছিপ গুটিয়ে নিয়ে সরে পড় এখান থেকে।' পাভেল শান্তভাবে মাছ ধরেই চলছে দেখে সে আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, এই !..'

মাথা তুলে পাভেল সুখারুকোর দিকে তাকাল, তার চাউনিটার রকমসকম সুবিধের ছিল না।

'এই চুপ। অমন হাঁ করে চেয়ে রইলি যে !'

'কী বললি !' ফেটে পড়ল সুখারুকো, 'মুখের ওপর জবাব দেবার সাহস তোর ! হাঘরে কোথাকার ! ভাগ্ এখান থেকে !' কেঁচোর টিনটায় ভীষণ এক লাথি লাগাল সে। শূন্যে পাক খেয়ে পড়ে গেল সেটা পুকুরের মধ্যে, জলের ছিটে লাগল তোনিয়ার মুখে।

'ছিঃ ছিঃ সুখারুকো, লজ্জা করছে না আপনার ?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

লাফিয়ে উঠল পাভেল। সে জানে আরতিওম যেখানে কাজ করে সেই ডিপোর বড়কর্তার ছেলে সুখারুকো। এই মোটাসোটা লালমুখো হাঁদাটাকে যদি সে মারে, তাহলে সে তার বাপের কাছে গিয়ে নালিশ করলে আরতিওম বিপদে পড়তে পারে। শুধু এই চিন্তাটাই তাকে একটু বাধা দিচ্ছিল, নইলে সে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলত।

পাভেল তাকে মুহূর্তের মধ্যেই মেরে বসবে আন্দাজ করে, সুখারুকো ছুটে এগিয়ে এসেই দুই হাতে ধাক্কা লাগাল পাভেলের বুকে। জলের পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল

পাভেল, বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে প্রাণপণে দুই হাত ছড়িয়ে সে নিজেকে সামলে নিল, কোনরকমে বাঁচাল নিজেকে জলে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে।

এই সুখারুকো পাভেলের চেয়ে দু-বছরের বড়ো, ঝগড়াটে গুণ্ডা হিসেবে সে কুখ্যাত।

বুকে ঘুষি খেয়ে মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল পাভেলের।

'দেখবি তাহলে? এই দ্যাখ্ !' বলেই হাতটা অল্প একটু ঘুরিয়ে পাভেল একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসাল সুখারুকোর মুখে। ঘুষিটা সে সামলে নেবার আগেই, পাভেল তার স্কুলে পরা উর্দিটা চেপে ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে জলের মধ্যে নামিয়ে দিল।

হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে সুখারুকো, পালিশ করা জুতো আর প্যাণ্ট তার ভিজে গেছে, প্রাণপণে সে পাভেলের শক্ত মুঠি থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগল। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হওয়ার পর পাভেল লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

প্রচণ্ড রাগে আবার সুখারুকো তাকে তাড়া করল, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে সে পাভেলকে।

ঘুরে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাভেল স্মরণ করল: 'বাঁ পায়ের ওপর দেহের ভর রাখো, ডান পা টান করে হাঁটু বেঁকিয়ে নাও। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওপরের দিকে থুতনির নিচে ঘুষি বসাও।'

মোক্ষম একটি ঘুষি!

পাভেলের ঘুষিটা পড়তেই দাঁত কড়মড়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর থুতনিতে আর কামড়ানো জিভের অসহনীয় যন্ত্রণায় চিঁচিঁ চিৎকার করতে করতে সুখারুকো দুই হাত ছড়িয়ে জলের মধ্যে ঝপ করে পড়ে গেল।

ডাঙার ওপর হাসিতে ভেঙে পড়ছে তোনিয়া। হাততালি দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেশ করেছ, শাবাশ্ !'

আটকে যাওয়া ছিপের সুতোটায় এত জোরে টান দিল পাভেল যে তার ডগাটা গেল ছিঁড়ে, তারপর পাড় বেয়ে উঠে এল রাস্তার ওপরে।

চলে যেতে যেতে সে শুনল, ভিক্তর বলছে তোনিয়াকে, 'এই হল পাভেল করচাগিন — এক নম্বর গুণ্ডা একটা।'

* * *

স্টেশনে গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, রেললাইনের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করতে লেগেছে। পরের বড়ো স্টেশনটার ডিপোর শ্রমিকরা বড়ো রকমের একটা কাণ্ড পাকিয়ে তুলছে। ঘোষণাপত্র নিয়ে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ করে জার্মানরা

দু'জন ইঞ্জিন-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। যেসব শ্রমিকদের গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য — কারণ, জমিদাররা জমিদারিতে ফিরছে, জবরদখল শুরু হয়েছে।

হেটম্যান সান্ত্রীদের চাবুকে চাষীদের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোটা গুবের্নিয়া জুড়ে গড়ে উঠছে পার্টিজান-আন্দোলন। বলশেভিকরা ইতিমধ্যেই ডজনখানেক পার্টিজান সৈন্যদল গড়ে তুলেছে।

ঝুখ্‌রাইয়ের বিশ্রামের ফুরসত নেই ইদানীং। শহরে থেকে সে এর মধ্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে। বহু রেলশ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে, তরুণদের সমাবেশে উপস্থিত থেকেছে, ডিপোর মিস্ত্রীদের আর করাত-কলের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একটা জোরালো দল গড়ে তুলেছে। আরতিওমের মনোভাবটা কী তা জানবার চেষ্টা করেছে সে: একবার জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে — বলশেভিক পার্টি আর সেই পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী মনে করে আরতিওম। উত্তরে বলিষ্ঠ-দেহ এই মিস্ত্রী জানিয়েছিল, 'আমি এই সব পার্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, ফিওদর। তবে কিছু সাহায্যের দরকার হলে আমি সেটা করব জেনো।'

এতেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল ফিওদর। সে জানে, আরতিওম খাঁটি লোক, সে তার কথা রাখবে ঠিকই। 'পার্টির ব্যাপারে সে এখনও তৈরি নয়। তাতে কিছু যায় আসে না,' মনে মনে ভাবল সে, 'যা দিনকাল, তাতে ও শিগগিরই নিজেই সবকিছু বুঝে নেবে।'

ফিওদর বিদ্যুৎ-স্টেশন ছেড়ে ডিপোয় একটা কাজ নিয়েছে। সেখানে তার কাজকর্ম চালানো আরও সুবিধে। বিদ্যুৎ-স্টেশনে থাকার সময়ে সে রেলওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ট্রেন-যাতায়াত ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। ইউক্রেন থেকে জার্মানরা হাজার হাজার গাড়ি-বোঝাই লুটের মাল পাঠাচ্ছে জার্মানিতে — যব, গম, গোরু-ভেড়ার পাল...

* * *

স্টেশনে তারের খবর দেওয়া-নেওয়া করে পনোমারেঙ্কো, তাকে একদিন হেটম্যান সান্ত্রীরা গ্রেপ্তার করল। রক্ষী ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে মারা হল তাকে। সে-ই যে আরতিওমের একজন সহযোগী শ্রমিক রমান সিদোরেঙ্কোর প্রচার-আন্দোলনের কথা বলে দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল।

ডিপোয় যখন কাজ চলছে, তখন রমানকে ধরতে এল দু'জন জার্মান এবং

একজন হেটম্যান সান্ত্রী, স্টেশন-কম্যাণ্ড্যাণ্টের সহকারী। রমান যেখানে কাজ করছে, সেইখানে এসে একটাও কথা না বলে সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্ট চাবুক মেরে তার মুখটা কেটে দিল।

'আয় আমাদের সঙ্গে, শুয়োরের বাচ্চা! তোমার কিছু জবাবদিহি করতে হবে।' বিশ্রী রকম মুখ ভেঙিয়ে সে মিস্ত্রীর হাতটা ধরে ভয়ানক জোরে মুচড়ে দিল। 'আন্দোলন করে বেড়ানোর মজাটা টের পাবি আমাদের ওখানে!'

রমানের পাশের যন্ত্রটাতেই কাজ করছিল আরতিওম। হাতের উখাটা রেখে সে তার বিরাট দেহটার ভীষণ রকম একটা ভঙ্গি করে এগিয়ে এল সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে। জমে উঠতে থাকা ক্রোধ যথাসম্ভব সামলাবার চেষ্টা করে কর্কশ গলায় বলল আরতিওম, 'মারতে যাবি নে, বেজম্মা কোথাকার!'

সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্ট পিছিয়ে গেল পিস্তলের চামড়ার খাপটা খুলতে খুলতে। ছোটখাটো বেঁটে-পা একজন জার্মান কাঁধ থেকে তার চওড়া বেয়নেট লাগানো রাইফেলটা খুলে নিয়ে টিপ্-কলটা খট্ করে নামিয়ে নিল।

'হল্ট!' খেঁকিয়ে উঠল জার্মানটা, আর এক পা এগুলেই গুলি করার জন্য প্রস্তুত সে।

লম্বা, বলিষ্ঠ মিস্ত্রী অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এই ক্ষুদে সৈনিকটার সামনে— কিছু করবার নেই তার।

রমান আর আরতিওম দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হল। এক ঘণ্টা বাদে ছেড়ে দেওয়া হল আরতিওমকে, কিন্তু মাটির নিচের একটা গুদাম-ঘরে তালাবন্ধ হয়ে রইল রমান।

এই গ্রেপ্তারের দশ মিনিটের মধ্যেই একজন লোকও কাজে রইল না। স্টেশন-সংলগ্ন পার্কে ডিপোর শ্রমিকেরা এসে জমায়েত হল, সেখানে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ট্রেন-চলাচলের যোগাযোগ-রক্ষী কর্মীরা আর সরবরাহ-বিভাগের শ্রমিকেরা। দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হল, রমান আর পনোমারেঙ্কোর মুক্তির দাবি জানিয়ে একজন একটা আবেদন-পত্র রচনা করল।

বিক্ষোভ আরও বেশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল যখন এক দল রক্ষীর সঙ্গে একটা পিস্তল আস্ফালন করতে করতে সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্ট পার্কে ছুটে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাজে ফিরে যাও সব, নইলে প্রত্যেকটি লোককে এখানেই গ্রেপ্তার করব! তোমাদের কয়েকজনকে গুলি করে মারাও হবে!'

উত্তরে ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা এমন একটা গর্জন করে উঠল যে সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্টকে ছুটতে হল স্টেশনে আশ্রয় নেবার জন্য। ইতিমধ্যে অবশ্য সে শহরের জার্মান

সৈন্যদের আসবার জন্য খবর পাঠিয়েছিল, গাড়িভর্তি জার্মান সৈন্যদল স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

জমায়েত ভেঙে দিয়ে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল। কেউ কাজে রইল না, এমন কি স্টেশনমাস্টারও না। ঝুখ্রাই যে তাদের মধ্যে কাজ করেছে, সেটার ফল ফলতে লাগল। এই প্রথম স্টেশন-শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামী ব্যবস্থা অবলম্বন করল।

ভারি একটা মেশিনগান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর বসাল জার্মানরা। শিকারের গন্ধ পাওয়া কুকুরের মতো সেটা সেখানে মুখ উঁচিয়ে খাড়া রইল, তার ঘোড়াটায় হাত রেখে পাশেই উবু হয়ে বসে রইল একজন জার্মান কর্পোরাল।

জনহীন হয়ে গেল স্টেশনটা।

রাত্রিবেলা শুরু হল ধরপাকড়। যাদের নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আর্তিওম একজন। সে-রাত্রে বাড়ি না ফেরায় ঝুখ্রাই পার পেয়ে গেল।

যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে বিরাট একটা মালগাড়ি রাখার চালার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে এই বলে হুমকি দেওয়া হল যে হয় তাদের কাজে যেতে হবে, নয়তো সামরিক আইনে তাদের বিচার হবে।

আগাগোড়া রেল-লাইন জুড়ে সমস্ত রেল-শ্রমিকই ধর্মঘট করেছিল। একটা পুরো দিনরাতের মধ্যে একখানা ট্রেনও যাতায়াত করে নি। প্রায় আশী মাইল দূরেই লড়াই চলেছে একটা বিরাট পার্টিজান-বাহিনীর সঙ্গে, তারা রেল-লাইন উপড়ে ফেলে সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়েছে।

রাত্রিবেলায় জার্মান-সৈন্য-ভর্তি একটা ট্রেন এসে লেগেছিল, কিন্তু সেটা আটকে গেল। সেটার ইঞ্জিনচালক, তার সহকারী আর ফায়ারম্যান, তিনজনেই সরে পড়েছে। স্টেশনের পাশের লাইনে আরও দুটো ট্রেন আটকে আছে ছাড়ার অপেক্ষায়।

মালগাড়ির চালাটার ভারি দরজাটা খুলে গেল এবং স্টেশন-কম্যাণ্ড্যাণ্ট, একজন জার্মান লেফ্টেন্যাণ্ট্, তার সহকারী এবং একদল অন্যান্য জার্মান এসে ঢুকল।

'করচাগিন, পলেন্তভ্স্কি, ব্রুঝাক্,' হেঁকে গেল সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'তোমাদের তিনজনকে একটা ইঞ্জিন চালাবার দল হিসেবে এখুনি একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি রাজি না হও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে তোমাদের। কী বলার আছে তোমাদের ?'

শ্রমিক তিনজন গম্ভীর মুখে সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। সহকারী-কম্যাণ্ড্যাণ্ট যখন পরবর্তী ট্রেনের চালক, সহকারী আর ফায়ারম্যানের নাম ডাকছে, ততক্ষণে পাহারাধীনে তাদের নিয়ে যাওয়া হল ইঞ্জিনখানার কাছে।

* * *

ক্রুদ্ধ একটা আওয়াজ করে এক ঝলক স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল ট্রেনের ইঞ্জিনটা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল রাত্রির গভীরে সামনের অন্ধকার ঠেলে। আরতিওম চুল্লিটায় বেলচা করে কয়লা গুঁজে দিল, চুল্লির মুখটা পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে বাঁকা-নাক কেটলি থেকে এক চুমুক জল খেয়ে বুড়ো ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্স্কির দিকে তাকাল, 'তাহলে খুড়ো, ট্রেনটা চালাতেই হচ্ছে আমাদের ?'

ঘন ঝুলে-পড়া ভুরুর নিচে পলেন্তভ্স্কির চোখদুটো বিরক্তিতে পিটপিট করে উঠল, 'পেছনে বেয়নেট বাগিয়ে থাকলে চালাতেই হবে।'

কয়লাগাড়িটার ওপরে বসে থাকা জার্মান সৈনিকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্রুঝাক বলল, 'সব ছেড়েছুড়ে সরে পড়লে কেমন হয় ?'

আরতিওম বিড়বিড় করে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আমাদের পেছনে ওই যে ঘাগীটা বসে আছে।'

জানলা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ব্রুঝাক বলল, 'তা বটে।'

আরতিওমের কাছাকাছি সরে এল পলেন্তভ্স্কি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'ট্রেনটাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না কিছুতেই, বুঝলে ? সামনে লড়াই চলছে, আমাদের লোক রেল-লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। এই শুয়োরগুলোকে ওখানে নিয়ে যাওয়া মানে এদের গুলির মুখে আমাদের ওই লোকদের সঁপে দেওয়া। এমন কি জারের আমলেও ধর্মঘটের সময়ে আমি ট্রেন চালাই নি, বুঝলে ? এবার চালাব ? কক্ষনো না। নিজেদের লোকই যদি আমাদের জন্যে মারা পড়ে, তবে সে কলঙ্ক আর জীবনে ঘুচবে না। আমাদের আগে যারা ইঞ্জিন চালাচ্ছিল, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা কিন্তু পালিয়েছে। আমাদেরও ট্রেনটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না, কী বলো ?'

'ঠিক বলেছ খুড়ো, কিন্তু এর ব্যবস্থা কী করবে ?' বলে সে সৈন্যটাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাল।

ভুরু কুঁচকাল ইঞ্জিন-ড্রাইভার। এক মুঠো ফেঁসো দিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল মুছে রক্তাক্ত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইঞ্জিনের চাপ-নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে — যেন, তোলপাড়-করা প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছে সে সেইখানে। তারপরে রাগে বেপরোয়া হয়ে গাল পাড়ল একটা।

আরেকবার জল খেল আরতিওম। দু'জন লোকই একই কথা ভাবছে, কিন্তু কেউই উদ্বিগ্ন নীরবতাটুকু ভাঙতে পারছে না। আরতিওমের মনে পড়ল ঝুখ্রাইয়ের প্রশ্ন:

'আচ্ছা ভাই, বলশেভিক পার্টি আর কমিউনিস্টদের ধারণা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?' আর মনে পড়ল তার জবাবে নিজের উক্তি, 'আমি সবসময় সাহায্য করতে প্রস্তুত, আমার ওপর নির্ভর করতে পারো...'

'সাহায্যটা করছি বটে বড় চমৎকার,' মনে মনে ভাবল সে, 'নিয়ে চলেছি পিটুনি ফৌজ...'

পলেস্তভ্স্কি এতক্ষণে আরতিওমের পাশে টুল-বাক্সটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শুকনো গলায় সে বলল, 'ওই লোকটাকে খতম করে দিতে হবে, বুঝলে?'

চমকে উঠল আরতিওম। পলেস্তভ্স্কি দাঁত চেপে বলল, 'আর কোন উপায় নেই। মাথায় মারতে হবে ওর, তারপরে ইঞ্জিনের বাষ্পনালীটা আর লেভারগুলো খুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলে দিয়ে, বাষ্পটাকে বের করে দিয়েই নেমে পড়তে হবে।'

একটা ভারি বোঝা যেন কাঁধ থেকে নেমে গেল আরতিওমের — বলল, 'ঠিক!'

ব্রুঝাকের দিকে ঝুঁকে আরতিওম তাকে সিদ্ধান্তটা জানাল।

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না ব্রুঝাক। তিনজনেই একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে চলেছে। প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক-একটা পরিবারের কথা ভাববার আছে। পলেস্তভ্স্কিরটাই সবচেয়ে বড়ো: ন'জন পোষ্য তার। কিন্তু তিনজনেই জানে ট্রেনটাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারে না তারা।

'বেশ, আমি আছি তোমাদের সঙ্গে,' বলল ব্রুঝাক, 'কিন্তু ওটার কী ব্যবস্থা? কে ওকে...' কথাটা শেষ করল না সে, কিন্তু মানেটা আরতিওমের কাছে যথেষ্টই স্পষ্ট।

বাষ্পনালীটা নিয়ে ব্যস্ত পলেস্তভ্স্কির দিকে ফিরল আরতিওম, ঘাড় নেড়ে জানাল ব্রুঝাক তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত-না-হওয়া একটা প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে বুড়ো মানুষটার দিকে সে এগিয়ে এল।

'কিন্তু কী ভাবে?'

পলেস্তভ্স্কি তাকাল আরতিওমের দিকে, 'তুমি লাগো আগে। তোমার গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি, আমরা শাবলটা দিয়ে ঘা লাগাব, চুকে যাবে।' বৃদ্ধ ভয়ানক উত্তেজিত।

ভুরু কুঁচকাল আরতিওম, 'ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। হাত কেমন যেন উঠতে চায় না। শেষ পর্যন্ত যদি ভেবে দেখ, এই সৈনিকটার দোষ নেই কোন। ওকেও তো জোর করে বেয়নেট দেখিয়ে লাগানো হয়েছে এই কাজে।'

চোখে আগুন জ্বলে উঠল পলেস্তভ্স্কির, 'দোষ নেই বলছ? আমরাও যে বাধ্য হয়ে এই কাজটা করছি, তাতে আমাদেরও কোন দোষ নেই। কিন্তু ভুলে যেও না, আমরা নিয়ে চলেছি একটা পিটুনি ফৌজ। এই সব 'নির্দোষ' সৈন্যরা আমাদের

পার্টিজানদের গুলি করে মারতে চলেছে। তাহলে পার্টিজানরা কি দোষী? না হে ছোকরা, ভালুকের মতো জোয়ান তুমি, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার একটু কম...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভাঙা গলায় বলল আরতিওম। শাবলটা তুলে নিল সে।

কিন্তু পলেস্তভ্স্কি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি করছি ওটা, আমার বরং আরও ভালো আসে। তুমি বেলচাটা নিয়ে উঠে যাও কয়লাবাক্স থেকে কয়লা দেবার জন্যে। দরকার হলে তুমি এক ঘা দেবে বেলচাটা দিয়ে। আমি কয়লা ভাঙার ভান করব।'

ব্রুঝাক কথাটা শুনে মাথা নেড়ে সায় দিল। 'ঠিক বলেছ বুড়ো,' বলে সে বাষ্পনালীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লাল বেড় দেওয়া সামরিক টুপি পরে জার্মান সৈনিকটা বসেছিল কয়লা রাখার গাড়িটার ওপরে। দু'পায়ের মাঝে রাইফেলটা রেখে চুরুট খাচ্ছে সে। ইঞ্জিন-চালানেওয়ালা এই তিনজন লোকের কাজকর্মের দিকে সে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল।

কয়লা রাখার গাড়িটার ওপরে যখন আরতিওম উঠে আসে, তখন সান্ত্রীটা বিশেষ কোন নজর দেয় নি। তারপরে, পলেস্তভ্স্কি যখন কয়লার স্তূপটার ওপাশে বড়ো বড়ো চাঙড়গুলো নেবার ভান করে তাকে সরে যাবার ইসারা করল, তখন জার্মানটা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে ইঞ্জিনের দিকে সরে এল।

শাবলের আঘাতে জার্মানটার খুলি ফেটে যাবার হঠাৎ একটা শব্দে চমকে লাফিয়ে উঠল আরতিওম আর ব্রুঝাক, যেন গরম লোহার ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। বস্তার মতো গড়িয়ে পড়ে গেল সান্ত্রীর দেহটা। দ্রুত রক্তের স্রোত গড়াল ধূসর পশমের টুপিটার ফাঁকে, গাড়ির লোহার দেয়ালে ঠুকে গেল তার রাইফেলটা।

'খতম,' শাবলটা রেখে ফিসফিসিয়ে বলল পলেস্তভ্স্কি, 'এখন আর আমাদের পিছিয়ে যাবার পথ নেই।'

তার মুখখানা হেঁচকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তারপর চাপা নীরবতা ভেঙে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'বাষ্পনালীটার প্যাঁচ খুলে দাও, জলদি!'

দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজটা। ট্রেনটা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে তার।

ঘন আঁধারে ঘেরা দু'পাশের গাছগুলো ইঞ্জিনের আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে পরক্ষণেই আবার মিশে যাচ্ছে পেছনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। হেডলাইটগুলো বৃথাই চেষ্টা করছে রাত্রির ঘন যবনিকাকে ভেঙে দিতে, সামনের দিকে মাত্র কয়েক গজ ফুঁড়ে যেতে পারছে। ক্রমশই ইঞ্জিনটার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ভারি হয়ে আসছে। গতিটা কমে আসছে, যেন তার শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেছে।

'লাফিয়ে পড় !' পেছনে পলেন্তভ্‌স্কির গলা শুনে আরতিওম হাতলটা ছেড়ে দিল। ট্রেনের গতিবেগ তার বলিষ্ঠ দেহটাকে সামনের দিকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিল, তারপরে একটা ঝাঁকুনি খাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটিটা নিচ থেকে ওপরে উঠে এসে ঠেকে গেল তার পায়ে। দু'-এক পা দৌড়ে গিয়ে আরতিওম হোঁচট খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে গেল।

একই সঙ্গে আরও দুটো ছায়ামূর্তি লাফিয়ে নেমে গেল গাড়িটার দু'পাশ থেকে।

* * *

ব্রুঝাকের বাড়িতে গভীর বিষণ্ণতা। সের্গেই-এর মা আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না গত চারদিন ধরে ভাবনায়-চিন্তায় প্রায় পাগল। কোন খবর নেই তার স্বামীর। শুধু এইটুকু সে জানে যে জার্মানরা তাকে করচাগিন আর পলেন্তভ্‌স্কির সঙ্গে একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। গতকাল হেটম্যান তিনজন সান্ত্রী এসে বিশ্রীরকম গালমন্দ করে তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গেছে।

ওদের কথা থেকে খুব অস্পষ্টভাবে সে বুঝেছে যে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভয়ানক উদ্বিগ্ন মনে, লোকগুলো চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সে মাথায় রুমালটা বেঁধে রওনা হল মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনার বাড়ি—যদি ওখানে তার স্বামীর কোন খবর পেতে পারে।

রান্নাঘরটা গোছগাছ করছিল তার বড় মেয়ে ভালিয়া, সে মাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, মা ?'

জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না বলল, 'করচাগিনদের ওখানে। দেখি, ওরা হয়তো তোর বাবার খবর কিছু জানতে পারে। সের্গেই বাড়ি এলে বলিস, সে যেন স্টেশনে গিয়ে পলেন্তভ্‌স্কিদের ওখানে একবার দেখা করে আসে।'

মায়ের গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ভালিয়া। দরজার কাছে মাকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'ভেবো না, মা গো।'

* * *

বরাবরের মতোই মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা সাদর অভ্যর্থনা জানাল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্‌নাকে। দু'জনেই আশা করেছিল যে অন্যজনের কাছে কিছু খবর পাওয়া যাবে, কিন্তু কথা বলতেই সে আশা মিলিয়ে গেল।

করচাগিনদের বাড়িতেও রাত্রে খানাতল্লাশি হয়ে গেছে। সৈন্যরা আর্তিওমের খোঁজে এসেছিল। মারিয়া ইয়াকোভলেভ্‌নাকে বলে গেছে, তার ছেলে বাড়ি ফিরলেই যেন সে কম্যাণ্ড্যাটুরে খবর দেয়।

সান্ত্রীর দলটা বাড়িতে আসতেই মারিয়া করচাগিনার ভয়ে প্রায় বুদ্ধি লোপ পাবার মতো হয়েছিল। বাড়িতে সে একা, পাভেল রাত্রির শিফ্‌টে বিদ্যুৎ-স্টেশনে ছিল সাধারণত যেমন থাকে।

ভোরবেলায় কাজ থেকে ফিরে মা'র কাছ থেকে তল্লাশির কথা শুনে পাভেলের দারুণ দুশ্চিন্তা হল দাদার নিরাপত্তার জন্য। দুই ভাইয়ের চরিত্রের অমিল আর আর্তিওমের আপাত কঠোরতা সত্ত্বেও তাদের দু'জনের মধ্যে একটা গভীর টান আছে। এ ভালোবাসা দৃঢ়, কিন্তু সেটার কোন বাহ্যিক প্রদর্শনী নেই। পাভেল জানে, ভাইয়ের জন্য কোন রকম আত্মদানেই সে ইতস্ততঃ করবে না।

জিরিয়ে নেবার জন্য না বসেই পাভেল স্টেশনে ছুটে এল ঝুখ্‌রাইয়ের খোঁজে। তাকে পাওয়া গেল না। অন্যান্য চেনা শ্রমিকও বেপাত্তা মানুষগুলোর খবর কিছু বলতে পারল না। ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্‌স্কির পরিবারও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। উঠোনে তার ছোট ছেলে বরিসের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ওর কাছ থেকে সে শুধু এইটুকুই জানতে পারল যে রাত্রিবেলায় তাদের বাড়িতেও খানাতল্লাশি হয়ে গেছে। ফৌজের লোকজন পলেন্তভ্‌স্কিকে খুঁজছে।

মাকে দেবার মতো কোন খবর না পেয়েই পাভেল ফিরে এল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে শুয়ে পড়ল বিছানাটায়, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল তন্দ্রার অস্থির তরঙ্গমালার মধ্যে।

* * *

দরজাটায় ঘা পড়তেই মুখ তুলে তাকাল ভালিয়া। আগলটা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে ?'

খোলা দরজাটার ফাঁকে ক্লিমকা মারচেঙ্কোর উস্কখুস্ক কটা-চুলওয়ালা মাথাটা দেখা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে ছুটে এসেছে — হাঁফাচ্ছে আর লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ দৌড়ানোর পরিশ্রমে। ভালিয়াকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার মা বাড়ি আছেন ?'

'না, বেরিয়ে গেছেন।'

'কোথায় ?'

'করচাগিনদের বাড়ি বোধহয়।' ক্লিমকা যেই ছুটে বেরিয়ে যাবে, অমনি তার জামার হাতাটা চেপে ধরল ভালিয়া।

ইতস্তত করে মেয়েটার দিকে তাকাল ক্লিমকা।

'একটা দরকারে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' সাহস করে বলল ক্লিমকা।

'কী ব্যাপার?' ভালিয়া ছাড়ল না তাকে, 'শিগ্‌গির বল্, কটাচুলো ভালুক কোথাকার, ভাবনার মধ্যে ফেলিস না, বলছি,' হুকুমের স্বরে বলল মেয়েটা।

ঝুখ্‌রাইয়ের সাবধানবাণী ভুলে গেল ক্লিমকা। বিশেষ করে বলে দিয়েছিল সে, একমাত্র আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার হাতেই যেন সে চিরকুটটা দেয়। পকেট থেকে এক টুকরো ময়লা কাগজ বের করে ক্লিমকা ভালিয়ার হাতে দিল। সের্গেই-এর এই হালকা-চুল বোনটাকে সে কখনও 'না' বলতে পারে না — সত্যি বলতে কি, এই সুন্দরী মেয়েটার প্রতি কটা-চুল ক্লিমকার একটু দুর্বলতা আছে। অবশ্য, ভালিয়াকে যে তার ভালো লাগে, সেটা এমন কি নিজের কাছেও বলার মতো সাহসও তার নেই। কাগজটা তাড়াতাড়ি পড়ল ভালিয়া:

'তোনিয়া! কিছু ভাবনা কোরো না। খবর সব ভাল। আমরা নিরাপদে ভাল আছি। শিগ্‌গিরই আরও খবর পাবে। অন্যদের জানিয়ে দিও — সব ঠিক আছে, তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই চিরকুটটা নষ্ট করে ফেলো।

জাখার।'

ভালিয়া ছুটে এল ক্লিমকার কাছে, 'ছোট্ট কটা ভালুক আমার! কোথা থেকে পেলে এটা? কে দিয়েছে এটা?' বলতে বলতে সে ক্লিমকাকে এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে সে তার উপস্থিতবুদ্ধি হারিয়ে, নিজে বুঝতে পারার আগেই দ্বিতীয় ভুলটা করে বসল।

'ঝুখ্‌রাই স্টেশনে এটা আমাকে দিয়েছে।' তারপরেই, কথাটা যে তার বলা উচিত হয় নি সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'কিন্তু তোমার মাকে ছাড়া আর কাউকে এটা দিতে সে আমাকে বারণ করেছে।'

'ঠিক আছে,' হেসে উঠল ভালিয়া, 'আমি কাউকে বলব না। আচ্ছা, তাহলে ছোট্ট লক্ষ্মী ভালুকটি, ছুটে যাও পাভেলদের বাড়ি, ওখানে পাবে মাকে।'

আস্তে একটা ধাক্কা দিল সে ক্লিমকার পিঠে। মুহূর্তের মধ্যে বাগানের বেড়াটার বাইরে ক্লিমকার কটা-চুল মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন রেলকর্মীর কেউই বাড়ি ফিরল না। সন্ধ্যার দিকে ঝুখ্রাই করচাগিনদের বাড়ি এসে মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনাকে ট্রেনের ঘটনাটা সব বলল। আতঙ্কিত মাকে শান্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। বারবার করে তাকে বলল, তিনজনেই নিরাপদে আছে ব্রুঝাকের কাকার বাড়িতে এমন একটা গ্রামে যেটা একটু চলতিপথের বাইরে। এখন অবশ্য তারা ফিরতে পারবে না, কিন্তু জার্মানরা বেশ একটু মুশকিলে পড়েছে এবং যেকোন দিন অবস্থা বদলে যেতে পারে।

মানুষ তিনটি অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে তাদের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল আগেকার চেয়ে। ওদের কাছ থেকে ক্বচিৎ কখনও যেসব চিঠিপত্র আসে, তা এরা সবাই আনন্দ করে পড়ে, কিন্তু ওরা না থাকায় বাড়ি ফাঁকা আর বিষণ্ন বলে মনে হয়।

একদিন ঝুখ্রাই পলেন্তভ্স্কির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এল — ভাবখানা যেন সে এই দিক দিয়েই যাচ্ছিল। কিছু টাকা দিল তাকে।

'এই কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছে আপনার স্বামী আপনার চালাবার মতো,' বলল সে, 'শুধু দেখবেন, আর কারুর কাছে বলবেন না কথাটা।'

সকৃতজ্ঞভাবে তার হাতখানা চেপে ধরে বৃদ্ধা বললেন, 'ধন্যবাদ! ভয়ানক দরকার পড়েছিল আমাদের। ছেলেমেয়েদের খেতে দেবার মতোও কিছু নেই।'

আসলে, বুলগাকভ যে টাকাটা রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকেই এটা দিল ঝুখ্রাই।

স্টেশনে ফিরে যেতে যেতে মনে মনে বলল ঝুখ্রাই, 'দেখা যাক কতদূর কি হয়। গুলির ভয়ে যদিও বা ধর্মঘট ভেঙে গেছে, শ্রমিকেরা কাজে ফিরে গেছে, তবু আগুন তো জ্বলে উঠেছে, সেটাকে আর নেভানো যাবে না। আর ওদের তিনজনের কথা যদি বলতে হয়, ওরা শক্ত মানুষ, সত্যিকারের প্রলেতারিয়ান।'

* * *

ভরোবিয়েভা বাল্কা গ্রামের বাইরের দিকে ছোট্ট একটা পুরনো কামারশালা। ধোঁয়ায় কালো তার সামনের দিকটা রাস্তামুখো। জ্বলন্ত হাপর-চুল্লিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলেন্তভ্স্কি, আগুনের আঁচে চোখ কুঁচকে গেছে। লাল করে তাতানো একটা লোহার পাত সে উল্টিয়ে দিল একটা লম্বা চিমটে দিয়ে।

মাথার ওপরে একটা আড়কাঠ থেকে ঝোলানো হাপরটা টেনে টেনে চালাচ্ছিল আর্তিওম।

'ভাল কাজ জানা মিস্ত্রী আজকাল গ্রামে মারা পড়বে না। অনেক কাজ আছে — যত চাও,' দাড়ির মধ্যে হেসে খুশি মনে বলছিল ইঞ্জিনচালক, 'আর দু-এক সপ্তাহ এরকম চালাতে পারলেই বাড়ির লোকজনদের কিছু গম আর মাংস পাঠাতে পারব। চাষীরা সবসময়েই কামারদের খাতির করে হে। দেখে নিও, পুঁজিপতিদের মতো খাব আমরা, হাঃ হাঃ। জাখারটা আমাদের থেকে একটু ভিন্নরকম — কৃষকদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে ওর ওই খুড়োর মারফত ওর শিকড় আটকেছে জোতজমিতে। না, আমি অবশ্য ওর দোষ দিয়ে বলছি না কথাটা। তুমি আর আমি, বুঝলে আরতিওম, আমাদের বাপু সেই যে বলে না-আছে লাঙল, না-আছে জাঙল। শক্ত পিঠ আর একজোড়া হাত ছাড়া কিছুই নেই — যাকে বলে, চিরকালের প্রলেতারিয়ান, আমরা হচ্ছি তাই — হাঃ হাঃ। কিন্তু জাখারটার যেন দু'-নৌকায় পা — এক পা গাঁয়ে আর এক পা রেল-ইঞ্জিনে।' লাল করে তাতানো লোহাটা চিমটেয় ধরে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে আরেকটু গম্ভীর হয়ে সে বলল, 'কিন্তু আমাদের ব্যাপার-স্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না হে। জার্মানরা যদি অল্পদিনের মধ্যে সাবাড় না হয়, তাহলে আমাদের সরে পড়তে হবে ইয়েকাতেরিনস্লাভ কিংবা রস্তভ-এর দিকে। নইলে ধরা পড়ে যাব হয়তো, আর কিছু জানবার আগেই ঝুলতে থাকব শূন্যে স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে।'

'কথাটা বলেছ ঠিক,' অস্পষ্টভাবে বলল আরতিওম।

'ওখানে আমাদের লোকজন কী করছে জানতে পারলে হত। সৈন্যরা ওদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কিনা তাই ভাবছি।'

'হ্যাঁ, আমাদের অবস্থাটা বড়ো বিশ্রী, খুড়ো। বাড়ি ফেরার চিন্তাটা আমাদের ছাড়তে হবে।'

চুল্লি থেকে নীল হয়ে আসা গনগনে উত্তপ্ত লোহাটা বের করে ইঞ্জিনচালক কুশলী হাতে টান দিয়ে এনে রাখল সেটাকে নেহাইটার ওপরে, 'পেটাও হে!'

ভারি হাতুড়িটা মাথার ওপরে তুলে আরতিওম সেটাকে সজোরে নামিয়ে আনল নেহাইটার বুকে। উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের একটা ফোয়ারা ছিটিয়ে পড়ল চতুর্দিকে হিসহিস শব্দে, কামারশালার সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলো একমুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল।

জোরালো হাতুড়ি-পেটার ফাঁকে ফাঁকে পলেন্তভ্স্কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে থাকল লোহাটাকে আর একদলা নরম মোমের মতোই অবাধে চেপ্টে চেপ্টে যেতে লাগল লোহাটা।

কামারশালার খোলা দরজাটা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির উষ্ণ নিঃশ্বাস ভেসে এল।

* * *

নিচেই অন্ধকার হ্রদটা বিরাট। চারধারে সেটাকে ঘিরে পাইন গাছগুলো উঁচু মাথা দোলাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে তোনিয়া ভাবল, 'ঠিক যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো।' তীরে গ্র্যানিট-পাথরের মধ্যে ঘাসে-নরম একটা নিচু জায়গায় শুয়েছিল সে। তার মাথার অনেক ওপরে খোঁদলটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ওধারে বনের আরম্ভ, নিচে উঁচু পাড়ের পায়ের কাছেই হ্রদ। চারধারে পাথরের খাড়া তীরের ছায়া চেপে এসে হ্রদের কালো জলে আরও কালো একটা বেড় দিয়েছে।

স্টেশনের একমাইল দূরে এই পুরনো পাথরখনিটা তোনিয়ার প্রিয় জায়গা। পাথর খুঁড়ে নেবার পরে পরিত্যক্ত গভীর খাদ থেকে জলের উৎস বেরিয়ে তিনটে হ্রদ জেগেছে এখানে। পাড়টা যেখানে জলে মিশেছে, সেইখানে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনে তোনিয়া মাথাটা তুলে সামনের ডালপালাগুলো সরিয়ে সেদিকে তাকাল। রোদে-পোড়া নমনীয় একটা দেহ বলিষ্ঠ বাহুবিক্ষেপে সাঁতার কেটে সরে যাচ্ছে তীরের দিক থেকে। সাঁতারুর বাদামী রঙের পিঠ আর কালো মাথাটা তোনিয়ার চোখে পড়ল — বিরাট একটা জলজন্তুর মতো হাওয়া ছাড়ছে মুখ দিয়ে, জল কেটে চলেছে দ্রুতগতিতে, উল্টে যাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, ডুবে গিয়ে ভেসে উঠছে। তারপরে চিৎ হয়ে, হাতদুটো ছড়িয়ে, দেহটাকে একটু বেঁকিয়ে, উজ্জ্বল রোদে চোখ কুঁচকে ভেসে রইল। ফাঁক করে ধরা ডালপালাগুলো ছেড়ে দিয়ে তোনিয়া মুখ নামিয়ে নিল। মনে মনে হেসে বলল, 'আর দেখাটা উচিত নয়।' বইটা ফের পড়া আরম্ভ করল সে।

লেশিচন্স্কির দেওয়া এই বইটার মধ্যে সে একেবারে ডুবে গিয়েছিল, দেখতেই পায় নি যে পাইন বন আর খোঁদলটার মাঝখানে গ্র্যানিট-পাথরের খাড়াই বেয়ে কখন একজন উঠে এসেছে। আগন্তুকের অজান্তে একটা নুড়ি ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে এসে যখন তোনিয়ার বইটার ওপরে পড়ল, শুধু তখনই সে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল পাভেল করচাগিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাভেলও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়, কী করবে বুঝতে না পেরে সে চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াল।

তার ভিজে চুল লক্ষ্য করে তোনিয়া ভাবল, 'জলে ওকেই দেখেছি, নিশ্চয়।'

'চমকে দিয়েছি নাকি? আমি জানতাম না আপনি এখানে রয়েছেন।' পাথরের উদ্গত অংশে হাত রাখল পাভেল, চিনতে পেরেছে সে তোনিয়াকে।

'না, না, আমার কোন অসুবিধে হয় নি আপনার আসাতে। যদি আপত্তি না থাকে তো থাকুন, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যাক।'

পাভেল অবাক হয়ে তাকাল তোনিয়ার দিকে, 'কী কথা বলব ?'

হাসল তোনিয়া, 'দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন না — এইখানটায়।' একটা পাথরের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম আপনার ?'

'পাভ্‌কা করচাগিন ।'

'আমার নাম তোনিয়া। এই তো, আমাদের পরিচয় হয়ে গেল।'

অস্বস্তিতে পড়ে পাভেল তার টুপিটা দুমড়াতে লাগল।

'আপনাকে বুঝি বলে পাভ্‌কা ?' নীরবতা ভেঙে বলল তোনিয়া, 'পাভ্‌কা কেন ? ভাল শোনাচ্ছে না ওটা, পাভেল তার চেয়ে ঢের ভাল। আমি আপনাকে তাই বলব — পাভেল। এখানে প্রায়ই আসেন বুঝি...' বলতে যাচ্ছিল 'সাঁতার কাটতে' — কিন্তু সে যে পাভেলকে জলে দেখেছে, সেটা চেপে যাওয়ার জন্য তোনিয়া বলল, 'বেড়াতে ?'

'না, প্রায়ই না। অবসর সময় আসি,' বলল পাভেল।

'ও, কাজ করেন বুঝি কোথাও ?' তোনিয়া আর একটা প্রশ্ন করল।

'বিদ্যুৎ-স্টেশনে কয়লা-জোগানদারের কাজ।'

'আচ্ছা, অমন চমৎকার লড়তে শিখলেন কোথায় বলুন তো ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল তোনিয়া।

'আমি মারামারি করি তো আপনার কী ?' নিজের অনিচ্ছাতেই খেঁকিয়ে উঠল পাভেল।

'চটে যাবেন না করচাগিন,' তার প্রশ্নে পাভেল বিরক্ত হয়েছে দেখে সে বলল তাড়াতাড়ি, 'এমনি জানতে ইচ্ছে হল তাই। কী ঘুষিটাই ঝেড়েছিলেন! অতোটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত হয় নি আপনার।' খিলখিল করে হেসে উঠল তোনিয়া।

'ওর জন্যে দুঃখ হয়েছে বুঝি, অ্যাঁ ?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

'মোটেই না। বরং ঠিকই হয়েছে সুখারকোর মার খাওয়াটা। খুব খুশি হয়েছিলাম আমি। শুনেছি, আপনি নাকি প্রায়ই মারামারি বাধান।'

'কে বলেছে ?' কান খাড়া করল পাভেল।

'এই তো, ভিক্তর লেশ্চিন্‌স্কি বলছিল, আপনি নাকি পেশাদার মারকুটে।'

মুখ-চোখ আঁধার হয়ে এল পাভেলের, 'ভিক্তরটা একটা নাদুসনুদুস শুয়োর। কপাল ভাল ওর যে সেদিন ও আমার হাতে মার খায় নি। আমার সম্বন্ধে ও যা বলেছিল সেটা শুনেছিলাম, কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করতে চাই নি আমি।'

'অমন মুখ খারাপ করছেন কেন পাভেল ? ওটা ভাল নয়,' তাকে বাধা দিল তোনিয়া।

চটে উঠল পাভেল। মনে মনে ভাবল, 'এই বড়লোকের অদ্ভুত মেয়েটার সঙ্গে কেন যে কথা বললাম! ভারি আমার হুকুম চালানো হচ্ছে: প্রথমে ওর 'পাভ্‌কা' পছন্দ হল না, এখন আবার আমার ভাষার দোষ ধরছে।'

'লেশ্চিনস্কির ওপরে আপনি এত চটা কেন?' জিজ্ঞেস করল তোনিয়া।

'ও একটা খুকি, আদুরে গোপাল, এতটুকু হিম্মৎ নেই। এ ধরনের ছেলে দেখলেই আমার হাত নিসপিস করে। গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে ভালোবাসে। ভাবখানা যেন বড়লোক বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। পয়সা আছে, তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। হাত দিয়ে দেখুক একবার আমার গায়ে, উচিতমতো শিক্ষা পেয়ে যাবে একচোট। এ ধরনের ছেলে দেখলেই ঝাড়তে ইচ্ছে করে একটা ঘুষি চোয়ালের ওপর,' ক্ষেপে গিয়ে বলেই চলল পাভেল।

লেশ্চিনস্কির প্রসঙ্গ তুলেছে বলে আপসোস হল তোনিয়ার। বুঝতে পারল সে, ওই কেতাদুরস্ত শৌখিন স্কুলের ছেলেটার সঙ্গে এই তরুণটির অনেকদিনের পুরনো ঝগড়া ফয়সালা করবার আছে। কথাবার্তা আরও সহজ খাদে চালাবার জন্য সে পাভেলকে তার পরিবার আর কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

নিজের অজান্তেই পাভেল মেয়েটার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে থাকল অত্যন্ত বিশদভাবে। ভুলেই গেছে যে সে চলে যেতে চাচ্ছিল।

'পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল তোনিয়া।

'ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল যে।'

'কেন?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল পাভেল, 'পাদ্রীটার কেক তৈরির ময়দায় তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম বলে। ভারি পাজি লোক ওই পাদ্রীটা। ওর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।' পাভেল পুরো ঘটনাটা বলে গেল।

আগ্রহের সঙ্গে শুনল তোনিয়া। প্রাথমিক লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে পাভেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এমনভাবে কথাবার্তা চালাল যেন তোনিয়া তার পুরনো পরিচিত কেউ। নানা কথার মধ্যে সে তার দাদার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা বলল। খোঁদলটার মধ্যে বসে অন্তরঙ্গ গল্পে জমে গিয়ে দু'জনের কেউই লক্ষ্য করে নি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যাচ্ছে। শেষে হুঁশ হতে পাভেল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

'কাজে যাবার সময় বয়ে গেছে। এখানে বসে গল্প না করে আমার এতক্ষণে বয়লারে আগুন দেওয়া উচিত ছিল। দানিলো ওদিকে নিশ্চয়ই চেঁচামেচি আরম্ভ করবে।' আবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে সে বলল, 'আচ্ছা, চলি তাহলে। আমাকে এবার দৌড়াতে হবে শহরের দিকে।'

তোনিয়াও তাড়াতাড়ি উঠে জ্যাকেটটা পরে নিল, 'আমাকেও যেতে হবে। চলুন, একসঙ্গে যাই।'

'না, তা কী করে হবে ? আমাকে দৌড়ে যেতে হবে যে।'

'কেন ? আমিও দৌড়ে পাল্লা দেব আপনার সঙ্গে। দেখা যাক, কে আগে পেঁছিতে পারে।'

অবজ্ঞার চোখে তার দিকে তাকাল পাভেল, 'আমার সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেবেন ? মোটেই পেরে উঠবেন না !'

'দেখা যাক। চলুন এখান থেকে বেরুই আগে।'

পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল পাভেল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল তোনিয়ার দিকে। দু'জনে দৌড়ে বন পেরিয়ে এসে পড়ল স্টেশনের দিকে যাবার চওড়া আর সমতল ফাঁকা জায়গাটায়।

তোনিয়া থেমে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'আসুন, এবার দৌড়ানো যাক। এক, দুই, তিন ! ধরুন দিকি...' ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল তোনিয়া রাস্তা বেয়ে তার জুতোর শুকতলায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়ে। নীল জ্যাকেটের প্রান্তটা তার উড়তে লাগল হাওয়ায়।

পাভেল ছুটে চলল তার পেছনে।

উড়ন্ত জ্যাকেটটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ভেবেছিল পাভেল, 'দুই ঝাড়া দিয়েই ধরে ফেলব ওকে,' কিন্তু রাস্তাটার একেবারে শেষে স্টেশনের কাছ পর্যন্ত এসে তবে সে তোনিয়াকে ধরতে পারল। শেষের ঝোঁকটায় এগিয়ে এসে সে শক্ত দুই হাতে তোনিয়ার কাঁধটা চেপে ধরল।

'এইবার ! ধরে ফেলেছি !' খুশির চিৎকারে বলে উঠল পাভেল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'উঃ, লাগছে,' বাধা দিল তোনিয়া।

দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'জনে হাঁপাতে হাঁপাতে, নাড়ির গতি বেড়ে গেছে তাদের। বেদম দৌড়িয়ে ক্লান্ত তোনিয়া সেই মধুর সান্নিধ্যের মুহূর্তে এতো হালকাভাবে পাভেলের দেহে ভর দিয়েছিল যে পাভেল বহুদিন পর্যন্ত সেটা ভুলতে পারে নি।

'এর আগে আমাকে কেউ ধরতে পারে নি,' পাভেলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল তোনিয়া।

এইভাবে আলাদা হয়ে গেল তারা। হাতের টুপিটা বিদায়ের ভঙ্গিতে নেড়ে পাভেল দৌড় দিল শহরের দিকে।

বয়লার-ঘরের দরজাটা যখন সে ঠেলে খুলল, তার আগে থেকেই স্টোকার দানিলো লেগে গিয়েছিল।

'আরও দেরি করে আসতে পারলে না?' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'তোমার কাজটাজ সব আমাকেই করে দিতে হবে নাকি?'

পাভেল তার পিঠ চাপড়ে দিল তাকে শান্ত করবার জন্য। খুশির সঙ্গে বলল, 'এক্ষুনি এক ফুঁয়ে গনগনে আঁচ বের করে দিচ্ছি, দেখ না!' জ্বালানি কাঠ জড়ো করতে লেগে গেল সে।

মাঝরাত্রের দিকে দানিলো যখন কাঠের স্তূপের ওপর আরামে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন ইঞ্জিনটায় তেল দিয়ে, ময়লা ফেঁসোতে হাত মুছে, টুলবাক্সটার ভেতর থেকে বের করে নিল 'জুসেপে গ্যারিবল্ডি' বইটির বাষট্টি নম্বর কিস্তি। ইতালির নেপল্‌স্‌ শহরের 'লাল-কোর্তা'দের এই নেতার সম্বন্ধে লোকমুখে প্রচলিত নানান বিচিত্র দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ-কাহিনীর মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যে ডুবে গেল সে।

'সুন্দর নীল তার চোখদুটি তুলে সে তাকাল ডিউকের দিকে...'

'তোনিয়ারও চোখদুটি নীল,' ভাবল পাভেল, 'আর ও একটু আলাদা ধরনেরও বটে, মোটেই বড়লোকের মেয়ের মতো নয়। আর, কি দারুণ দৌড়তে পারে!'

তোনিয়ার সঙ্গে তার আগের দিনের আলাপ-পরিচয়-কথাবার্তার কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল পাভেল, সে লক্ষ্যই করে নি যে ওদিকে বাড়তি বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনটার গোঙানির শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বড়ো চাকাটা ততক্ষণে ঘুরতে লেগেছে প্রচণ্ড বেগে, ইঞ্জিনটা যার ওপরে বসানো আছে সেই কংক্রিটের গাঁথুনিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

চাপ-মাপার যন্ত্রটার দিকে এক-চোখ তাকিয়েই পাভেল দেখতে পেল — সাবধান-সংকেতের লাল রেখাটার কয়েক বিন্দু ওপরে উঠে গেছে কাঁটাটা।

'ধুত্তোরি ছাই!' একলাফে পাভেল এগিয়ে এল বাড়তি বাষ্প বের করে দেবার লিভারটার দিকে। হাতলটায় তাড়াতাড়ি দুটো পাক দিয়ে দিল, বাষ্পটা নল বেয়ে সবেগে হিস্‌হিস শব্দে বেরিয়ে এসে পড়ল বয়লার-ঘরের বাইরে নদীর বুকে। লিভারটায় এক টান দিয়ে চামড়ার পট্টিটা পরিয়ে দিল পাম্পের চাকায়।

দানিলোর দিকে একবার তাকাল পাভেল, কিন্তু সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, নাক ডাকছে ভীষণ শব্দে। আধ মিনিটের মধ্যেই চাপ-মাপার যন্ত্রের কাঁটাটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল।

* * *

পাভেল ভিন্ন পথে চলে যাবার পর, কালো-চোখ এই তরুণটির সঙ্গে আজকের আলাপের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে তোনিয়া চলল তার বাড়িমুখো। পাভেলের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নিজের অজানতেই খুশি হয়ে উঠেছে তোনিয়ার মন। 'কী উচ্ছল প্রাণশক্তি ছেলেটার! আর, আমি যা ভেবেছিলাম সেরকম গোঁয়ার-গোবিন্দ ও তো মোটেই নয়! আর যাই হোক, ওই সব ইস্কুলে-পড়া লালা-ঝরা ছেলেগুলোর মতো নয় একেবারেই...'

পাভেলের মনের গড়নটা অন্য রকম, এমন একটা পরিবেশ থেকে সে এসেছে যেটা তোনিয়ার কাছে একেবারেই অপরিচিত।

'কিন্তু বাগ মানিয়ে নিতে পারা যাবে ওকে,' মনে মনে ভাবল তোনিয়া, 'বেশ হবে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হলে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে তোনিয়া দেখতে পেল—বাগানে বসে আছে লিজা সুখারকো, নেলি আর ভিক্তর লেশ্চিনস্কি। ভিক্তর কী একটা পড়ছিল। ওরা তার জন্যই অপেক্ষা করছে বোঝা গেল।

সম্ভাষণ-বিনিময়ের পর তোনিয়া একটা বেঞ্চির ওপরে বসল। এদের অন্তঃসারশূন্য গালগল্পের মাঝখানে একসময় ভিক্তর তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে উপন্যাসটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়েছেন?'

'উপন্যাস?' হঠাৎ মনে পড়ল তোনিয়ার, 'ও, বইটা আমি...' প্রায় বলে ফেলেছিল আর-কি যে সে বইটা ভুলে ফেলে এসেছে হ্রদের ধারে।

প্রশ্নভরা চোখে ভিক্তর তাকাল তার দিকে, 'উপন্যাসটা ভাল লেগেছে আপনার?'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবনায় ডুবে গেল তোনিয়া, তারপর জুতোর মাথাটা দিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তাটার ধুলোর বুকে একটা জটিল রেখার আঁচড় কাটতে কাটতে মাথা তুলে তাকাল সে ভিক্তরের দিকে, 'না, আমি ওর চেয়েও ঢের ভাল একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছি।'

'তাই নাকি?' টেনে টেনে বলল ভিক্তর বিরক্ত হয়ে, 'কার লেখা বইটা?'

উজ্জ্বল উপহাসভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে তোনিয়া বলল, 'কারুর লেখা নয়...'

বারান্দা থেকে তোনিয়ার মা ডাকলেন, 'তোনিয়া, তোর বন্ধুদের ভেতরে নিয়ে আয়, চা দেওয়া হয়েছে।'

নেলি আর লিজার হাত ধরে তোনিয়া ওদের নিয়ে এল বাড়ির ভেতরে। তোনিয়ার কথাগুলোর মানে বুঝতে না পেরে ওদের পেছনে পেছনে আসবার সময় ভারি ধোঁকায় পড়ল ভিক্তর।

* * *

এই নতুন আর অদ্ভুত অনুভূতিটা পাভেলকে তার অজানতেই পেয়ে বসেছে, তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই তার বিদ্রোহী স্বভাব বেশ কিছুটা নাড়া খেয়েছে।

তোনিয়ার বাবা প্রধান বনপরিদর্শক। পাভেলের দিক থেকে এটার মানে — তোনিয়ার বাবা আর উকিল লেশ্চিনস্কি বলতে গেলে সমশ্রেণীর মানুষ।

পাভেল মানুষ হয়ে উঠেছে দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে। কাউকে বড়লোক বলে মনে হলেই তার প্রতি পাভেলের মনে একটা বিরুদ্ধতা জাগে। সুতরাং তোনিয়ার প্রতি তার মনোভাবটা হল সংশয় আর সাবধানতা মেশানো। তোনিয়া তাদের নিজেদের একজন নয় — যেমন, ধরা যাক, রাজমিস্ত্রীর মেয়ে ওই গালোচ্‌কার মতো তোনিয়া সরল আর সহজবোধ্য নয়। তোনিয়ার সান্নিধ্যে পাভেলকে সবসময় সচেতন থাকতে হয় — ওর মতো সুন্দরী আর সুশিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে পাভেলের মতো একজন সামান্য কয়লা-জোগানদার মজুরকে বিদ্রূপ করে কিংবা অপমানকর কিছু বলে বসাটা আশ্চর্য নয় বলেই পাভেলও তোনিয়ার ওই ধরনের কোন কথার উপযুক্ত পাল্টা জবাব দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে মনে মনে।

পুরো একটা সপ্তাহ তোনিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। তাই আজ পাভেল হ্রদের দিকে যাবে বলে ঠিক করল। ইচ্ছে করেই সে তোনিয়াদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরল, যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই আশায়। বেড়াটার ধার ঘেঁষে সে যখন আস্তে আস্তে চলেছে, তখন বাগানের শেষ প্রান্তে সেই পরিচিত নাবিক-ধাঁচের ব্লাউজটা দেখতে পেল। পথের ওপর থেকে একটা পাইন-কুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সাদা ব্লাউজটা লক্ষ্য করে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে ছুটে এল তোনিয়া বেড়ার কাছে, উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে হাতটা বাড়িয়ে দিল বেড়ার ওপারে।

‘এসেছেন তাহলে শেষ পর্যন্ত,’ খুশিভরা গলায় বলল সে, ‘কোথায় ছিলেন এতদিন? হ্রদের ওদিকে গিয়েছিলাম ফেলে-আসা বইটা নিয়ে আসবার জন্যে। ভেবেছিলাম হয়তো আপনার দেখা পাব ওখানে। আসুন না আমাদের বাগানের ভেতরে।’

মাথা নাড়ল পাভেল, ‘না।’

‘কেন?’ বিস্ময়ে ভুরু তুলল তোনিয়া।

‘আপনার বাবা গালাগালি করবেন নিশ্চয়। আমার মতো একটা গরিব ওঁচা লোককে বাগানে ঢুকতে দেবার জন্যে নিশ্চয় আপনার ওপরে একচোট বকুনি হবে।’

‘কি বাজে বকছেন, পাভেল,’ চটে গিয়ে বলল তোনিয়া, ‘এক্ষুনি আসুন ভেতরে, আমার বাবা ওসব কিছুই বলবেন না। দেখতেই পাবেন। আসুন, ভেতরে আসুন।’

দেউড়িটা খুলে দেবার জন্য ছুটে এল তোনিয়া। অনিশ্চিতভাবে বাগানে ঢুকল পাভেল।

বাগানের মধ্যে মাটিতে গাঁথা একটা গোল টেবিলের ধারে দু’জনে বসার পর তোনিয়া জিজ্ঞেস করল, ‘বই ভালোবাসেন আপনি ?’

সাগ্রহে বলল পাভেল, ‘খুব।’

‘কী বই আপনার সবচেয়ে পছন্দ ?’

দু’-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে উত্তর দিল পাভেল, ‘জুসেপা গারিবল্‌ডি।’

‘জুসেপে গ্যারিবল্ডি,’ সংশোধন করে দিল তোনিয়া, ‘ওই বইটা আপনার খুব ভাল লাগে বুঝি ?’

‘হ্যাঁ। আমি বইটার আটষট্টিটা কিস্তির সবগুলো পড়েছি। আমি প্রত্যেক হপ্তা মজুরি পাবার দিনে পাঁচটা করে কিস্তি কিনি। গ্যারিবল্ডি — হ্যাঁ, একটা মানুষের মতো মানুষ !’ বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পাভেল, ‘সত্যিকারের বীর ! একেই তো বলি সাচ্চা মানুষ একটা ! কতগুলো লড়াই করতে হয়েছে লোকটাকে — আর প্রত্যেকটায় জিতেছে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরেছে ! গ্যারিবল্ডি আজ বেঁচে থাকলে আমি ওঁর দলে গিয়ে ঢুকতাম, সত্যি বলছি। গ্যারিবল্ডি তো যতসব মজুরদের তাঁর দলে নিতেন, আর তারা সবাই মিলে লড়াই করত গরিব মানুষদের জন্যে।’

‘চলুন, আমাদের লাইব্রেরিটা দেখাব আপনাকে !’ পাভেলের হাত ধরে বলল তোনিয়া।

আপত্তি করল পাভেল, ‘না, না। বাড়ির ভেতরে যাব না আমি।’

‘এত গোঁয়ার্তুমি করেন কেন ? ভয় পাচ্ছেন নাকি ?’

পাভেল তার খালি পাদুটোর দিকে তাকিয়ে মাথাটা চুলকোতে লাগল — আহা-মরি পরিষ্কার কিছু নয় সে দুটো।

‘আপনার বাবা কিংবা মা আমাকে বের করে দেবেন না তো ?’

চটে গেল তোনিয়া, ‘ওসব কথা ছাড়ুন দেখি, আমি রাগ করব আপনার ওপর।’

‘লেশ্চিনস্কিরা কিন্তু কক্ষনও আমাদের মতো লোকজনদের ঢুকতে দেয় না ওদের বাড়িতে। আমাদের শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে কথা বলে রান্নাঘরে। আমি একবার কী-একটা কাজে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি, নেলি তো ঘরেই ঢুকতে দিল না — গালিচা নোংরা করে দেব কিংবা ওইরকম কিছু একটা করব ভেবে ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়ই,’ হেসে বলল পাভেল।

‘আসুন, আসুন,’ তাগিদ দিল তোনিয়া, পাভেলের কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বারান্দাটার দিকে।

খাবার-ঘরটার মধ্যে দিয়ে ওকে নিয়ে এল আরেকটা ঘরে, সেখানে বিরাট একটা ওক-কাঠের আলমারি। তার পাল্লাদুটো খুলে ফেলতেই পাভেল দেখল তার সামনে পরিপাটি করে সাজানো সারি সারি অজস্র বই। এমন সম্পদ সে জীবনে কোনদিন দেখে নি।

‘আচ্ছা, আপনার জন্যে একটা ভাল বই বেছে দিচ্ছি। কিন্তু কথা দিন — আরও বই নেবার জন্যে নিয়মিত আসবেন, কেমন ?’

সানন্দে মাথা নাড়ল পাভেল। বলল, ‘বই আমি খুব ভালোবাসি।’

খুশিভরা কয়েকটি ঘণ্টা একসঙ্গে সেদিন কাটাল তারা! তোনিয়া তার মায়ের সঙ্গে পাভেলের আলাপ করিয়ে দিল। পাভেল যে-রকমটি ভেবে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেরকম ভীষণ কিছু ব্যাপার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোনিয়ার মাকে তার ভালই লাগল বেশ।

তোনিয়া তার নিজের ঘরে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে নিজের পাঠ্যবই ও অন্যান্য বই দেখাল।

প্রসাধনের টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা আয়না। সেটার সামনে পাভেলকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু হেসে উঠে বলল, ‘মাথার চুলগুলো এমন বুনো ঝাড়ের মতো বাড়তে দিয়েছেন কেন ? চুলটা কি কখনো ছাঁটেন না বা আঁচড়ান না ?’

একটু অস্বস্তির সঙ্গে কৈফিয়ত দিয়ে পাভেল বলল, ‘বেশি বড়ো হয়ে গেলে স্রেফ কামিয়ে ফেলি। চুল নিয়ে আর কী করব ?’

শুনে হাসল তোনিয়া, টেবিলের ওপর থেকে একটা চিরুনি নিয়ে তাড়াতাড়ি বার কয়েক আঁচড়ে দিল উষ্কখুষ্ক কোঁকড়া চুলগুলো। তারপরে পাভেলকে নিরীক্ষণ করে বলল, ‘এইবার ঠিক হয়েছে। চুলটা ভাল করে ছাঁটবেন, অমন ন্যালাখ্যাপার মতো ঝাঁকড়া-চুলো হয়ে বেড়ান কেন ?’

পাভেলের বিবর্ণ খয়েরি রঙের জামা আর জীর্ণ প্যান্টের দিকে এক-নজর খুঁটিয়ে দেখে নিল তোনিয়া, কিন্তু আর কোন মন্তব্য করল না।

তোনিয়ার নজরটা লক্ষ্য করে পাভেল লজ্জা পেল তার জামাকাপড়ের কথা ভেবে।

বিদায় নেবার সময় তোনিয়া তাকে আবার আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। পাভেলের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল যে সে আবার দু’দিন বাদে এসে তোনিয়ার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে।

সরাসরি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে খুব সহজ উপায়েই পাভেল বেরিয়ে এল তোনিয়ার বাড়ি থেকে। অন্য সব ঘরগুলো পার হয়ে তোনিয়ার মা'র সঙ্গে দেখা করে আসার কথাটা তার মনেই হয় নি।

* * *

আরতিওম চলে যাবার পর থেকে করচাগিন-পরিবারে কষ্ট শুরু হয়েছে। পাভেলের মজুরি যথেষ্ট নয়।

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা পাভেলকে বলল, সে যদি আবার আগেকার মতো কাজে লাগে তাহলে কেমন হয় — বিশেষ করে যখন লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে একজন রাঁধুনির দরকার। কিন্তু পাভেলের তাতে মত নেই।

'না, মা। আমি একটা বাড়তি কাজ জোগাড় করে নেব। করাত-কলে ওরা লোক চায় কাঠের তক্তা জড়ো করার জন্যে। আমি ওখানে আধা-রোজ করে কাজ করব, তাহলেই আমাদের চলে যাবার মতো যথেষ্ট রোজগার হবে এখন। তুমি কিছুতেই কাজে যেতে পাবে না, তাহলে তোমাকে না খাটিয়ে নিজে চালাতে পারি নি বলে আরতিওম রাগ করবে আমার ওপর।'

মা পীড়াপীড়ি করবার চেষ্টা করল, কিন্তু পাভেল গোঁ ধরে রইল, রাজী হল না।

পরের দিনই পাভেল করাত-কলে কাজে লেগে গেল — সদ্য-কাটা কাঠের তক্তাগুলো শুকোতে দেবার জন্য জড়ো করা তার কাজ। চেনা কতকগুলো ছেলের সঙ্গে সেখানে তার দেখা — তার স্কুলের পুরনো সহপাঠী মিশা লেভচুকভ আর ভানিয়া কুলিশভ। মিশা আর সে জুটি বেঁধে কাজ করতে শুরু করল, ঠিকে হিসেবে কাজ করে তাদের রোজগারও মন্দ দাঁড়াল না। করাত-কলে পাভেলের দিনটা কাটে, রাত্রিবেলায় সে যায় বিদ্যুৎ-স্টেশনের কাজে।

দশ দিনের দিন বিকেলে পাভেল তার রোজগার নিয়ে এল মায়ের কাছে। টাকাটা মায়ের হাতে দিয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে ইতস্তত করে লজ্জায় মুখ রাঙা করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'ইয়ে, এই বলছিলাম কি, আমাকে একটা সাটিনের জামা কিনে দাও না, মা — নীল রঙের — গেল বছরে যেমনটি দিয়েছিলে, মনে আছে তো? প্রায় অর্ধেকটা টাকাই লেগে যাবে অবশ্য — কিন্তু তুমি ভেব না, আমি আরও কিছু রোজগার করব। আমার এই জামাটা একেবারে পচে গেছে।' তাড়াতাড়ি বলল সে, যেন এই অনুরোধ করার জন্য মাপ চাইছে।

'সে কি রে, নিশ্চয় কিনব বৈকি,' বলল মা, 'আজই কাপড়টা কিনে আনব, বুঝলি পাভ্‌লুশা, কাল দেব সেলাই করে। সত্যিই তোর একটা নতুন জামার বড়ো দরকার।' সস্নেহে সে তাকাল ছেলের দিকে।

* * *

চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানটার সামনে একটু থেমে পকেটের ভেতরে রুবলটা নাড়াচাড়া করতে করতে পাভেল দাঁড়াল দরজাটার মুখে।

নাপিত বেশ চৌকস চেহারার এক তরুণ। পাভেলকে ঢুকতে দেখে তাকে খালি চেয়ারটা মাথা নেড়ে দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

নরম উঁচু চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসে পাভেল তার সামনের আয়নায় একটা অপ্রতিভ রাঙা মুখ দেখতে পেল।

নাপিত জিজ্ঞেস করল, 'ছোট করে ছেঁটে দেব ?'

'হ্যাঁ... মানে, না — এই কি বলে গিয়ে — আমি চুলটা ছাঁটতে চাই আর কি — যাকে বলে গিয়ে...' থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পাভেল, হাত নেড়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল।

হাসল নাপিত, 'বুঝেছি।'

পনের মিনিট পরে দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত পাভেল বেরিয়ে এল — চুলটা তার পরিপাটি করে ছাঁটা আর আঁচড়ানো। অবাধ্য চুলগুলোকে বাগ মানাতে গিয়ে বেশ খাটতে হয়েছে নাপিতকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল আর চিরুনির জয় হয়েছে, খোঁচা খোঁচা চুলের গোছটা এখন দিব্যি বসে গেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল তার টুপিটা ঠেলে নামিয়ে দিল চোখের ওপর। 'কি জানি, মা আমাকে দেখে কি বলবে,' মনে মনে ভাবল সে।

* * *

একসঙ্গে মাছ ধরতে যাবার কথা পাভেল না রাখাতে তোনিয়া বিরক্ত হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, 'ওই কয়লা-জোগানদার ছেলেটার অন্যের সম্বন্ধে তেমন বিবেচনা নেই।' কিন্তু আরও কয়েকটা দিন কেটে যাবার পরেও যখন পাভেল এল না, তখন তোনিয়ার মন কেমন করতে লাগল।

একদিন যখন সে বেড়াতে বেরুচ্ছে, এমন সময়ে তার মা তার ঘরে এসে বললেন, 'তোর সঙ্গে একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে তোনিয়া, আসতে বলব নাকি ?'

দরজার কাছে দেখা গেল পাভেলকে, চেহারা এত বদলে গেছে যে তোনিয়া প্রথমে তাকে প্রায় চিনতেই পারে নি।

পরনে তার আনকোরা নতুন সাটিনের জামা আর কালো প্যাণ্ট, চকচকে করে পালিশ করা তার বুট-জোড়া। তোনিয়া এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখে নিয়েছে, তার খোঁচা খোঁচা চুল পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করা। ময়লা-নোংরা তরুণ মজুরটি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে একেবারে।

বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেকে সময়মতো সামলে নিল তোনিয়া, কারণ পাভেল যে এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে সেটা বুঝতে পেরে সে আর তাকে বেশি লজ্জা দিতে চাইল না। পাভেলের চেহারায় পরিবর্তনটা লক্ষ্য না করার ভান করে সে তাকে বকতে শুরু করে দিল, 'মাছ ধরতে যাবার জন্যে এলেন না কেন? এই বুঝি আপনার কথা রাখা? ছিঃ ছিঃ!'

'আমি এতদিন করাত-কলে কাজ করছি, একেবারে আসবার সুযোগ পাই নি।'

এই জামা আর প্যাণ্টটা কিনবার জন্য সে যে এই ক'দিন বেদম কাজ করেছে, সে কথা পাভেল তোনিয়াকে বলতে পারল না।

তোনিয়া অবশ্য ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল, পাভেলের ওপরে তার রাগ উবে গেল।

'চলুন, পুকুরের ধারে বেড়াতে যাই,' বলল তোনিয়া। বাগান ছাড়িয়ে তারা এসে পড়ল রাস্তার ওপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাভেল তোনিয়াকে বলতে শুরু করে দিয়েছে লেফ্‌টেন্যাণ্টের ঘর থেকে সেই পিস্তল-চুরির ঘটনাটা। তার এই মস্তবড়ো গোপনীয় কথাটা বন্ধুর মতো তোনিয়ার কাছে সমস্ত বলল সে। শিগ্‌গিরই পাভেল একদিন তোনিয়াকে নিয়ে বনের গভীর অঞ্চলে গিয়ে গুলি ছুঁড়ে শিকার-টিকার করবে এমন কথাও দিল।

তারপরে হঠাৎ তাকে 'তুমি' সম্বোধন করে বলে উঠল পাভেল, 'কিন্তু দেখো, কারুর কাছে আমাকে ফাঁস করে দিও না যেন।'

'আমি কক্ষণো কারুর কাছে তোমাকে ফাঁস করব না,' প্রতিজ্ঞা করল তোনিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

গোটা ইউক্রেন জুড়ে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড, নির্মম শ্রেণীসংগ্রাম। ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে লোক এগিয়ে আসছে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে, প্রত্যেকটি সংঘাত নতুন নতুন অংশীদারদের টেনে আনে।

নাগরিকদের সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন আর নেই।

তুষারঝড় উঠল, কামানের গোলা ফাটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট ছোট জীর্ণ বাড়িগুলো। নাগরিকরা জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের মাটির নিচের ভাঁড়ারঘরে কিংবা পেছনের আঙিনায় খোঁড়া গর্তের মধ্যে।

নানান ছোপ আর নানান ছাঁদের পেৎলিউরা-দস্যুবাহিনী সমস্ত অঞ্চলটা ছেয়ে ফেলেছে। ছোট-বড়ো দলের নেতা, স্থানীয় গোষ্ঠী-সর্দার, গোলুব, আর্কেঞ্জেল, এঞ্জেল, গর্দিউস্, ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বোম্বেটের নেতৃত্বে যতোসব লুটেরা-দল বন্যার মতো নেমে এসেছে।

জারের সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার, ইউক্রেনের দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, কিংবা যেকোন বেপরোয়া লোকই কিছু খুনী-ডাকাতকে জড়ো করামাত্র নিজেকে 'আতামান' বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে; কেউ কেউ তাদের নিজের নিজের সাধ্য, শক্তি আর সুযোগ অনুসারে যতোটা পারছে জায়গা দখল করে পেৎলিউরা-দলের হলদে-নীল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে নিচ্ছে।

হরেক রকমের এই দঙ্গলগুলিতে আরও জুটেছে কুলাক্‌রা আর আতামান কোনোভালেৎসের ফৌজের গ্যালিসীয় সৈন্যরা। আর এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে থেকে 'প্রধান আতামান' পেৎলিউরা গড়ে তুলেছে তার সৈন্যবাহিনী। লাল পার্টিজান সৈন্যদলগুলি যখন এই সব সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের আর কুলাক্‌দের দলবলের ওপর আক্রমণ চালাল, তখন হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে আর মেশিনগান, কামান ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যাওয়া গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

অস্থির, উত্তাল সেই ১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে আতঙ্কে বুদ্ধিভ্রষ্ট কোন ভদ্দরনাগরিক হয়তো সকালবেলায় ঘরের জানালাব খড়খড়িটা খুলে, ঘুমে ভারি চোখে চেয়ে, মুখ বাড়িয়ে তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করছে, 'আভ্‌তোনম পেত্রোভিচ, বলতে পারেন আজ শহরের কর্তা কে?'

এবং আভ্‌তোনম পেত্রোভিচ হয়তো তখন তার প্যাণ্ট আঁটসাঁট করে বাঁধতে বাঁধতে এদিকে-ওদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলে জবাব দিচ্ছে, 'জানি নে, আফানাস্ কিরিলোভিচ। রাত্রে কারা যেন ঢুকেছে শহরে — কারা, সেটা শিগ্‌গিরই জানতে পারব: যদি ওরা ইহুদিদের ধরে লুঠপাট শুরু করে, তাহলে বুঝব, ওরা পেৎলিউরার, আর, যদি ওই 'কমরেডদের' কেউ হয়, তাহলে ওদের কথাবার্তা ধরন-ধারনেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারব। আমি তো কার ছবি ঘরে টাঙাতে হবে সবসময় সেই দিকে লক্ষ্য রাখছি — আমাদের ওই পাশের বাড়ির গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচের মতো যাতে আবার বিপদে পড়তে না

হয়। জানেন তো, ভাল করে না দেখেশুনেই সে গিয়ে দিব্যি লেনিনের ছবি টাঙিয়ে বসে আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক এসে তাকে ধরেছে চেপে: দেখা গেল তারা পেৎলিউরার লোক। ছবিটার দিকে একনজর দেখেই ওরা বাড়ির কর্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল বেশ ঘা-কতক — তা প্রায় গোটা কুড়ি চাবুকের ঘা হবে; ওরা খেঁকিয়ে উঠল, 'জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর, শুয়োরের বাচ্চা কমিউনিস্ট কোথাকার!' গেরাসিম যতোই চেঁচায় আর যতোই প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্যে, কিছুতেই কিছু হবার নয়।'

দলে দলে সশস্ত্র লোকজনদের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলে জানলা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ে ভদ্দরনাগরিকরা। মনে মনে ভাবে, সাবধানের মার নেই...

শ্রমিকরা একটা চাপা ঘৃণার সঙ্গে দেখে পেৎলিউরা-ঠগীদের হলদে আর নীল ঝাণ্ডাটাকে। ইউক্রেনের এই সব উগ্র জাতীয়তাবাদী পেটি বুর্জোয়া স্রোতের সামনে তারা অসহায় বোধ করে। তাদের মনোবল ফিরে আসে আর উৎসাহ জাগে শুধু যখন কোন লাল সৈন্যদল চারিদিক থেকে ঘিরে-আসা ওই পেৎলিউরা বাহিনীকে প্রচণ্ড লড়াই করে হটিয়ে দিয়ে পথ কেটে এসে শহরের মধ্যে ঢোকে। দু'-এক দিন শ্রমিকের অতিপ্রিয় লাল ঝাণ্ডাটা ওড়ে টাউন-হলের মাথায়, কিন্তু তার পরেই দলটা এগিয়ে যায় আর আবার নিরানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সবকিছু।

ইদানীং শহরটা আছে কর্নেল গোলুব-এর হাতে — নীপার-পারের ডিভিশনের 'আশা আর গর্ব' কর্নেল গোলুব।

আগের দিন তার হাজার দুয়েক খুনী-ডাকাতের একটা বাহিনী বিজয়-অভিযান করে শহরে ঢুকেছে। অতি সুন্দর একটা কালো ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসারির আগে আগে এল পান্ গোলুব। এপ্রিল মাসের চনমনে রোদ সত্ত্বেও তার পরনে ছিল একটা ককেশীয় বুর্কা, চুড়োয় উজ্জ্বল লাল রঙের বেড় দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কসাক-টুপি, কালো 'চের্কেস্কা' আর এই পোশাকের সঙ্গে মানানসই নানারকম অস্ত্রশস্ত্র: ছোরা আর রুপোর পাতে মোড়া হাতলওয়ালা বাঁকানো লম্বা তলোয়ার। তার দাঁতে চেপে ধরা ছিল একটা বাঁকা ডাঁটিওয়ালা পাইপ। সুন্দর চেহারা পান্ কর্নেল গোলুব-এর: চোখের ভুরুদুটি কালো, বিবর্ণ ফর্সা মুখে নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপানজনিত হাল্কা হলুদের আভাস।

বিপ্লবের আগে এই পান্ কর্নেল ছিল একটা চিনি-কলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিট-উৎপাদন-খামারের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। কিন্তু তার সে-জীবনটা ছিল নিতান্তই ভোঁতা, 'আতামান'এর পদ-পদবির সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। অতএব, গোটা দেশ জুড়ে যে ঘোলা-জলের ঢেউ বয়ে চলেছে, তারই চূড়ায় এই উদ্ভিদতত্ত্ববিদটি পান্ কর্নেল গোলুব হিসেবে আবির্ভূত হল।

শহরের একমাত্র থিয়েটার-গৃহে এই আগন্তুকদের সম্মানে একটা আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হল। পেৎলিউরা-সমর্থক বিশিষ্ট নাগরিকদের 'শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ'রা সবাই উপস্থিত: ইউক্রেনীয় শিক্ষকের দল, পাদ্রীমশাইয়ের দুই কন্যা — সুন্দরী আনিয়া আর তার ছোট বোন দিনা, অপেক্ষাকৃত মাঝারি অবস্থার জনকতক অভিজাত লোক, কাউন্ট পতোৎস্কির পরিবারের কয়েকজন ভূতপূর্ব ভৃত্য আর কিছুসংখ্যক সাধারণ মধ্যবিত্ত নাগরিক, ইউক্রেনীয় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি দলের অবশিষ্ট কিছু লোক, যারা নিজেদের 'স্বাধীন কসাক' বলে থাকে।

জমজমাট থিয়েটার-গৃহ। পাদ্রীকন্যা, মধ্যবিত্ত মহিলা আর শিক্ষিকাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে ঘোড়ায়-চড়া বুটের খটখটে আওয়াজ তুলে অফিসাররা, যাদের বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন তারা 'জাপোরোঝিয়ে-কসাকদের' পুরনো ছবি থেকে উঠে এল। আর, উজ্জ্বল রঙের ফুলের নক্সা-তোলা ইউক্রেনের জাতীয় পোশাকে রঙচঙে পুঁতির মালা আর ফিতেয় সেজেগুজে এসেছে ঐ মহিলারা।

সামরিক বাজনাদাররা বাজনা শুরু করে দিল। আজ সন্ধ্যায় যে 'নাজার স্তদোলিয়া' নামে নাটকটির অভিনয় হবার কথা আছে তার জন্য মঞ্চের ওপর ঊর্ধ্বশ্বাস প্রস্তুতি চলেছে।

কিন্তু বিজলি-সরবরাহ বন্ধ। ঘটনাটা যথাসময়ে সদর ঘাঁটিতে পান্ গোলুবের কর্ণগোচর করল তার অ্যাড্‌জুট্যান্ট সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট পালিয়ান্ত্‌সেভ, সে নিজের নাম আর পদবি ইউক্রেনীয় ধাঁচে করে নিয়ে নিজেকে ইদানীং 'খোরুঞ্জি'* পালিয়ানিৎসা বলে অভিহিত করে থাকে। কর্নেলটি আজকের সান্ধ্য-উৎসবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। পালিয়ানিৎসার কথাটা শুনে সে অবজ্ঞাভরে, কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে বলল, 'আলোর ব্যবস্থাটা কর। একজন ইলেকট্রিশিয়ান জোগাড় করে বিদ্যুৎ-স্টেশনটা চালু কর — মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও এটা করা চাই।'

'যে-আজ্ঞে, পান্, কর্নেল!'

খোরুঞ্জি পালিয়ানিৎসা মাথা না খুঁড়েই বিজলি-মিস্ত্রিদের জোগাড় করল।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাভেল এবং আর দু'জন মিস্ত্রিকে সশস্ত্র প্রহরায় নিয়ে আসা হল বিদ্যুৎ-স্টেশনে।

'সাতটার মধ্যে যদি আলো না জ্বলে, তাহলে তোমাদের তিনজনকেই ঝুলিয়ে দেব,' কথাটা বলে পালিয়ানিৎসা ওদের মাথার ওপরে একটা লোহার কড়িকাঠের দিকে দেখিয়ে দিল।

---

* কসাক অশ্বারোহী বাহিনীতে জুনিয়ার অফিসার। — সম্পাঃ

অবস্থাটার এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় কাজ হল — নির্দিষ্ট সময়েই আলো জ্বলে উঠল।

পুরোদমে যখন সান্ধ্য-উৎসব চলেছে, তখন পান্ কর্নেল এল তার সঙ্গিনীকে নিয়ে — গোলুব যে শুঁড়ির বাড়িতে তার ডেরা নিয়েছে, তারই পীনবক্ষ সোনালি-চুল মেয়েটি তার সঙ্গিনী।

তার বাপের পয়সা আছে, তাই সে সদর শহরের হাই স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে।

সামনের সারিতে এই দু'জন মাননীয় প্রধান-অতিথি পূর্বনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তার পরেই পান্ কর্নেল ইশারা করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই এমন আকস্মিকভাবে পর্দাটা উঠে গেল যে মঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাবার সময়ে পরিচালকের পেছন দিকটা একনজর দেখতে পেল দর্শকরা।

নাটকের অভিনয় চলতে থাকার সময়ে অফিসাররা আর তাদের সঙ্গিনীরা সময় কাটাল যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। সর্বকর্মপটু পালিয়ানিৎসা আয়োজন করে রেখেছিল — হুকুমের জোরে সরবরাহ করা নানারকম সুখাদ্য আর ঘরে তৈরি নির্জলা মদে ভরাট হয়ে উঠল সবাই। নাটকের অভিনয়ের শেষ নাগাদ সবারই অবস্থা বেশ টইটম্বুর গোছের।

যবনিকা-পতনের পর মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল পালিয়ানিৎসা। বাহুদুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে বিক্ষিপ্ত করে সে ঘোষণা করল, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! এখুনই নাচের আসর শুরু হবে।'

হাততালি দিল সবাই। তারপরে সবাই বাইরের আঙিনায় বেরিয়ে এল যাতে পেৎলিউরা পাহারাদার সৈন্যরা চেয়ারগুলো বের করে দিয়ে অতিথিদের নাচের জন্য থিয়েটার-ঘরের মেঝেটা খালি করে দিতে পারে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই থিয়েটার-ঘরে একটা উদ্দাম হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল।

উত্তাপে রাঙা-মুখ স্থানীয় সুন্দরীদের নিয়ে সমস্ত সংযম জলাঞ্জলি দিয়ে পেৎলিউরা-অফিসাররা উদ্দাম 'হোপাক' নৃত্য শুরু করে দিল। ভারি ভারি বুটের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠল জীর্ণ-শীর্ণ থিয়েটার-বাড়ির দেওয়ালগুলো।

ইতিমধ্যে, সশস্ত্র একটা অশ্বারোহী-বাহিনী শহরের দিকে আসছিল ময়দা-কলের দিক থেকে।

শহরের প্রান্তে যে পেৎলিউরা সান্ত্রীদের বসানো আছে পাহারাদারি করার জন্য, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল তাদের মেশিনগানের দিকে, গুলি ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত বন্দুকগুলোর ঘোড়া-নামানোর খটাখট আওয়াজ শোনা গেল, রাত্রির অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ম আহ্বান ভেসে এল:

'থামো ! কে যায় ?'

দুটো কালো মূর্তি স্পষ্ট হয়ে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে। একজন এগিয়ে এসে কর্কশ আর ভারি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আতামান পাভ্‌লিউক আর তাঁর সৈন্যদল। তোমরা কারা ? গোলুবের লোক ?'

'হ্যাঁ,' বলল একজন অফিসার — সেও এগিয়ে এসেছিল।

পাভ্‌লিউক জিজ্ঞেস করল, 'আমার লোকজনদের থাকার জায়গা দেব কোথায় ?'

'আমি এখুনি সদর ঘাঁটিতে টেলিফোন করছি,' বলেই অফিসারটি অদৃশ্য হয়ে গেল পথের ধারে একটা ছোট কুটিরের মধ্যে।

মিনিটখানেক বাদে সে ফিরে এসে হুকুম দিতে থাকল, 'মেশিনগানটা রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে নাও ! পান্ আতামানকে পথ ছেড়ে দাও !'

আলোয় উজ্জ্বল থিয়েটার-বাড়ির সামনে খোলা হাওয়ায় বহু লোক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, পাভ্‌লিউক বাড়িটার সামনে এসে তার ঘোড়ার রাশ টানল।

পাশের ক্যাপ্টেন-সঙ্গীটির দিকে ফিরে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে খুব ফুর্তি জমেছে এখানে। এসো হে গুক্‌মাচ্ নেমে পড়, একটু আমোদ-টামোদ করা যাক। এক-জোড়া মেয়ে ধরে নেওয়া যাবে — মেয়েমানুষে তো ভর্তি দেখছি জায়গাটা। ওহে স্তালেঝ্‌কো,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তুমি দেখো, শহরের বাড়িতে বাড়িতে আমাদের লোকজনের একটা থাকার ব্যবস্থা করো গে। আমরা একটু এখানে হয়ে যাচ্ছি। কই, আমার দেহরক্ষীরা এসো।' ক্লান্ত ঘোড়াটার ওপর থেকে সে ভারি দেহটা নামিয়ে নিল।

থিয়েটারের প্রবেশ-দরজায় পাভ্‌লিউককে থামাল দু'জন সশস্ত্র পেৎলিউরা-সান্ত্রী, 'টিকেট ?'

তাদের দিকে অবজ্ঞার চোখে এক-নজর দেখে একজনকে কাঁধের একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পাভ্‌লিউক। তার সঙ্গের অন্য বারো জনও তাকে অনুসরণ করল। তাদের ঘোড়াগুলো বাইরে বেড়ায় বাঁধা রইল।

আগন্তুকদের তৎক্ষণাৎ লক্ষ করল সবাই। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল পাভ্‌লিউক-এর বিরাট দেহটা। ভাল কাপড়ে তৈরি অফিসারের কোট তার পরনে, গার্ডবাহিনীতে যেরকম পরে সেই রকম নীল ব্রিজেস, আর মাথায় ঝাঁকড়া পশমের টুপি। কাঁধের ওপর দিয়ে টানা চামড়ার ফিতেটায় ঝুলছে একটা মাউজার-পিস্তল, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা হাত-বোমা।

'কে ইনি ?' ফিসফিস প্রশ্নটা ভিড়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে গেল নাচের আসরে যেখানে গোলুবের সহকারী উদ্দাম নাচ নাচছে।

পাদ্রীর বড় মেয়েটা তার নৃত্যসঙ্গিনী, এমন বেপরোয়া হয়ে সে বনবন করে

ঘুরছে যে তার ঘাগরাটা বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে রেশমী অন্তর্বাসগুলো রীতিমত দেখা যাচ্ছে আর সৈন্যরা তো তাই দেখে ভারি খুশি।

ভিড় ঠেলে সরিয়ে পাভ্‌লিউক সোজা নাচের জায়গাটায় চলে এল।

চকচকে চোখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাদ্রীকন্যার পায়ের দিকে, তারপরে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে নাচের আসরটা পার হয়ে অর্কেস্ট্রা মঞ্চের কাছে এসে একটু থেমে পাকানো ঘোড়ার চাবুকটা নেড়ে বলল, 'ওহে, 'হোপাক' নাচের সুরটা বাজাও!'

ঐকতান-বাদন যে পরিচালনা করছিল, সে কান দিল না তার কথায়। তারপর পাভ্‌লিউকের হাতের একটা তীব্র বিক্ষেপে সঙ্গীত-পরিচালকের পিঠের ওপর কেটে বসে গেল চাবুকটা। প্রচণ্ড এক আকস্মিক যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠল সঙ্গীত-পরিচালক, বাজনা থেমে গেল, হলঘর নিস্তব্ধ।

'এ কি অসহ্য বেয়াদপি!' প্রচণ্ড রাগে ক্ষেপে গেছে শুঁড়ীর মেয়েটি। পাশের আসনে বসা গোলুবের কনুই চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তোমার চোখের সামনে এমন ব্যাপার ঘটতে দেবে!'

টেনে দাঁড় করাল নিজেকে গোলুব, একটা চেয়ার লাথি মেরে সরিয়ে দিল, তিন পা এগিয়ে এসে পাভ্‌লিউকের মুখোমুখি দাঁড়াল। সে সঙ্গে সঙ্গেই এই আগন্তুকটিকে চিনতে পেরেছে। স্থানীয় ক্ষমতাদখলের এই প্রতিদ্বন্দ্বীটির সঙ্গে তার বেশ কিছুটা বোঝাপড়া করার ছিল।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে পান্ কর্নেলের সঙ্গে একটা জঘন্য রকমের প্রতারণা করেছে এই পাভ্‌লিউক। লাল সৈনিকদের একটা দল গোলুবের বাহিনীকে একাধিকবার ক্ষতবিক্ষত করেছে—তাদের সঙ্গে যখন পুরোদমে একটা লড়াই চলছিল, তখন পাভ্‌লিউক ওই বলশেভিকদের পেছন থেকে আক্রমণ না করে একটা ছোট শহরে ঢুকে সেখানকার অল্পসংখ্যক লাল পাহারাদারদের হটিয়ে দিয়ে, আত্মরক্ষার জন্য চারধারে সৈন্যঘেরাও করে রেখে শহরটাকে একেবারে নিঃশেষে লুঠপাট করে নিয়ে যায়। অবশ্য, পেৎলিউরার লোক হিসেবে সে বিশেষ নজর রেখেছিল যাতে শহরের ইহুদী বাসিন্দারাই তার লুটের প্রধান শিকার হয়।

ইতিমধ্যে লাল সৈন্যদলটি গোলুবের বাহিনীর ডান-দিকটাকে চুরমার করে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

আর এখন কিনা ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর এই উদ্ধত ক্যাপ্টেনটি এখানে গায়ের জোরে ঢুকে পড়ে পান্ কর্নেল গোলুবের চোখের সামনেই তার নিজস্ব সামরিক বাজনদার-দলের পরিচালককে মেরে বসতে সাহস করেছে! না, বড্ড বাড়াবাড়ি এটা।

গোলুব বুঝতে পারল যে সে যদি এই অহংকারীকে ঢিট না করে, তাহলে, সৈন্যবাহিনীতে তার ইজ্জত বলে কিছু থাকবে না।

কয়েক মুহূর্ত এই দু'জন লোক পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর একহাতে তলোয়ারের হাতলটা চেপে আর অন্য হাতে পকেটের পিস্তলটা নাড়াচাড়া করতে করতে গোলুব খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন্ সাহসে আমার লোকের গায়ে হাত দিয়েছিস, শয়তান?'

পাভ্‌লিউকের হাতখানা এগিয়ে গেল তার মাউজার-পিস্তলের খাপটার দিকে, 'একটু সামলে, পান্ গোলুব! দেখো, পা ফসকে না যায়। আমাকে ঘা দিও না, আমিও তো মেজাজ খারাপ করে বসতে পারি।'

এটা গোলুবের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বের করে দাও এদের, আর প্রত্যেককে পঁচিশ ঘা করে চাবুক মারো!'

গোলুবের অফিসাররা পাভ্‌লিউক আর তার লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল ডালকুত্তার মতো।

একটা গুলি বেরিয়ে গেল — শব্দটা যেন মেঝের ওপর একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার মতো শোনাল। দুইদল লড়াকু কুকুরের মতো লোকগুলো মারামারি, জাপটা-জাপটি, গড়াগড়ি করতে থাকল হল-ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে লোকগুলো সাঁই-সাঁই তলোয়ার চালাল পরস্পরের উদ্দেশে, একে অন্যের চুল টেনে ধরল, নখ বসিয়ে দিল গলায়, আর মেয়েরা সব খোঁচা-খাওয়া শুয়োরের মতো আর্তস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে লড়্‌নেওয়ালাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকল চারদিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাভ্‌লিউক আর তার লোকজনকে হলের বাইরে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে এনে বের করে দেওয়া হল রাস্তায় — বেদম মার খেয়েছে তারা, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মারামারির মধ্যে পাভ্‌লিউক নিজে হারিয়েছে তার পশমী টুপী, মুখটা ছড়ে গেছে তার, হাতিয়ারগুলো বেহাত হয়ে গেছে — প্রচণ্ড রাগে সে আত্মহারা। জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে সে আর তার দলবল ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তা বেয়ে।

মাটি হয়ে গেছে সন্ধ্যেটা। এই ঘটনার পরে আর কারুরই আমোদ-প্রমোদে মত্ত হবার বাসনা নেই। মেয়েরা আর নাচে যোগ দিতে চাইল না, তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু গোলুব তা শুনবে না। সে হুকুম দিল, 'সান্ত্রী মোতায়েন করে দাও চারধারে, কেউ যেন চলে যেতে না পারে।'

পালিয়ানিৎসা ছুটে গেল হুকুম তামিল করার জন্য।

তুমুল প্রতিবাদ উঠল, কিন্তু কড়া গলায় বলল গোলুব, ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়েরা! সারা রাত নাচ চলবে, আমি স্বয়ং প্রথম ‘ওয়াল্‌স’ নাচটা নাচব।’

ঐকতান-বাদন আবার শুরু হল, কিন্তু দেখা গেল সে রাত্রের মতো আর ফুর্তিটা জমবার নয়।

পাদ্রীকন্যাকে নিয়ে নাচার সময়ে কর্নেলের এক পাক ঘোরা হতে না হতেই সান্ত্রীরা চেঁচামেচি করতে করতে হল-ঘরে ঢুকল, ‘পাব্‌লিউক থিয়েটারটা ঘিরে ফেলছে!’

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার দিকের একটা জানলার কাচ ভেঙে পড়ল, আর তার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা মেশিনগানের ভোঁতা-নাক নল। নির্বোধ একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো নলটা এদিক থেকে ওদিক ঘুরে গেল যেন ভেতরের এই লোকজনদের তাক্‌ করার উদ্দেশ্যে, আর মানুষগুলো তার থেকে হলের মাঝখানের দিকে পাগলের মতো ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল, যেন সাক্ষাৎ শয়তানকে সামনে দেখছে তারা।

পালিয়ানিৎসা মাথার ওপরে ঝুলন্ত হাজার-পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌টার দিকে গুলি ছুঁড়ল। বোমার মতো ফেটে গেল সেটা, কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল হলের সবার গায়ে।

অন্ধকার হয়ে গেল হল-ঘর। কে চত্বর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাইরে বেরিয়ে পড়ো সবাই!’ তারপর প্রচণ্ড তোড়ে গালাগালি চলল।

মেয়েদের উম্মত্ত আর্তনাদ, হকচকিয়ে যাওয়া অফিসারদের জড়ো করার চেষ্টায় গোলুবের ছুটোছুটি আর হুকুম-হুঙ্কার, বাইরে আঙিনায় গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি আর চিৎকার — এই সবকিছু মিলেমিশে গিয়ে একটা অবর্ণনীয় নরক-কুণ্ডের সৃষ্টি হল। আর্ত অবস্থার মধ্যে কেউ লক্ষ করে নি — পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ে একটা নির্জন পাশের রাস্তায় বেরিয়ে এসে পালিয়ানিৎসা প্রাণপণে দৌড়ে চলে গেল গোলুবের সদর ঘাঁটিতে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে একটা রীতিমত যুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলল শহরটাকে। রাইফেলের নিরবচ্ছিন্ন গুলি ছোঁড়ার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ ভেঙেচুরে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। নিতান্তই বিমূঢ় অবস্থায় শহরবাসীরা তাদের আরামের বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত গুলি-চালাচালি বন্ধ হল। শুধু শহরের প্রান্তে কোন এক জায়গায়

একটা মাত্র মেশিনগান মাঝে মাঝে হঠাৎ গুলি চালাবার আওয়াজ করে উঠতে লাগল কুকুরের ঘেউঘেউ আওয়াজের মতো।

দিগন্তে ভোরের আলোর আভা ফুটতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে এল...

* * *

শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামার একটা প্রস্তুতি চলেছে — এরকম একটা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত খবরটা পেঁৗছে গেল ইহুদী-পাড়ায় — নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে কাদায় নোংরা খাড়ির গায়ে গায়ে কোনরকমে জড়াজড়ি করে খাড়া হয়ে আছে তাদের নিচু চালা আর ছোট ছোট জানলাওয়ালা ঘরগুলো। বাড়ির নামে এই সব খোঁদলগুলোর মধ্যে কল্পনাতীত অবস্থার মধ্যে বাস করে গরিব ইহুদীরা।

সের্গেই ব্রুঝাক আজ বছরখানেকের বেশি হল যে ছাপাখানাটায় কাজ করছে, সেখানকার কম্পোজিটররা আর অন্যান্য কর্মীরা সবাই ইহুদী। সের্গেই আর তাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওদের মালিক ব্লুমস্টাইনের নিখুঁত পোশাক-আশাক, সে ভালো খায়-দায়। তার বিরুদ্ধে এরা সবাই একটা ঘনিষ্ঠ পরিবারের লোকজনের মতোই ঐক্যবদ্ধ। মালিক আর কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামটা ছিল নিরবচ্ছিন্ন। ব্লুমস্টাইনের প্রাণপণ চেষ্টা যাতে সে তার কর্মীদের সবচেয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিয়ে সবচেয়ে কম মাইনে দিতে পারে। কয়েকবার কর্মীরা ধর্মঘট করেছে, ছাপাখানার কাজ এক-নাগাড়ে দু'-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে। কর্মীরা সবসুদ্ধ চোদ্দ জন। সবচেয়ে অল্পবয়সী সের্গেই — তাকে দৈনিক বারো ঘণ্টা একটা হাতে-চালানো ছাপাযন্ত্রের চাকা ঘোরাতে হয়।

সের্গেই আজ ছাপাখানার শ্রমিকদের মধ্যে একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করছে। গত কয়েক মাস ধরে দিনকাল বড়ো খারাপ গিয়েছে, মাঝে মাঝে প্রধান আতামানের হুকুমনামা ছাপা ছাড়া আর কোন কাজ করার বিশেষ কিছু ছিল না।

মেন্ডেল নামে ক্ষয়কাশের রুগী একজন কম্পোজিটর সের্গেইকে এক কোণে ডাকল। বিষণ্ন চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ইহুদীনিধন আসছে, জানো তো?'

অবাক হয়ে তাকাল সের্গেই, 'কই না, আমি তো কিছুই জানি না!'

মেন্ডেল তার গিঁঠে-পড়া হলদে হাতখানা রাখল সের্গেইয়ের কাঁধে। বাবা যেমন ছেলেকে কোন গোপনীয় কথা বলে সেইভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, হবে। আমরা খাঁটি খবর

পেয়েছি। ইহুদীদের সব ধরে ধরে মার লাগাবে। এখন আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম — তুমি তোমার সহকর্মীদের এই বিপদে সাহায্য করবে কিনা ?'

'নিশ্চয়, পারলে করব বৈকি। কী করতে পারি বলো, মেণ্ডেল ?'

কম্পোজিটররা সবাই এতক্ষণে তাদের কথাবার্তা শুনছে।

'তুমি ভাল ছেলে, সেরিওঝা। তোমাকে বিশ্বাস করি আমরা। তোমার বাবাও তো আমাদের মতোই মজুর। আচ্ছা, তাহলে তুমি একবার ছুটে বাড়ি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমাদের জনকতক বুড়োবুড়ি আর মেয়েদের তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে দিতে রাজী আছে কিনা। ইতিমধ্যে আমরা ঠিক করব কে কে যাবে ওখানে। তাছাড়া তোমার আত্মীয়-স্বজনরা হয়ত জানে আর কেউ এরকম করতে রাজী কিনা সেটাও জিজ্ঞেস করে এসো। রুশীরা এই সব ডাকাতদের হাত থেকে আপাতত নিরাপদ। ছুটে যাও, সেরিওঝা, সময় খুব কম।'

'আমার উপর নির্ভর করতে পারো, মেণ্ডেল। আমি পাভকা আর ক্লিমকার সঙ্গেও এখুনি দেখা করছি — ওদের পরিবারও নিশ্চয়ই কয়েকজনকে রাখতে পারবে।'

'শোন, এক মিনিট,' সের্গেই বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় উদ্বিগ্নভাবে তাকে থামাল মেণ্ডেল, 'পাভকা আর ক্লিমকা কারা ? ভালরকম চেনো তো ওদের ?'

নিশ্চিন্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল সের্গেই, 'নিশ্চয় ! ওরা আমার বন্ধু। পাভকা করচাগিনের ভাই একজন মিস্ত্রি।'

'ও, করচাগিন,' নিশ্চিন্ত হল মেণ্ডেল, 'আমি চিনি তাকে —একই বাড়িতে ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, করচাগিনদের ওখানে খোঁজ নিতে পারো। যাও, সেরিওঝা, আর যতো তাড়াতাড়ি পারো খবর নিয়ে এসো।'

সের্গেই ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

* * *

পাভ্লিউকের ফৌজ আর গোলুবের লোকজনদের মধ্যে সেই প্রচণ্ড লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় দিনে দাঙ্গা শুরু হল।

শহর থেকে মার খেয়ে বিতাড়িত হবার পর পাভ্লিউক এই অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কাছাকাছি একটা ছোট শহর দখল করে নিয়েছে। শেপেতোভ্কায় সেই রাতের ঘটনায় তার বিশজন লোক মারা গেছে। গোলুবের দলেরও সমান ক্ষতি হয়েছে।

নিহতদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে গাড়ি করে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে সেই দিনই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। সৎকারের অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ কিছু করা হয়

নি — কারণ, গোটা ঘটনাটার মধ্যে সত্যিই জাঁক করার কিছু ছিল না। রাস্তার দুটো খেঁকি কুকুরের মতো দু'জন আতামান পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরেছিল — এর পরে মৃতদের সৎকারের ব্যাপারে বেশি সোরগোল তোলাটা খারাপ দেখায়। পালিয়ানিৎসা অবশ্য চেয়েছিল নিহতদের বেশ একটু ঘটা করে কবর দিয়ে পাভ্‌লিউককে লাল-ডাকাত বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু পাদ্রী ভার্সিলির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কমিটি আপত্তি তুলল।

গোলুবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই রাত্রের ঘটনাটা বেশ একটু অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে — বিশেষ করে যারা তার দেহরক্ষী তাদের মধ্যে, কারণ, তাদের লোকজনই মারা গেছে সবচেয়ে বেশি। অসন্তোষটা দূর করার জন্য আর খানিকটা উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনার জন্য পালিয়ানিৎসা এই দাঙ্গার প্রস্তাবটা দিয়েছে। অত্যন্ত হৃদয়হীনের মতোই সে ফৌজী লোকদের জীবনে 'সামান্য বৈচিত্র্য' আনার কথাটা পেড়েছিল গোলুবের কাছে। তার যুক্তিটা ছিল — সৈন্যদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা নিতান্তই দরকার। কর্নেলের অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল না — কারণ, শুঁড়ীর ওই মেয়েটির সঙ্গে তার দু-চারদিনের মধ্যেই বিয়ে হবে, তার আগে শহরের শান্তি ভঙ্গ হতে দিতে সে চায় নি — কিন্তু পালিয়ানিৎসার হুমকিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল তাকে।

আরও একটা কারণে পান্ কর্নেল এই ব্যাপারটা ঘটতে দিতে সত্যিই গররাজী ছিল: সম্প্রতি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে। তার শত্রুরা ফের তার নামে যা-তা কথা বলতে পারে, বলতে পারে কর্নেল গোলুব দাঙ্গাবাজ এবং প্রধান আতামানের কাছে তারা নানা কথা গিয়ে লাগাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোলুব অবশ্য এপর্যন্ত প্রধান আতামানের ওপর তেমন নির্ভরশীল নয় — কারণ, সে নিজের ফৌজের রসদ আর লোকজন নিজেই জোগাড় করে এসেছে। তাছাড়া প্রধান আতামান খুব ভাল করেই জানে অধীনস্থ লোকজন কী চিজ। সে নিজেই তো বহুবার শাসন-পরিচালনার প্রয়োজনে তথাকথিত 'হুকুম-দখল' থেকে টাকার দাবি তুলেছে। আর, দাঙ্গাবাজ হিসেবে খ্যাতির দিক থেকে গোলুবের ভূতপূর্ব কীর্তিকলাপ বড়ো কম নয়। সুতরাং, ওরকম আরেকটা ঘটনায় আর তার এমন কী এসে যাবে।

ভোর-সকালে লুঠপাট হাঙ্গামা আরম্ভ হল।

দিন শুরু হবার আগে ধূসর কুয়াশায় তখনও শহরটা আচ্ছন্ন। ভিজে ন্যাকড়ার ফালির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় এদিকে-সেদিকে এলোমেলোভাবে জড়ানো ইহুদীদের বাড়িগুলো। সে-রাস্তাগুলো জনশূন্য, নিষ্প্রাণ। আঁটসাঁট পর্দা-টানা খড়খড়ি-তোলা জানলাগুলো।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুঝি গোটা পাড়াটা শেষরাত্রির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু, কোন বাড়ির ভেতরে কারুর চোখে ঘুম নেই। গোটা একেকটা পরিবার জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে একেকটা ঘরে জড়োসড়ো হয়ে আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষা করে আছে। শুধু ঘটনাটা বোঝার পক্ষে যাদের বয়েস নিতান্ত কম, সেই শিশুরা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে তাদের মায়েদের কোলে।

গোলুবের প্রধান দেহরক্ষী সালোমিগা — রোদে-পোড়া গায়ের রঙ তার জিপ্‌সিদের মতো কালচিটে পড়া, গালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা তলোয়ারের ক্ষতচিহ্নের নীলচে দাগ — গোলুবের অ্যাড্‌জুট্যাণ্ট পালিয়ানিৎসাকে ঘুম থেকে তুলবার জন্য সেদিন সকালে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

বড়ো কষ্টে চোখ মেলে তাকাল পালিয়ানিৎসা — সারারাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে, কিছুতেই আর নিজেকে সেই ঘোর থেকে মুক্ত করে আনতে পারছে না — সেই ভেংচিকাটা কুঁজো-পিঠ বীভৎস চেহারার শয়তানটা তখনও যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে। শেষ পর্যন্ত সে যন্ত্রনায় ছিঁড়ে-পড়া মাথা তুলে দেখল সালোমিগা জাগাচ্ছে তাকে। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সালোমিগা বলল, 'উঠে পড় হে, মাল। কাজে রওনা হতে হবে, সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেশ টেনেছ দেখছি।'

এতক্ষণে পুরোপুরি জেগে উঠেছে পালিয়ানিৎসা, এক-গলা তেতো জল-ঢেঁকুর উঠে এসেছে, মুখ বেঁকিয়ে সেটাকে থুতুর মতো বের করে দিয়ে সালোমিগার দিকে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ ?'

'ইহুদী হতভাগাদের গুঁড়োবার কাজ, আবার কী কাজ ! ভুলে গেছ, নাকি ?'

এতক্ষণে সবটা মনে পড়ল পালিয়ানিৎসার। সত্যি একেবারে ভুলে বসে ছিল সে। পান্ কর্নেল যে খামারবাড়িটায় তার ভাবী বধূ আর একগাদা বোতলের ইয়ার সঙ্গে নিয়ে আছে, সেখানে আগের সন্ধ্যায় পান বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল।

দাঙ্গা চলতে থাকার সময়টুকুর জন্য শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসাটাই গোলুবের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হত। কারণ, সেক্ষেত্রে পরে সে ব্যাপারটাকে তার অনুপস্থিতির জন্য একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল বলে চালাতে পারবে এবং ইতিমধ্যে পালিয়ানিৎসাও বেশ নিখুঁতভাবে কাজটা নিষ্পন্ন করতে পারবে। হ্যাঁ, বৈচিত্র্যসৃষ্টির ব্যাপারে পালিয়ানিৎসা সত্যিই ওস্তাদ লোক !

মাথায় এক বালতি জল ঢেলে বুদ্ধিটাকে গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ানিৎসা অল্পক্ষণের মধ্যেই সদর ঘাঁটির চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে হুকুম দিতে থাকল।

একশো জন দেহরক্ষী ইতিমধ্যেই ঘোড়ায় চেপে বসেছে। গোলযোগের সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্য দূরদর্শী পালিয়ানিৎসা শহরকেন্দ্র এবং মজুরদের এলাকা আর স্টেশনের

মাঝে মাঝে পাহারা বসাবার হুকুম দিল। কোনরকম বাধা সৃষ্টি করার চিন্তাটা যদি মজুরদের মাথায় ঢোকে, তাহলে এক-ঝাঁক গুলির মুখোমুখি হতে হবে তাদের — তারই ব্যবস্থা হিসেবে লেশ্চিনস্কিদের বাগানে রাস্তার দিকে মুখ করে একটা মেশিনগান বসানো হল।

পুরো বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর, অ্যাড্‌জুট্যান্ট আর সালোমিগা লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে।

যখন তারা রওনা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ বলে উঠল পালিয়ানিৎসা, 'থাম! প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। দুটো গাড়ি সঙ্গে নাও গোলুবের বিয়ের যৌতুক বয়ে আনবার জন্যে। হাঃ হাঃ! লুটের প্রথম কিস্তিটা যথারীতি সেনাপতির প্রাপ্য, আর প্রথম মেয়েটা প্রাপ্য তাঁর অ্যাড্‌জুট্যান্টের — অর্থাৎ আমার। বুঝেছ হে, আহাম্মক?' — এই শেষের সম্বোধনটা সালোমিগার উদ্দেশে।

সালোমিগা তার হলদে চোখের তীব্র দৃষ্টিতে পালিয়ানিৎসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবার জন্যেই যথেষ্ট পাওয়া যাবে!'

বড়ো রাস্তা বেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল সবাই, এলোমেলো এই ঘোড়সওয়ারদলটির আগে আগে চলেছে পালিয়ানিৎসা আর সালোমিগা।

দোতলা একটা বাড়ির সামনে এসে রাশ টানল পালিয়ানিৎসা। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গেছে। বাড়িটার সামনে একটা মর্চে-ধরা তক্তির গায়ে লেখা আছে — 'ফুক্‌স্‌, মনিহারি দ্রব্য ব্যবসায়ী'।

ধূসর রঙের তার মাদী ঘোড়াটা পথের খোয়ার ওপরে অস্বস্তির সঙ্গে রোগা পা ঠুকল।

মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ানিৎসা বলল, 'তাহলে এখান থেকেই শুরু করা যাক, ভগবান সহায় হোন! তোমরা সব নেমে পড়,' নিজের চারপাশে জড়ো লোকজনদের দিকে ঘুরে বলল সে, 'এইবার খেল্‌ শুরু। আচ্ছা শোন, খুনিটুনি গুঁড়ো করে বোসো না যেন — ওসব করবার সুযোগ পরে ঢের পাবে। আর, মেয়েদের সম্বন্ধে বলি — শিকার যদি তেমন একটা জুতসই না হয় তো সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেদের একটু সামলে রেখো।'

দলের একজন তার শক্ত দাঁত বের করে আপত্তি জানাল, 'কিন্তু পান্‌ খোরুঞ্জি, যদি উভয় পক্ষের মত নিয়েই হয়, তাহলে?'

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই। যে লোকটা কথাটা বলেছিল, তার দিকে প্রশংসাসূচক প্রশ্রয়ের চোখে তাকাল পালিয়ানিৎসা, 'সেটা হলে অবশ্য আলাদা কথা — যদি ওরা গররাজী না হয়, তাহলে চালিয়ে যাবে — তাতে কোন বাধা নেই।'

দোকানঘরটার বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জোরে একটা লাথি মারল পালিয়ানিৎসা, কিন্তু ওক কাঠের ভারি আর মজবুত পাল্লাদুটো একটু কাঁপল না পর্যন্ত।

স্পষ্টই বোঝা গেল, কাজটা ভুল জায়গা থেকে শুরু করা হয়েছে। তলোয়ারটা হাতে চেপে ধরে বাড়িটার পাশ ঘুরে পালিয়ানিৎসা এগিয়ে গেল ফুক্‌স্‌ যেদিকে থাকে সেই দিকটায়। পেছন পেছন চলল সালোমিগা।

বাড়ির লোকেরা ভেতর থেকেই শুনেছে সদর রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। দোকানের সামনেই যখন আওয়াজটা এসে থামল আর দেওয়ালের আড়াল পেরিয়ে শোনা গেল মানুষগুলোর গলার স্বর, তখন তাদের হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গিয়ে গোটা শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এই ফুক্‌স্‌ লোকটা পয়সাওয়ালা, আগের দিন সে তার বউ আর মেয়েদের নিয়ে শহর ছেড়ে গেছে। জিনিসপত্তরগুলো পাহারা দেবার জন্য রেখে গেছে তার চাকরানী রিভাকে — ঊনিশ বছর বয়েসী শান্ত আর নিরীহ মেয়েটা। খালি বাড়িটায় একলা থাকতে রিভা ভয় পাচ্ছে দেখে সে বলেছিল যে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত রিভা যেন তার বুড়ো বাবা আর মাকে নিয়ে এসে এই বাড়িতে থাকে।

রিভা খুব নরমভাবে একথার প্রতিবাদ করাতে ধূর্ত ব্যবসাদারটি তাকে ভরসা দিয়েছিল যে খুব সম্ভবত দাঙ্গা হবেই না — কারণ, তাদের মতো গরিব ভিখিরিদের কাছ থেকে আর কী পাবার আশা ওরা করে ? তারপরে সে রিভাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ফিরে এসে তাকে পোশাক বানাবার জন্য ভাল খানিকটা কাপড়ের ছিট দেবে।

তিনজনে তারা ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল আতঙ্কে, নিরাশার মধ্যেও তারা আশা করছে যদি লোকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যায়। হয়তো তাদের ভুল হয়েছে, হয়তো তারা ভুল করে ভেবেছে যে তাদের বাড়ির সামনেই ওদের ঘোড়া থেমেছে। কিন্তু দোকানঘরের দরজায় একটা চাপা আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে ওদের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ পেইসাখ্‌ — সমস্ত চুল তার সাদা, নীল চোখদুটো তার ভয়-পাওয়া শিশুর চোখের মতো বিস্ফারিত। উৎকট ধর্মোমত্তের সমস্ত বিশ্বাসের জোর নিয়ে সে সর্বশক্তিমান জিহোভার উদ্দেশে ফিসফিসিয়ে প্রার্থনা করছে যাতে ভগবান এই বাড়িটাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা স্ত্রী তার প্রার্থনার উচ্চারণের মধ্যে প্রথমটায় শুনতেই পায় নি মানুষগুলোর পায়ের শব্দ।

সবচেয়ে দূরের ঘরটায় পালিয়ে গিয়ে রিভা লুকিয়ে আছে ওক-কাঠের বিরাট আলমারিটার পেছনে।

দরজাটার ওপরে একটা প্রচণ্ড ঘা পড়তেই এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চমকে কেঁপে উঠল।

'দরজা খোল!' আগের চেয়ে প্রচণ্ড আরেকটা ধাক্কা আর ক্রুদ্ধ গালাগালি।

কিন্তু আতঙ্কে আড়ষ্ট এই দুটি প্রাণী দরজাটা খোলার জন্য হাত তুলতে পারল না।

আগলটা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত বাইরে দরজার গায়ে বন্দুকের কুঁদোর ধাক্কা এসে পড়তে লাগল অনবরত আর শেষ পর্যন্ত খুলে গেল দরজাটা।

সশস্ত্র লোকে ভর্তি হয়ে গেল বাড়িটা, সর্বত্র চলল খানাতল্লাশি। ভেতর দিয়ে দোকানঘরে ঢোকার দরজাটা ভেঙে গেল বন্দুকের কুঁদোর এক ধাক্কায়, সামনের দিকের দরজাটার আগল এদিক থেকেই খুলে ফেলা হল।

লুটপাট শুরু হল।

কাপড়ের গাঁট, জুতো আর অন্যান্য জিনিসে গাড়িগুলো বোঝাই করার পর সেই লুটের মাল গোলুবের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল সালোমিগা। ফিরে এসে সে একটা আর্ত চিৎকার শুনল বাড়ির ভেতরে।

পালিয়ানিৎসা তার লোকজনের ওপর দোকানটা লুট করার ভার ছেড়ে দিয়ে মালিকের ঘরে গিয়ে দেখল সেখানে বুড়োবুড়ি আর তাদের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনবিড়ালের মতো তার সবুজ চোখে ওদের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুড়োবুড়ির দিকে হুংকার ছাড়ল, 'বেরোও এখান থেকে!'

বাপ-মায়ের একজনও নড়ে নি।

পালিয়ানিৎসা এক পা এগিয়ে একটু করে তার তলোয়ারটা খুলল খাপ থেকে।

'মা গো!' একটা হৃদয়বিদারী চিৎকার করে উঠেছিল মেয়েটা।

এই চিৎকারটাই শুনতে পেয়েছিল সালোমিগা।

চিৎকার শুনে পালিয়ানিৎসার যেসব লোক ছুটে এসেছিল ঘরে, তাদের দিকে ফিরে বুড়োবুড়িকে দেখিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'বের করে দাও এদের!' হুকুম তামিল হতেই সালোমিগা ঘরে ফিরে এলে তাকে বলল, 'তুমি এই দরজাটায় পাহারা থাকো, আমি এই ছুঁড়িটার সঙ্গে একটু কথাটথা বলে নিই ততক্ষণ।'

আর একবার চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ছুটে এল বুড়ো পেইসাখ্ ঘরে ঢোকার দরজাটার দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে সে উল্টে গড়িয়ে গেল দেয়ালের গায়ে, যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। বুড়ি মা তোইবা — আজীবন যে অতি শান্ত আর নিরীহ — সে সালোমিগার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তানকে রক্ষা করার সময়ে বাঘিনীর মতো হিংস্রতা নিয়ে।

'ছেড়ে দাও, কী করছ তোমরা ?'

দরজাটার দিকে এগুবার চেষ্টা করতে লাগল তোইবা, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সালোমিগা তার কোটের ওপর তোইবার জীর্ণ আঙুলের শক্ত মুঠি ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

ইতিমধ্যে আঘাত আর যন্ত্রণা থেকে খানিকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পেইসাখ্ — সে এগিয়ে গেল তোইবাকে সাহায্য করার জন্য।

'যেতে দাও আমাদের ! ছেড়ে দাও আমাদের মেয়েকে !'

দুই বুড়োবুড়ি মিলে কোনরকমে দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল সালোমিগাকে। ফলে ভয়ানক রেগে গিয়ে সে কোমরবন্ধনী থেকে একটানে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বৃদ্ধের সাদা-চুল মাথাটার ওপর জোরে এক ঘা বসাল ইস্পাতের কুঁদোটা দিয়ে। মেঝের ওপর নেতিয়ে পড়ল পেইসাখ্।

ঘরের ভেতরে সমানে আর্ত চিৎকার করে চলেছে রিভা।

তোইবাকে যখন টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে দিল ওরা, তখন সে বেদনায় উন্মাদ হয়ে গেছে। তার নিদারুণ চিৎকারে আর সাহায্যের আবেদনে মুখরিত হয়ে উঠল রাস্তাটা।

বাড়ির ভেতরটা তখন নিস্তব্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পালিয়ানিৎসা। দরজার হাতলের ওপর ইতিমধ্যেই সালোমিগার হাতটা এগিয়ে এসেছে, তার দিকে না তাকিয়েই পালিয়ানিৎসা বলল, 'ভেতরে ঢুকে আর লাভ নেই। বালিশ চাপা দিয়ে ওর চিৎকার বন্ধ করতে গিয়ে দম আটকে মারা গেছে।' পেইসাখের দেহটা ডিঙিয়ে চলে যাবার সময় তার পা পড়ল জমাট একতাল রক্তের ওপর।

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে সে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'আরম্ভটা খুব সুবিধের হল না হে !'

বাড়িটার সিঁড়ির ওপরে আর মেঝের বুকে রক্তাক্ত পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে আর সবাই তার পেছনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

শহরে পুরোদমে চলেছে লুঠতরাজ। লুঠের বখরা নিয়ে মাঝে মাঝে লুটেরাদের মধ্যে ঝগড়া বাধতে লাগল আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারামারি হয়ে গেল তাদের মধ্যে, তলোয়ার ঝলসে উঠতে লাগল এখানে-ওখানে। আর, প্রায় সর্বত্রই চলল অবাধ ঘুষোঘুষি।

বিয়ারের দোকানটা থেকে পঁচিশ-গ্যালন পিপেগুলো গড়িয়ে নামিয়ে আনা হল পাশের গলিতে।

তারপর ইহুদীদের বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল ঠেঙাড়ের দল।

কোনরকম বাধা পেল না তারা। ঘরে ঘরে ঢুকে অল্পক্ষণের মধ্যে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে লুটের মাল বোঝাই করে নিয়ে ফিরে গেল, পেছনে ফেলে গেল কাপড়ের স্তূপ, ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা আর বালিশের ছড়িয়ে-পড়া পালক। প্রথম দিনে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই — রিভা আর তার বাবা। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হবে রাত্রি আসন্ন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যের দিকে পৈশাচিক চণ্ডালদের এই দলটা মাতাল হয়ে উঠল। রাত্রির অপেক্ষায় আছে উন্মত্ত পের্তলিউরা-বাহিনী।

অন্ধকার তাদের মুক্তি দিল সংযমের শেষ বাঁধন থেকে। রাত্রির আঁধারে মানুষকে হত্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এমন কি শেয়ালেও অপেক্ষা করে থাকে অন্ধকারের অশুভ সন্ধিক্ষণের জন্য।

ভয়ংকর এই তিনটি দিন আর দু'টি রাত্রির কথা খুব কম লোকেই ভুলতে পারবে। সেই রক্তাক্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো জীবনকে যে এরা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল, কতগুলো প্রাণকে গলা টিপে মারল, কী নিদারুণ আতঙ্কে কতগুলো তরুণের মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেল রাতারাতি, আর কী মর্মান্তিক কান্নার স্রোত বয়ে গেল তার কোন হিসেব নেই। বুক-ভরা শূন্যতা নিয়ে, লজ্জা আর অপমানের অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে যারা চিরতরে চলে-যাওয়া প্রিয়জনের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে বেঁচে রইল, তারা নিহতদের চেয়ে ভাগ্যবান কিনা, সেটা বলা কঠিন। আর, সরু সরু গলিঘুঁজির মধ্যে পড়ে রইল তরুণী মেয়েদের যন্ত্রণাবিদ্ধ বেঁকে-যাওয়া দেহগুলি — অসহ্য যন্ত্রণার ভঙ্গিতে তাদের বাহু পেছনের দিকে উৎক্ষিপ্ত।

শুধু নদীর ধারে যেখানে কামার নাউম-এর বাড়ি, সেইখানে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধের ধাক্কা খেল ডালকুত্তারা, যারা তার তরুণী স্ত্রী সারার দিকে এগিয়েছিল। চব্বিশ বছরের পূর্ণ-যৌবন এই কামারটির বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ আর ইস্পাতের মতো পেশী, বিরাট হাতুড়িটা ঠুকে ঠুকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। সে তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে দিল না ওদের হাতে।

ছোট্ট তার কুটিরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড একটা সংঘাতের মধ্যে দু'জন পের্তলিউরা-ডাকাতের মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেল পচা কুমড়োর খোলের মতো। নাউম মরীয়া মানুষের চরম হিংস্রতা নিয়ে তাদের দু'জনের জীবনের জন্য প্রচণ্ড লড়াই চালাল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার কর্কশ খটাখট আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল নদীর ধারে, যেখানে বিপদ বুঝে ছুটে গেছে বোম্বেটের দল। যখন আর মাত্র এক রাউণ্ড গুলি বাকি রইল, তখন নাউম তার স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে বেয়নেট

হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি বেরিয়ে এল। এক ঝাঁক গুলি এসে বিঁধল তার সর্বাঙ্গে আর বাড়ির সামনের দরজায় তার জোয়ান দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়িয়ে গেল।

কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে অবস্থাপন্ন চাষীরা তাদের গাড়িটানা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে এল, খুশিমতো জিনিসপত্রে বোঝাই করে নিল গাড়িগুলো। তারপরে গোলুবের বাহিনীতে তাদের যেসব ছেলেরা কিংবা আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল, যাতে আরও দু'-একবার শহরে এসে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে।

সেরিওঝা ব্রুঝাক আর তার বাবা ছাপাখানার সহযোগী কর্মীদের অর্ধেক লোকজনকে লুকিয়ে রেখেছিল তাদের বাড়ির চিলেকোঠায় আর মাটির নিচে ভাঁড়ার-ঘরে। বাড়ি যাবার পথে সবজি খেতটা পার হবার সময় সে দেখতে পেল — রাস্তা বেয়ে একটা লোক ভীষণভাবে দুই হাত দোলাতে দোলাতে ছুটে আসছে, তার পরনে একটা লম্বা তালিমারা কোট।

লোকটা একজন বুড়ো ইহুদী। খালি মাথা, প্রাণপণে হাঁফাচ্ছে; মৃত্যুর আতঙ্কে আড়ষ্ট এই মানুষটার পেছনে পেছনে একটা ধূসর রঙের ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে একজন পেৎলিউরা-র লোক। এদের দু'জনের মধ্যে দূরত্বটা দ্রুত কমে আসছে। ঘোড়সওয়ারটা তার জিনের ওপর থেকে নুয়ে পড়ল বৃদ্ধ ইহুদীকে কেটে ফেলবার জন্য। পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে বুড়ো মানুষটা দুই হাত তুলল, যেন সে আঘাতটাকে রুখতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সেরিওঝা রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে দাঁড়াল ঘোড়ার সামনে বৃদ্ধকে রক্ষা করবার জন্য, 'ছেড়ে দাও ওকে, ডাকাত কুত্তা কোথাকার!'

নেমে-আসা তলোয়ারের গতিটাকে থামাবার কোন চেষ্টা না করে ঘোড়সওয়ারটি তার ফলাটা ভোঁতাভাবে সরাসরি নামিয়ে আনল শণ রঙের চুলওয়ালা কচি মাথাটার ওপর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান আতামান পেৎলিউরার সৈন্যদলের ওপরে লাল সৈন্যদলের চাপ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গোলুবের বাহিনীর তলব পড়ল সীমান্তে। শহরে শুধু রেখে যাওয়া হল পেছনের সারির একটা ছোট সৈন্যদল আর শহরের সামরিক শাসনকর্তৃপক্ষের লোকদের।

শহরবাসীরা একটু নড়াচড়া করার সুযোগ পেল। ইহুদী অধিবাসীরা এই সাময়িক

বিরতির সুযোগটুকুতে মৃতদের কবর দিতে লাগল, ইহুদীপাড়ার ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরগুলোয় জীবন আবার ফিরে এল।

শুধু মাঝে মাঝে শান্ত সন্ধ্যায় দূর থেকে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ ভেসে আসে। খুব বেশি দূরে নয় কোথাও লড়াই চলেছে।

স্টেশনের রেলকর্মীরা গ্রামের দিকে ঘুরতে লেগেছে কাজের সন্ধানে।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে।

সামরিক আইন জারি হয়েছে গোটা শহরে।

* * *

নিবিড় অন্ধকার আর কুৎসিত এই রাত্রিটা — এমন একটা রাত্রি যে যতোই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো যাক না কেন, অন্ধকার ভেদ করা যাবে না কিছুতেই, আর অন্ধচোখে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হবে মানুষকে — যেকোন মুহূর্তে খানায়-গর্তে মুখ থুবড়ে ঘাড় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা।

নাগরিকেরা জানে যে এহেন সময়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকাই ভাল। তারা আলোও জ্বালবে না, কারণ, অবাঞ্ছনীয় অতিথিরা আলো দেখে আকৃষ্ট হতে পারে। অন্ধকারই ভাল আর ঢের নিরাপদ। এমন কেউ কেউ অবশ্য আছে যারা সর্বদাই অস্থির — তারা যদি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায় তো যাক, নাগরিকদের তাতে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। সে নিজে কিন্তু যাবে না। নিশ্চিত থাকতে পারেন, যাবে না।

এই রকম একটা রাত্রি, কিন্তু তবু এহেন রাত্রিতেও একজন লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে।

করচাগিনদের বাড়ির সামনে এসে সে সাবধানে টোকা মারল জানলাটার ওপর। কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার আরও জোরে আর আরও ঘনঘন টোকা দিতে থাকল।

পাভেল স্বপ্ন দেখছিল — একটা অমানুষিক চেহারার অদ্ভুত প্রাণী তার দিকে একটা মেশিনগান বাগিয়ে আছে আর সে পালিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই, এমন সময়ে মেশিনগানটা ভয়ানক রকম খটাখট শব্দে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

ঘুমে ভেঙে যেতেই শুনতে পেল জানলায় খটাখট আওয়াজ। কে যেন টোকা দিচ্ছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে এল — লোকটা কে দেখবার জন্য, কিন্তু দেখতে পেল শুধু একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

বাড়িতে পাভেল একা। মা গেছে পাভেলের বড়ো বোনকে দেখতে। তার স্বামী চিনিকলের একজন মিস্ত্রি। আর আরতিওম তো কাছাকাছি একটা গাঁয়ে কামারের কাজ করছে, হাতুড়ি পিটে চালিয়ে নিচ্ছে নিজেরটা।

তবু, লোকটা তো একমাত্র আরতিওমই হতে পারে।

পাভেল জানলাটা খুলবে ঠিক করল। অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলল, 'কে ?'

জানলার বাইরের মূর্তিটা একটু নড়াচড়া করে চাপা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ঝুখ্‌রাই।'

জানলার তাকের ওপর হাতদুটো রেখে ঝুখ্‌রাই মাথাটা তুলে ধরল পাভেলের মুখোমুখি সমান উচ্চতায়। ফিসফিসিয়ে বলল, 'রাতটা তোমার এখানে কাটাব বলে এলাম। কোন আপত্তি আছে, ভাই ?'

'নিশ্চয় না,' সাগ্রহে বলল পাভেল 'কাটাবে বইকি। জানলা দিয়ে গলে ভেতরে এসো।'

জানলাটার ফাঁকে কোন গতিকে তার বিরাট দেহটাকে টেনে ভেতরে আনল ফিওদর।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সে কিন্তু তখনই সরে এল না।

কান খাড়া করে সে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা সরে গিয়ে যখন রাস্তাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে খুব ভাল করে দেখে নিল রাস্তাটা। তারপরে পাভেলের দিকে ফিরল সে, 'তোমার মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেবো না তো, কি বলো ?'

পাভেল জানাল যে বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। নাবিকটি আরও আশ্বস্ত হল কথাটা শুনে। সে আরেকটু জোর গলায় কথা বলতে লাগল, 'খুনী-ডাকাতগুলো ইদানীং আমার পেছনে বেশ তোড়জোড় করেই লেগেছে, ভাই। স্টেশনে যা হয়ে গেছে, তার জন্যেই আমার খোঁজে ঘুরছে ওরা। আমাদের লোকজন যদি আরেকটু একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারত, তাহলে আমরা ওই দাঙ্গার সময় সেই কুত্তাদের উপর বেশ এক হাত নিতে পারতাম। কিন্তু দেখছই তো, এখনও আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় না লোকে। আর সেইজন্যেই তো কিছু হল না। এদিকে ওরা আমার খোঁজে ফিরছে, দু'-দু'বার জাল ফেলেছে — আজ তো এক চুলের জন্যে পার পেয়ে গেছি। বাড়ি ফিরছিলাম, বুঝলে, পেছনের রাস্তা দিয়ে অবশ্য। একবার চারদিকে দেখে নেবার জন্যে চালাটার কাছে যেই থেমেছি দেখি একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে একটা বেয়নেটের ডগা বেরিয়ে

রয়েছে। তক্ষুনি তো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এলাম তোমার এখানে। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই দিনকতকের জন্যে ঘাঁটি গাড়ব, কি বল? বেশ।'

ঝুখ্রাই কাদামাখা বুটজোড়া টেনে খুলতে লাগল।

সে আসাতে খুশি হয়েছে পাভেল। বিদ্যুৎ-স্টেশনে ইদানীং কাজ চলছে না, নির্জন বাড়িতে পাভেলের ভারি ফাঁকা ঠেকছিল।

শুয়ে পড়ল তারা। পাভেল তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঝুখ্রাই সিগারেট টানতে টানতে জেগে রইল অনেকক্ষণ। একটু পরেই উঠে পড়ল সে, খালি পায়ে নিঃশব্দে জানলাটার কাছে এসে রাস্তাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সমস্তক্ষণ তার হাতটা রইল বালিশের নিচে গোঁজা ভারি পিস্তলটার হাতলের ওপর।

* * *

সেই রাত্রে ঝুখ্রাইয়ের অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়া আর তার সঙ্গে আট দিন কাটানোর ফলে পাভেলের জীবনের সমস্ত গতিটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। অনেক কিছু নতুন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে পাভেল জানতে পারল এই নাবিকটির কাছে — সেটা নাড়া দিল তার সত্তার গভীরে। এই দিন কয়টি তরুণ স্টোকারের জীবনে চূড়ান্ত হয়ে দেখা দিল।

আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হচ্ছে ঝুখ্রাইকে। তাই সে উৎসুক পাভেলের কাছে নানান কথা বলে এই সময়টুকু কাটাচ্ছে: এই অঞ্চলটার টুঁটি টিপে রয়েছে ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা — তাদের উদ্দেশে প্রচণ্ড ক্রোধ আর জ্বলন্ত ঘৃণা ঢেলে দিয়ে নানা কথা বলে চলে সে পাভেলের কাছে।

ঝুখ্রাইয়ের ভাষাটা স্পষ্ট, ঝরঝরে আর সহজ। কোন দ্বিধা নেই তার মনে, তার সামনে পথটা পরিষ্কার এবং পাভেল ক্রমশই দেখতে পেল যে, 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি', 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট', 'পোলিশ সোশ্যালিস্ট' ইত্যাদি গালভরা নামওয়ালা বিভিন্ন রাজনীতিক দল আসলে সবাই শ্রমিকদের নিদারুণ শত্রু — একমাত্র সত্যিকারের বিপ্লবী দল, যেটা ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে একান্তভাবে লড়াই করে চলেছে, সেটা হচ্ছে বলশেভিক পার্টি।

এর আগে পর্যন্ত এসব ব্যাপারে পাভেলের ধারণাটা ছিল নিতান্তই এলোমেলো।

সমুদ্রের ঝড়ে পোড় খাওয়া এই দৃঢ় আর বলিষ্ঠ-মন বাল্টিক অঞ্চলের নাবিকটি বহুদিনের পুরনো আর বিশ্বস্ত বলশেভিক, ১৯১৫ সাল থেকে সে রুশ সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক শ্রমিক (বলশেভিক) পার্টির সভ্য। পাভেলের কাছে সে জীবনের নির্মম সত্যগুলিকে উদ্ঘাটিত করে যায় আর তরুণ এই স্টোকার মুগ্ধ হয়ে তাই শোনে।

ঝুখ্রাই বলছিল, 'অল্প বয়সে আমিও তোমার মতোই ছিলাম, ভাই। শরীর-মনের এতটা উদ্যম নিয়ে কী করব ভেবেই পেতাম না, সবসময়ে শাসন না-মানার দিকে ঝোঁকটা গিয়ে পড়ত। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলাম, মাঝে মাঝে শহরের ভদ্দরলোকদের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেদের দেখেই রাগে জ্বলে উঠতাম। প্রায়ই ওদের ধরে বেদম মার দিতাম, কিন্তু তার জন্যে আমাকে আবার বাবার কাছে পাল্টা মার খেতে হয়েছে। একা একা লড়াই করে অবস্থাটা বদলানো যায় না। মজুরদের আদর্শের জন্যে ভাল একজন লড়্নেওয়ালা হবার মতো সবকিছু গুণ তোমার মধ্যে আছে, পাভ্লুশা। শুধু তোমার বয়েসটা এখনও বড়ো কম আর শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানো না। আমি তোমাকে ঠিক রাস্তাটা বাতলে দেব, কারণ আমি জানি তুমি একজন ভাল কর্মী হয়ে উঠবে। আমি এই নিরীহ মিনমিনে গোছের ছেলেদের সহ্য করতে পারি না। গোটা দুনিয়াটায় আগুন জ্বলে উঠেছে আজ। এতদিন যারা গোলাম ছিল আজ তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, পুরনো ধরনের জীবনের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু সেটা করবার জন্যে আমাদের শক্তসমর্থ লোক চাই; লড়াই শুরু হলে যারা তেলাপোকার মতো সুড়সুড় করে গর্তে গিয়ে ঢুকবে, সে ধরনের মেয়েলি স্বভাবের ছেলেদের নিয়ে আমাদের চলবে না। নির্মম হয়ে যারা আঘাত হানতে পারবে, তেমন মানুষই আমাদের দরকার।'

টেবিলের ওপরে সশব্দে একটা ঘুষি বসাল সে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে হাতদুটো পকেটে গুঁজে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এদিক থেকে ওদিক।

এই ক'দিনের নিষ্ক্রিয়তা তাকে একটু দমিয়ে দিয়েছে। তার কমরেডরা সবাই চলে যাবার পরে সে এই শহরে থেকে গিয়েছিল বলে তার মনে দারুণ আক্ষেপ এসেছে। এখানে আর পড়ে থাকাটা নিরর্থক হবে মনে করে সে যুদ্ধসীমান্ত পার হয়ে গিয়ে লাল সৈন্যদলগুলির সঙ্গে যোগ দেবে বলে ঠিক করে ফেলেছে।

শহরে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য ন'জন পার্টি সভ্যের একটা দল থাকবে এখানে।

একটু বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবল ঝুখ্রাই, 'আমাকে ছাড়াই ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এভাবে কিছু না করে আমি তো আর বসে থাকতে পারি না। বলতে গেলে দশটা মাস নষ্ট করেছি আমি।'

পাভেল একবার জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, 'আচ্ছা, ফিওদর,তুমি ঠিক কে বল তো?'

ঝুখ্রাই দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে দিয়েছিল, সে প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারে নি, 'জানো না?'

নিচু গলায় বলেছিল পাভেল, 'আমার তো মনে হয় তুমি বলশেভিক কিংবা কমিউনিস্ট।'

হেসে ফেটে পড়ল ঝুখ্রাই। ডোরা-কাটা আঁটসাঁট গেঞ্জি-পরা চওড়া তার বুকের ওপরে চাপড় মেরে বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই! বলশেভিক আর কমিউনিস্টরা যে এক, একথা যেমন ঠিক, তোমার কথাটাও তেমনি ঠিক।' হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে উঠল, 'কিন্তু এতোটা যখন বুঝে গেছ, তখন মনে রাখা চাই — তুমি তো চাও না যে ওদের হাতে আমি ধরা পড়ি, সুতরাং কক্ষনো কারুর কাছে বলবে না কথাটা। বুঝলে তো?'

'বুঝেছি,' দৃঢ়স্বরে বলল পাভেল।

আঙিনার দিকে গলার স্বর শোনা গেল আর কোন জানান না দিয়েই দরজাটা খুলে গেল। ঝুখ্রাইয়ের হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সেঁধিয়ে গেল পকেটের মধ্যে, কিন্তু সের্গেই ব্রুঝাক্‌কে এবং তার পেছন পেছন ভালিয়া আর ক্লিমকাকে ঢুকতে দেখে সে আবার বের করে আনল হাতটা। রোগা আর বিবর্ণ সের্গেই-এর মাথায় পট্টি বাঁধা।

পাভেলের করমর্দন করে হাসিমুখে বলল সের্গেই, 'কিরে, পাভকা। আমরা তিনজনেই এলাম তোর এখানে একটু গল্পটল্প করব বলে। ভালিয়া আমাকে একা বেরুতে দেবে না, আর ক্লিমকা আবার ভালিয়াকে একা কোথাও যেতে শুনলে ঘাবড়ে যায়। কটা-চুলো হলে হবে কি, ক্লিমকাটা এদিকে দিব্যি সেয়ানা।'

হাসতে হাসতে ভালিয়া হাত দিয়ে চেপে ধরল সের্গেই-এর মুখটা, 'ফাজিল একটা। আজ সারাদিন ক্লিমকার পেছনে লেগে থাকবে, দেখছি।'

এক-পাটি সাদা দাঁত বের করে ক্লিমকা তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হাসল, 'ঘেয়ো-মাথা রুগীকে নিয়ে আর কী করা যাবে বল? ঘিলুটা একটু ঘুলিয়ে গেছে — দেখতেই তো পাচ্ছ।'

হেসে উঠল সবাই।

মাথায় তলোয়ারের সেই চোটটা থেকে সের্গেই এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারে নি। পাভেলের বিছানার ওপরে আরাম করে বসল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোরালো গল্পে জমে গেল এরা ক'জন। সের্গেই সাধারণত ফুর্তিবাজ আর হাসিখুশি। কিন্তু পেৎলিউরা-সৈনিকের সঙ্গে তার সেদিনের ঘটনাটার পর সে গম্ভীর আর মন-মরা হয়ে উঠল। ঘটনাটার কথা সে বলল ঝুখ্রাইকে।

ঝুখ্রাই এই তিনটি ছেলেমেয়েকে চেনে, কারণ সে বারকয়েক গেছে ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি। এই তরুণদের তার ভাল লাগে, একেবারে সংগ্রামের মধ্যে এখনও সরাসরি আসে

নি, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ওদের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে ঝুখ্‌রাই শুনে গেল কীভাবে ওরা ওদের বাড়িতে ইহুদী পরিবারগুলিকে আশ্রয় দিতে সাহায্য করেছিল তাদের বাঁচাবার জন্য। সেদিন বিকেলে সে এই ছেলেমেয়েদের অনেক কিছু বলল — বলশেভিকদের সম্বন্ধে, লেনিনের সম্বন্ধে। কী ঘটছে না ঘটছে সেসব এদের বুঝিয়ে বলল ঝুখ্‌রাই।

পাভেল যখন তার বন্ধুদের বিদায় দিয়ে রাস্তায় এগিয়ে দিল, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ঝুখ্‌রাই প্রতি সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় আর গভীর রাত্রে ফিরে আসে। শহর ছেড়ে যাবার আগে তাকে তার কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হচ্ছে কাকে কোন্ কাজটা করার জন্য থাকতে হবে।

কিন্তু আজকের এই রাত্তিরটায় আর ফিরল না সে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে পাভেল দেখতে পেল শূন্য বিছানা।

একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে গেল পাভেলের মন, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা বন্ধ করে যথাস্থানে চাবিটা রেখে ক্লিমকার বাড়ি এল যদি সেখানে ফিওদরের কোন খবর পাওয়া যায় সেই আশায়। জামা-কাপড় কাচাকাচি করছিল ক্লিমকার মা — মোটাসোটা দেহ, বসন্তের দাগওলা চ্যাপ্টা মুখ। ফিওদর কোথায় জানে কিনা পাভেল জিজ্ঞেস করলে কাটা কাটা কথায় জবাব দিল ক্লিমকার মা, 'তোর ওই ফিওদরের ওপর নজর রাখা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই, না? ওই হতভাগা লোকটার জন্যেই তো জোজুলিখার সংসারটা তছনছ হয়ে গেল। ওর সঙ্গে তোর কী এত কাজ? কী আমার একটা দল! ক্লিমকা, তুই, যতসব...' রাগে সে সজোরে চাপ দিল জামাকাপড়ে।

ক্লিমকার মা বড় মুখরা, ভীষণ কাটা কাটা তার কথা।

ক্লিমকার বাড়ি থেকে পাভেল এল সের্গেইয়ের বাড়ি। সেখানে সে তার আশঙ্কার কথাটা বলল। ভালিয়া বলল, 'এত ভাবছই বা কেন? হয়তো কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছে।' কিন্তু তার কথায় নিশ্চয়তার অভাব ফুটে উঠল।

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাভেলের, বুঝাক্‌দের বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকল না সে। ওরা তাকে খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও চলে এল পাভেল।

বাড়ি ফিরে এল পাভেল যদি ঝুখ্‌রাই ফিরে থাকে এই আশায়।

দরজাটা তেমনিই তালাবন্ধ। ভারি মন নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল কিছুক্ষণ, ফাঁকা বাড়িটায় ঢুকতে তার মন চাইল না কিছুতেই।

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কিছুক্ষণ আঙিনাটায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর

হঠাৎ যেন কিসের টানে সে এসে ঢুকল চালাঘরটায়। চালের নিচে বেয়ে উঠে মাকড়সার জাল সরিয়ে গোপন জায়গাটা থেকে লুকিয়ে-রাখা ন্যাকড়া-জড়ানো সেই ভারি ম্যান্লিশের পিস্তলটা বের করে নিল।

তারপর চালাটা থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল রওনা হল স্টেশনের দিকে। পকেটে ঝুলন্ত পিস্তলটার ভার অনুভব করে সে অদ্ভুত রকমের একটা উল্লাস বোধ করল।

কিন্তু স্টেশনে ঝুখ্রাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেল না। ফিরে আসার পথে প্রধান বনপরিদর্শকের সেই চেনা বাগান-বাড়িটার কাছে তার গতি কমে এল। একটা ক্ষীণ আশায় সে বাড়িটার জানলাগুলোর দিকে একবার তাকাল, কিন্তু বাগানটার মতোই বাড়িটাও যেন প্রাণহীন। বাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে সে পেছন ফিরে এক নজর তাকাল গত হেমন্তের ঝরাপাতায় আচ্ছন্ন বাগানের পথটার দিকে। জায়গাটাকে মনে হল জনমানবশূন্য আর নিতান্তই উপেক্ষিত। কোন উদ্যোগী হাতের স্পর্শ পেয়েছে বলে দেখে মনে হয় না — বিরাট পুরনো বাড়িটার প্রাণহীন নিস্তব্ধতা পাভেলকে আরও বিষণ্ণ করে তুলল।

তোনিয়ার সঙ্গে তার শেষ ঝগড়াটা খুব গুরুতর রকমের হয়ে গেছে। মাসখানেক আগে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল।

পকেটে হাতদুটো গুঁজে ধীরে ধীরে শহরে ফিরে আসার পথে সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল পাভেলের।

হঠাৎ রাস্তায় তোনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, আর তোনিয়া তাকে তাদের বাড়ি আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, 'বাবা আর মা বল্শান্স্কিদের বাড়ি যাচ্ছেন জন্মদিনের নেমন্তন্নে। আমি একা থাকব বাড়িতে। তুমি এসো না, পাভ্লুশা ? একটা খুব ভাল বই আছে — লেওনিদ আন্দ্রেয়েভের 'সাশ্কা ঝিগুলিওভ' — দু'জনে মিলে পড়া যাবে। আমার অবশ্য পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকবার পড়ার ইচ্ছে আছে তোমার সঙ্গে। বেশ কাটাব বিকেলটা, কেমন ? আসবে তো ?'

তোনিয়ার ঘন বাদামী চুলের উপর সাদা আঁটসাঁট টুপিটার নিচ থেকে তার বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখদুটো আশান্বিতভাবে তাকিয়েছিল পাভেলের দিকে।

'আসব আমি।'

তারপরে যে যার পথে চলে গিয়েছিল তারা।

পাভেল তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল তার যন্ত্রগুলোর কাছে: সন্ধ্যাটা তোনিয়ার সঙ্গে কাটাতে পারবে — যেন এই চিন্তাতেই চুল্লিটায় আগুনটা জ্বলছে অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে, জ্বালানির কাঠগুলো যেন আরও বেশি খুশি হয়ে পটপট আওয়াজ তুলছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন সামনের চওড়া দরজাটায় এসে টোকা মারল, তোনিয়া বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল তার যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব। তোনিয়া বলল, 'আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে — ওদের আসার কথা ছিল না অবশ্য। কিন্তু পাভ্লুশা, তুমি চলে যেয়ো না।'

ফিরে যাবার জন্য পিছন ফিরে দরজাটার দিকে পাভেল এগিয়ে যেতেই তোনিয়া এসে তার হাত ধরল, 'চল ভেতরে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে ওদেরই লাভ হবে।' পাভেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরে তোনিয়া তাকে খাবার ঘরটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে।

ঘরে বসেছিল কয়েকজন তরুণ-তরুণী। তাদের দিকে ফিরে তোনিয়া হেসে বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই তোমাদের সঙ্গে, এই আমার বন্ধু পাভেল করচাগিন।'

ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলটা ঘিরে বসেছিল ওরা তিনজন: লিজা সুখারকো — সুন্দরী, গাঢ় রঙ, ঠোঁট-ফোলানো ছোট মুখ, চটুল ভঙ্গিতে চুল বাঁধা — স্কুলের ছাত্রী সে; কালো রঙের একটা কেতাদুরস্ত জামা গায়ে লম্বাটে একটি ছেলে, মাথার পাতলা চুলগুলো তার তেলে চকচক করছে, ধূসর চোখের দৃষ্টিতে একটা শূন্য চাউনি; আর এদের দু'জনের মাঝখানে বাবুয়ানা একটা স্কুলের উর্দি পরে বসে আছে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি। তোনিয়ার ঘরে ঢোকার সময়ে তাকেই পাভেল প্রথম দেখেছিল।

লেশ্চিনস্কিও দেখেই চিনেছে পাভেলকে, বিস্ময়ে তার সরু বাঁকা ভুরুদুটো তুলল সে।

কয়েক মুহূর্ত পাভেল একটা সুস্পষ্ট শত্রুতার চোখে ভিক্তরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজাটায়। এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তোনিয়া, পাভেলকে ভেতরে আসতে বলে লিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে এল।

আগন্তুকটিকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল লিজা সুখারকো, দাঁড়িয়ে উঠল সে চেয়ার ছেড়ে।

পাভেল কিন্তু বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আধা-অন্ধকার খাবার ঘরটা পেরিয়ে হনহন করে চলে এল সামনের দরজাটার দিকে। তোনিয়া এসে যখন তাকে ধরে ফেলে তার কাঁধে হাত রাখল, ততক্ষণে পাভেল দেউড়িতে চলে এসেছে।

'ছুটে চলেছ কোথায়? তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হোক তাই আমি বিশেষ করে চেয়েছিলাম,' উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলল।

পাভেল কাঁধের ওপর থেকে তার হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে তীব্র স্বরে বলল, 'ওই শালার সামনে আমি নিজেকে একটা দেখবার জিনিস হিসেবে খাড়া করতে রাজী নই। আমি ওই দলের লোক নই — তুমি ওদের পছন্দ করতে পারো, কিন্তু আমার ঘেন্না

হয় ওদের দেখে। যদি জানতাম যে ওরা তোমার বন্ধু, তাহলে আমি কক্ষনো আসতাম না।'

জমে ওঠা রাগ চেপে তাকে বাধা দিয়ে বলল তোনিয়া, 'এরকম কথা বলার কী অধিকার আছে তোমার? আমি তো কখনো জানতে যাই না তোমার বন্ধু কারা, কারা আসে তোমার বাড়িতে।'

'তোমার এখানে কারা আসে না আসে তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। কিন্তু আমি আর তোমার এখানে আসব না — শুধু এইটে বলে যাচ্ছি।' সামনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পাভেল পাল্টা জবাব দিয়েছিল তোনিয়ার কথার। ছুটে গিয়েছিল সে বাগানের দেউড়িটার দিকে।

তারপর থেকে আর তোনিয়ার সঙ্গে দেখা হয় নি। দাঙ্গার সময়ে সে আর ইলেকট্রিশিয়ান দু'জনে মিলে যখন বিদ্যুৎ-স্টেশনে ইহুদী-পরিবারগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, তখন পাভেল ভুলে গিয়েছিল ঝগড়ার ঘটনাটা। আজ আবার তোনিয়ার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল তার।

ঝুখ্‌রাইয়ের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা আর ফাঁকা বাড়ির কথা ভেবে মনটা দমে গেল পাভেলের। ধূসর লম্বা রাস্তাটা ঘুরে গেছে ডাইনে। বসন্তের কাদা এখনও শুকোয় নি, তামাটে কাদা-জলের ছোট ছোট গর্ত রাস্তাটার বুক জুড়ে আছে। সামনের একটা বাড়ির দেয়ালটার প্লাস্টার খসে গেছে। কদাকার বাড়িটা এসে ঢুকেছে রাস্তার মধ্যে আর তারই পাশ দিয়ে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

* * *

রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা ভাঙাচোরা দরজাওয়ালা বিধ্বস্ত দোকান-ঘরের মতো জায়গার মাথার ওপরে 'সোডা-লেমোনেড' লেখা একটা তক্তি উল্টো হয়ে ঝুলছে, সেইখানে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি লিজা সুখারকোর কাছে বিদায় নিচ্ছিল।

ভিক্তর অনুনয়ের দৃষ্টিতে লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছিল, 'আসবেন তো ঠিক? ঠকাবেন না তো শেষ পর্যন্ত?'

লিজা চতুরমুখে উত্তর দিল, 'আসব বৈকি। অপেক্ষা করতে পারেন আমার জন্যে।'

চলে যাবার সময় সে ভিক্তরের দিকে তার বাদামী চোখের ভরসা-জাগানো গূঢ় চাউনিতে তাকিয়ে হাসল।

রাস্তা বেয়ে কয়েক গজ আসতেই লিজা দু'জন লোককে একটা বাঁক ঘুরে রাস্তার ওপরে বেরিয়ে আসতে দেখল। প্রথম জন বলিষ্ঠ দেহ, চওড়া-বুক, মজুরের পোশাক

পরা — তার বোতাম-খোলা কোর্তাটার নিচে ডোরাকাটা গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে, কপালের ওপরে মাথার কালো টুপিটা নামানো, পায়ে বাদামী নিচু বুটজোড়া, চোখের নিচে একটা কালচে-নীল আঘাতের চিহ্ন।

দৃঢ় পায়ে কিন্তু একটু টলে টলে চলেছে লোকটি।

তার তিন-পা পেছনে পিঠে প্রায় বেয়নেট ঠেকিয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধূসর কোট-পরা একজন পেৎলিউরা-সৈন্য — তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলছে দুটো কার্তুজের থলি। লোমশ ভেড়ার চামড়ার টুপিটার নিচ থেকে তার ছোট ছোট সাবধানী চোখদুটো বন্দীর মাথার পেছন দিকটায় লক্ষ্য রেখেছে, তার গালের দু'ধারে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে খোঁচা খোঁচা গোঁফ।

একটু গতিটা কমিয়ে লিজা রাস্তাটা পার হয়ে অন্য দিকে এল আর ঠিক সেই সময় তার পেছনে পাভেল এসে পড়ল বড়ো রাস্তাটার ওপরে।

পুরনো বাড়িটা পার হয়ে রাস্তাটার বাঁকে পাভেল ডান দিকে যেই ঘুরেছে, অমনি সেও ওই দু'জন মানুষকে তার দিকে আসতে দেখল।

চমকে উঠে থেমে গেল পাভেল, যেন তার পা আটকে গেছে মাটির সঙ্গে। যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে ঝুখ্‌রাই।

'এইজন্যেই কাল রাত্রে ফেরে নি ঝুখ্‌রাই!'

ক্রমশই এগিয়ে আসছে ঝুখ্‌রাই। পাভেলের বুকে হাতুড়ি পিটতে লাগল, যেন হৃৎপিণ্ডটা ফেটে পড়বে এখনই। অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝে নেবার বৃথা চেষ্টায় তার মাথায় অতি দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে লাগল: খুব বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। শুধু একটা জিনিস স্পষ্ট: ঝুখ্‌রাই ধরা পড়েছে। বিভ্রান্ত আর হতচকিত পাভেল ওদের দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবতে লাগল, 'কী করা যায়?'

শেষ মুহূর্তে তার মনে পড়ল পকেটে পিস্তলটার কথা। ওরা দু'জন তাকে পার হয়ে এগিয়ে গেলেই সে রাইফেলধারীটাকে পেছন থেকে গুলি করবে আর তাহলেই ফিওদরের মুক্তি। মুহূর্তের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। সে ভীষণ জোরে দাঁতে দাঁত চাপল। ফিওদর তো কালই বলেছিল, 'এই সব কাজের জন্যে আমাদের চাই শক্তসমর্থ লোকের...'

দ্রুত একনজর পেছন দিকটা দেখে নিল পাভেল। শহরমুখো রাস্তাটা একেবারে জনহীন, জন-প্রাণীও চোখে পড়ে না। সামনের দিকে একটা বসন্তের খাটো কোট-পরা স্ত্রীলোক রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে — ও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে মাথা ঢোকাবে না। মোড়ের ওখান থেকে যে অন্য রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেটা সে দেখতে

পাচ্ছে না। শুধু স্টেশনের দিকে বহুদূরে রাস্তাটার ওপর কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে।

রাস্তাটার ধার ঘেঁষে সরে এল পাভেল। মাত্র আর কয়েক পা যখন ব্যবধান, তখন ঝুখ্‌রাই তাকে দেখতে পেল।

আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে ঝুখ্‌রাইয়ের ঘন ভুরুজোড়া নেচে উঠল। পাভেলের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার গতি কমে এল, আর, বেয়নেটটা এসে স্পর্শ করল তার পিঠ।

খ্যানখেনে ভাঙা গলায় প্রহরীটা বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে চলো, নইলে দেব এক বাড়ি এই কুঁদোর!'

তাড়াতাড়ি পা চালাল ঝুখ্‌রাই। পাভেলের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। শুধু যেন অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ল একবার।

পাছে কটা-গোঁফ সৈনিকটার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাই পাভেল নিতান্তই উদাসীনের ভঙ্গিতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু তার মাথায় উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বারবার চাড়া খেতে লাগল: 'যদি গুলিটা ফসকে গিয়ে ওই লোকটার গায়ে না লেগে ঝুখ্‌রাইয়ের গায়ে লাগে, তাহলে...'

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই।

কটা-গোঁফ সৈন্যটা পাভেলের পাশাপাশি এসে পড়তেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল — রাইফেলটা চেপে ধরে নলটা ঝট করে মাটির দিকে নামিয়ে আনল।

বেয়নেটটা একটা পাথরের ওপর ঘষে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলল।

এরকম আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যটা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ভীষণ একটা হেঁচকা টানে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেহের সমস্ত ভার দিয়ে কোনরকমে রাইফেলটা চেপে ধরে রইল পাভেল। ধস্তাধস্তির মধ্যে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পাথরের গায়ে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়ল খানাটার মধ্যে।

শব্দটা শুনেই ঝুখ্‌রাই পাশে লাফিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি করছে সৈন্যটা — পাভেলের হাতটা মুচড়ে গেছে, কিন্তু যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে তার মুঠি আলগা করে নি। তারপরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্রুদ্ধ পেৎলিউরা-সৈনিকটি পাভেলকে পেড়ে ফেলল মাটিতে — কিন্তু তবুও সে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারল না। পাভেল পড়ে গেল, কিন্তু পাভেলের টানে

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যটিও হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাভেলের ওপর — এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারে।

তখন দুই লাফে ঝুখ্‌রাই এসে পড়ল ওদের পাশে — লোহার মতো শক্ত তার মুঠি শূন্যে একপাক ঘুরে নেমে এল সৈন্যটার মাথার ওপর। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সৈন্যটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেল পাভেল। মুখের ওপর দুটো প্রচণ্ড ঘুঁষি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল সৈনিকের দেহ পথের ধারে খানার মধ্যে।

যে-হাতে ঘুঁষি চলেছিল, সেই বলিষ্ঠ দুটি হাতই পাভেলকে মাটি থেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

* * *

ইতিমধ্যে ভিক্তর রাস্তার মোড়টা থেকে শ'খানেক পা এগিয়ে গিয়েছিল। লিজার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে আর পরের দিন আবার লিজা তার সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানাটার পেছনে দেখা করতে আসবে বলে কথা দেওয়ায় ভিক্তর মনের স্ফূর্তিতে চলেছে শিস দিয়ে 'চপল-হৃদয়া মোহিনী' গানটির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে শোনা যায় যে লিজা সুখারুকো প্রেমের ব্যাপারে বেশ একটু বেপরোয়া গোছের।

উদ্ধত আর বড়াই করতে অভ্যস্ত সেমিওন জালিভানভ একবার বলেছিল যে লিজা নাকি তার কাছে আত্মদান করেছে। ভিক্তর যদিও ঠিক বিশ্বাস করে নি কথাটা, তবু লিজাকে তার বড়ো আকর্ষণীয় আর বাঞ্ছিত বলে মনে হয়। কাল সে জানতে পারবে জালিভানভের কথাটা সত্যি না মিথ্যে।

'কাল যদি আসে ও, তাহলে আমি ইতস্তত করব না। যাই হোক, লিজা চুমো তো খেতে দেয়। আর, সেমিওনটা যদি সত্যি কথাই বলে থাকে...' দু'জন পথ-চলতি পেৎলিউরা-সৈন্যকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য রাস্তাটার পাশে সরে যেতে গিয়ে ভিক্তরের চিন্তায় এইখানে বাধা পড়ল। সৈন্য দু'জনের মধ্যে একজন হাতে একটা ক্যাম্বিসের বালতি ঝুলিয়ে চলেছে খাটো-লেজ একটা ঘোড়ায় চেপে — বোঝা যাচ্ছে যে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছে সে। খাটো কোর্তা আর ঢিলেঢালা নীল প্যাণ্ট পরা অন্যজন চলেছে ঘোড়সওয়ারের পাশে পাশে তার হাঁটুর ওপর হাতটা রেখে একটা মজার গল্প বলতে বলতে।

এদের যাবার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে ভিক্তর যখন ফের চলতে শুরু করেছে, তখন বড়ো রাস্তাটার ওপরে রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে থেমে গেল সে। ঘুরে

দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সওয়ারটি আওয়াজটার দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিয়েছে আর তার পেছন পেছন অন্য লোকটি ছুটে চলেছে তার তলোয়ারটা চেপে ধরে।

ভিক্তর ছুটল ওদের পেছনে। বড়ো রাস্তাটার ওপরে যখন সে প্রায় পেঁৗছে গেছে, তখন আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল, আর পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে মোড়ে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল ঘোড়সওয়ার-সৈন্যটি। ঘোড়াটাকে আরও জোরে দৌড়ানোর জন্য পা দিয়ে খোঁচা মেরে আর বাঁট দিয়ে আঘাত করে সে প্রথম দেউড়িটার কাছে এসে ভিতরে ঢুকেই আঙিনায় লোকগুলোর দিকে হাঁক পাড়ল, 'শিগগির, হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসো! আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে ওরা!'

এক মিনিটের মধ্যে জনকতক লোক তাদের রাইফেলের বল্টুর ভাঁজ খোলার খটাখট আওয়াজ তুলে ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনাটা থেকে।

ভিক্তরকে গ্রেপ্তার করা হল।

ততক্ষণে কিছু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপরে — তাদের মধ্যে ছিল লিজাও। লিজাকে আটকানো হয়েছিল সাক্ষ্য দেবার জন্য।

ভয়ে লিজার পাদুটো যেন আটকে গিয়েছিল ঘটনার জায়গাটায়। ঝুখ্রাই আর করচাগিন তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে লিজা দেখল যে-ছেলেটি পেৎলিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল, তাকেই যে তোনিয়া সেদিন তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

ঝুখ্রাই আর পাভেল একজনের পেছনে আরেকজন বেড়া ডিঙিয়ে একটা বাগানের মধ্যে ঢুকেছে, এমন সময়ে সওয়ার-সৈন্যটি এসে পড়ল বড়ো রাস্তায় ঘোড়া হাঁকিয়ে। ঝুখ্রাইকে রাইফেলটা নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে আর মার খেয়ে বেসামাল সৈন্যটাকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে দেখে সওয়ারটি তার ঘোড়া হাঁকাল বেড়াটার দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুখ্রাই রাইফেলটা তুলে গুলি ছুঁড়ল ধাওয়া-করে-আসা সওয়ারটার দিকে। ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হঠে এল লোকটা।

পেৎলিউরা-সৈন্যটার এমন ভীষণভাবে ঠোঁট কেটে গেছে যে প্রায় কথা বলতে পারছে না সে। কোনক্রমে সে এতক্ষণে ঘটনাটার বিবরণ দিল।

'নিরেট আহাম্মক কোথাকার! গ্রেপ্তার-করা একটা লোক কিনা নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর তুমি দিব্যি সেটা হতে দিলে? যাও এখন পাছায় পঁচিশ ঘা খাও গে।

ক্রুদ্ধ সৈন্যটি খিঁচিয়ে উঠল, 'খুব যে ওস্তাদি মারছ দেখছি। নাকের নিচ দিয়ে

বেরিয়ে গেল, না? ওই যে আরেকটা বেজম্মা আমার ঘাড়ের ওপর ক্ষ্যাপার মতো লাফিয়ে পড়ল — সেটা আমি আগে থেকে জানব কি করে?'

লিজাকেও জেরা করা হল। পেৎলিউরা-সৈন্যটি যা বলেছিল সেও তাই বলল; কিন্তু যে-ছেলেটি তাকে আক্রমণ করেছিল সেই ছেলেটিকে যে সে চেনে, সে কথাটা লিজা চেপে গেল। তারপরে তাদের সবাইকে কম্যাণ্ড্যাণ্টের দপ্তরে নিয়ে আসা হল এবং সন্ধ্যের আগে কাউকে ছাড়া হল না।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট নিজে সঙ্গে গিয়ে লিজাকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু রাজী হল না লিজা — লোকটার মুখে ভোদ্‌কার গন্ধ এবং তার এই প্রস্তাবটার উদ্দেশ্য মোটেই ভাল বলে ঠেকল না।

ভিক্তর চলল লিজার সঙ্গে তাকে বাড়ি পেঁছে দেবার জন্য।

স্টেশনের পথটা বেশ দূর এবং দু'জনে হাত ধরাধরি করে যাবার সময় ওই ঘটনাটা ঘটার জন্য ভিক্তর মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে লিজা জিজ্ঞেস করল, 'গ্রেপ্তার-করা লোকটাকে খালাস করে দিল কে, সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন না, না?'

'মোটেই না, কী ক'রে আন্দাজ করব?'

'সেদিন সন্ধ্যেয় তোনিয়া একটি ছেলেকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল, মনে আছে?'

থেমে গেল ভিক্তর, বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'পাভেল করচাগিন?'

'হ্যাঁ, নামটা করচাগিন বলেই তো মনে হচ্ছে। কী রকম অদ্ভুত ঢঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? সেই ছেলেটা।'

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল ভিক্তর।

'ঠিক দেখেছেন আপনি?'

'নিশ্চয়, ঠিক মনে আছে আমার ওর মুখখানা।'

'কম্যাণ্ড্যাণ্টকে কথাটা বললেন না কেন?'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল লিজা, 'এমন জঘন্য কাজ আমি করব ভেবেছেন নাকি?'

'জঘন্য? সৈন্যটার ওপর কে হামলা চালিয়েছিল সেটা বলা কি জঘন্য কাজ হল?'

'তা নয়তো কী, সেটাকে আপনি মনে করেন খুব একটা সম্মানের কাজ? ওরা যে কী অত্যাচারটা চালাচ্ছে সেটা ভুলে যাচ্ছেন? ইস্কুল-বাড়িতে কতগুলো অনাথ ইহুদী বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে, তার কোন ধারণা আছে আপনার? আর আপনি চান

আমি কিনা করচাগিনকে ধরিয়ে দেব ওদের কাছে ? সত্যি, আপনি এরকম কথা বলবেন বলে আমি ভাবতে পারি নি।'

লেশ্চিনস্কি এমন জবাব প্রত্যাশা করে নি। কিন্তু লিজার সঙ্গে ঝগড়া বাধালে তার চলবে না, তাই সে আলোচনাটা পালটে নেবার চেষ্টা করল, 'চটছেন কেন, লিজা, আমি এই একটু ঠাট্টা করছিলাম আর-কি। আপনি যে এমন নীতিনিষ্ঠ মেয়ে তা জানতাম না।'

'ঠাট্টাটা আপনার বড়ো বিশ্রী,' শুকনো গলায় পালটা জবাব দিল লিজা।

সুখারুকোদের বাড়ির সামনে লিজার কাছে বিদায় নেবার সময় ভিক্তর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কাল আসবেন তো, লিজা ?'

অনির্দিষ্টভাবে লিজা বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না, দেখি...'

শহরমুখো ফিরে যেতে যেতে ভিক্তর সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার ভেবে দেখল, 'তা বেশ তো, সুন্দরী, তুমি হয়তো কাজটাকে জঘন্য মনে করতে পার, কিন্তু আমার ধারণাটা একেবারেই অন্যরকম। অবশ্য, কে কাকে কার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল — তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

লেশ্চিনস্কিরা পোল্যাণ্ডের প্রাচীন বনেদী পরিবার। সুতরাং সেই হিসেবে ভিক্তরের কাছে উভয় পক্ষই সমান ঘৃণ্য। একমাত্র যে-সরকারকে সে স্বীকার করে, সেটা পোলিশ অভিজাতদের সরকার — 'রাজকীয় পোলিশ সরকার' — এবং সেটা শিগগিরই এদেশে কায়েম হবে পোলিশ বাহিনী এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওই হারামজাদা করচাগিনটাকে শেষ করে দেবার এই একটা সুযোগ। ওরা নির্ঘাত ওর ঘাড়টা ধরে মটকে দেবে।

তার পরিবারের লোকজনের মধ্যে একমাত্র ভিক্তরই শহরে থেকে গেছে। চিনি-কারখানার সহকারী-পরিচালকের সঙ্গে তার এক পিসিমার বিয়ে হয়েছে, তার সঙ্গেই সে আছে। তার পরিবারের আর-সবাই আছে ওয়ারশয়ে — সেখানে তার বাবা সিগিজমুণ্ড্ লেশ্চিনস্কি একজন পদস্থ কর্মকর্তা।

কম্যাণ্ড্যাণ্টের দপ্তরে এসে ভিক্তর খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সে চারজন পেৎলিউরা-সৈন্যের সঙ্গে চলেছে করচাগিনদের বাড়িমুখো।

ভেতরে আলো-জ্বালা একটা ঘরের জানলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিচু গলায় বলল ভিক্তর, 'ওই বাড়িটা। আমি এবার যেতে পারি তাহলে ?' খোরুঝিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নিশ্চয়। বাকিটা আমরাই ব্যবস্থা করব। খবরটা দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

ফুটপাথ বেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল ভিক্তর।

* * *

পিঠের ওপর শেষ আঘাতটা পড়তেই পাভেল হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্ধকার ঘরটার মধ্যে যেখানে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ছড়িয়ে-পড়া হাতদুটো তার সামনের দেয়ালের গায়ে ঠুকে গেল। হাতড়াতে হাতড়াতে সে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো তক্তাটা পেয়ে তার ওপর উঠে বসল। সর্বাঙ্গ তার ক্ষতবিক্ষত, ব্যথায় টনটন করছে সমস্ত শরীর, মনটাও দমে গেছে।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে গ্রেপ্তার হয়েছে। পেৎলিউরার লোকে তার কথা জানল কী করে? কেউ যে তাকে দেখে নি, এ সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল না। কী হবে এর পর? ঝুখ্‌রাই-ই বা কোথায়?

ঝুখ্‌রাই ক্লিমকাদের বাড়ি গিয়ে ওঠার পর পাভেল সেখান থেকে চলে আসে সের্গেইদের বাড়ি। শহর ছেড়ে সরে পড়বার জন্য ঝুখ্‌রাই ক্লিমকাদের ওখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকল।

'কাকের বাসায় পিস্তলটা লুকিয়ে রেখে ভালোই করেছিলাম,' ভাবল পাভেল, 'ওটা এদের হাতে পড়লে আর কোন আশাই ছিল না। কিন্তু আমাকে ধরতে পারল কী করে এরা?' উত্তর না পাওয়ায় প্রশ্নটা যেন যন্ত্রণা দিতে থাকল তাকে।

পেৎলিউরার লোকজন খুঁটিয়ে খানাতল্লাশি করা সত্ত্বেও করচাগিনদের বাড়িতে বিশেষ কিছু পায় নি। আর্তিওম তার পোশাক আর অ্যার্কর্ডিয়ন-বাজনাটা নিয়ে গেছে গ্রামে যেখানে সে থাকে। মা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার বাক্স। সুতরাং এদের লুঠ করে নিয়ে আসার মতো ছিল না কিছুই।

কিন্তু বাড়ি থেকে এই থানায় আসার অভিজ্ঞতাটা পাভেল জীবনে ভুলবে না: নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, মেঘে ঢাকা আকাশ, তারই মধ্যে দিয়ে চারদিক থেকে প্রচণ্ড ঘুষি আর লাথি খেতে খেতে অন্ধভাবে আধা-মূর্ছিত পাভেল হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলেছে।

দরজাটার ওপাশের ঘরে যেখানে কম্যাণ্ড্যাণ্টের সান্ত্রীরা রয়েছে, সেখান থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজাটার নিচের ফাঁকে একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা। পাভেল দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরটার চারিদিকে একবার হেঁটে এল। দেয়ালে আটকানো তক্তাটার উলটো দিকে ভারি গরাদে বসানো একটা জানলা

আবিষ্কার করল পাভেল। হাতে ধরে সেগুলোকে পরখ করল সে, শক্তভাবে আটকানো গরাদগুলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আগে এটা একটা ভাঁড়ারঘর ছিল।

দরজাটার কাছে এগিয়ে এসে পাভেল এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর হাতলটায় আস্তে একটু চাপ দিল।

'শালা, হারামজাদা!' দরজাটা তীব্র একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে উঠতেই গাল পাড়ল সে।

দরজাটা সামান্য খুললে সামনের সরু ফাঁকটা দিয়ে দেখতে পেল এক-জোড়া কড়া-পড়া পায়ের বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে দেয়ালে আটকানো তক্তাটার প্রান্ত থেকে। আরেকবার হালকাভাবে ঠেলা দিতেই দরজাটা আরও জোরে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল। সঙ্গে সঙ্গে তক্তাটায় উঠে বসল আলুথালু চেহারার ঘুমে ভারি-মুখ একটা লোক — উকুনে-ভরা মাথাটা তার পাঁচ আঙুলে ভীষণ জোরে চুলকোতে চুলকোতে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা এক চোট গালাগালিতে ফেটে পড়ল লোকটা। অশ্লীল গালাগালিটা শেষ হবার পর শোবার জায়গাটার পাশ থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে নিরস গলায় সেই জীবটা বলল, 'বন্ধ করে দে দরজাটা, ফের যদি এদিকে উঁকি মারতে দেখি, তাহলে থেঁতলে দেব তোর ওই...'

দরজাটা বন্ধ করে দিল পাভেল। পাশের ঘরে একদমক হাসির হল্লা উঠল।

সারারাত্রি ধরে প্রচুর ভাবল পাভেল। প্রথমবারে লড়াইয়ে পড়ার ফলটা তার বিরুদ্ধেই গেল। পয়লা চোটেই ধরা পড়ে গেছে সে, ইঁদুরের মতো সে এখন ফাঁদে আটকা।

বসে থাকতে থাকতেই একটা অস্থির আধা-ঘুমের ভাব তাকে আচ্ছন্ন করল — বারে বারে ভেঙে যাচ্ছে ঘুমটা — তারই মধ্যে ভেসে ভেসে উঠছে মায়ের রোগা, চামড়া কুঁচকে-যাওয়া মুখখানা, আর সেই চোখদুটি যা সে এত ভালবাসে। 'মা যে এখানে নেই, সেটা ভালোই হয়েছে — থাকলে আরও বেশি দুঃখ পেত।'

জানলা দিয়ে একটা ধূসর চৌকোণা আলো এসে পড়ল মেঝের ওপর।

অন্ধকার ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। ভোর হয়ে আসছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরনো বাড়িটার শুধু একটা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। পর্দাগুলো টানা। হঠাৎ বাইরে শিকলে বেঁধে দেওয়া ট্রেসরের গম্ভীরগলার ঘেউঘেউ ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

একটা ঝিমন্ত ভাবের মধ্যে দিয়ে তোনিয়া শুনতে পেল মা নিচু গলায় বলছেন, 'না, ও ঘুমোয় নি এখনও। ভেতরে এসো, লিজা।'

বান্ধবীর হালকা পায়ের শব্দে আর তার হঠাৎ উষ্ণ আলিঙ্গনে তোনিয়ার ঝিমন্ত ভাবটা শেষ পর্যন্ত কেটে গেল।

ম্লান হাসি হাসল সে, 'ভারি খুশি হলাম লিজা তোর আসাতে। বাবার অসুখের সংকটটা কাল কেটে গেছে, আজ তিনি সারাদিন দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। মা আর আমিও পর পর কয়েক রাত্রি জাগার পর খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি। কী খবর-টবর সব বল্।' কোচটার ওপর তার পাশে তোনিয়া তার বান্ধবীকে টেনে নিল।

'খবর তো অনেক আছে। তবে, কতকগুলো খবর শুধু তোকেই বলার মতো।' দুষ্টুমিভরা চাউনিতে লিজা তাকাল তোনিয়ার মা ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার দিকে।

তিনি হাসলেন। ছত্রিশ বছর বয়সী গিন্নিবান্নি মানুষ তিনি — তরুণীর মতো চঞ্চল তাঁর চলা-ফেরা, বুদ্ধিভরা ধূসর চোখ, সুন্দরী না হলেও মুখে একটা মিষ্টি ভাব আছে।

কোচটার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি কৌতুক করে বললেন, 'বেশ তো, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আমি, কিন্তু তার আগে সবাইকে বলার মতো খবরগুলো একটু শুনে নিই।'

'আচ্ছা। এক নম্বর খবর: আমাদের ইস্কুলের পড়া শেষ হল এবার। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করে বেরনোর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে ইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলী ঠিক করেছেন। ভারি ভালো লাগছে আমার। এই সব বীজগণিত আর জ্যামিতি দেখলেই গায়ে জ্বর আসে! ওসব পড়ে কার যে কী লাভ হয় ? ছেলেদের হয়তো আরও বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব — যদিও চারিদিকে এই যে লড়াই-টড়াই চলছে এর মধ্যে ওরাও জানে না যে কোথায় সেটা করা যেতে পারে। সত্যি, বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার... আমাদের কথা ধরতে গেলে — আমাদের তো বিয়েই হয়ে যাবে, বউ-মানুষদের আর বীজগণিতের দরকারটা কি,' হেসে উঠল লিজা।

এদের সঙ্গে একটুক্ষণ বসার পর ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

লিজা এবার তোনিয়ার আরও কাছে ঘেঁষে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে চৌরাস্তার ঘটনাটার কথাটা ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোনিয়া, ওই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে চিনতে পেরে কী আশ্চর্য যে হয়েছিলাম ! কে, আন্দাজ কর্ তো ?'

আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল তোনিয়া, কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল সে।

কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে রেখে এক দমকে বলে ফেলল লিজা, 'করচাগিন!'

চমকে উঠে ভ্রূকুটি করল তোনিয়া, 'করচাগিন?'

তোনিয়াকে আশ্চর্য করে দিতে পেরেছে দেখে খুশি হয়ে লিজা তার সঙ্গে ভিক্তরের ঝগড়ার প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

গল্প বলায় মশগুল লিজা লক্ষ্যই করে নি যে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তোনিয়ার মুখ আর তার আঙুলগুলো স্নায়বিক উত্তেজনায় নীল ব্লাউজের কাপড়টা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে ধরছে। লিজা জানে না কি গভীর উদ্বেগ জমে উঠেছে তোনিয়ার মনে, তার সুন্দর চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে তাও সে লক্ষ্য করল না।

মাতাল খোরুঞ্জিটা সম্বন্ধে গল্পটা বলে চলেছে লিজা — কিন্তু তোনিয়ার সেদিকে মোটেই কান নেই। একটা ভাবনায় সে অস্থির: 'তাহলে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি জানে কে ওই পেৎলিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল। উঃ, কেন লিজা কথাটা বলতে গেল তাকে?' এবং নিজের অজানতেই কথাটা বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে।

লিজা হঠাৎ তার কথার মানেটা ধরতে না পেরে বলল, 'কী বলছিলি?'

'ভিক্তরকে বলতে গেলি কেন তুই পাভ্‌লুশার... এই, মানে, করচাগিনের কথাটা? ও নিশ্চয় ধরিয়ে দেবে তাকে...'

'কক্ষনো না!' প্রতিবাদ করল লিজা, 'ভিক্তর এরকম কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না। কেনই বা করতে যাবে সে এমন কাজ?'

তোনিয়া হঠাৎ উঠে বসে উত্তেজনায় সজোরে হাঁটুদুটো চেপে ধরল, 'তুই বুঝতে পারছিস না লিজা! ভিক্তর আর পাভেলের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া, তাছাড়া আরও কারণ আছে... ভিক্তরকে পাভ্‌লুশার কথা বলে তুই মস্ত বড়ো ভুল করেছিস।'

এতক্ষণে তোনিয়ার উত্তেজনাটা লক্ষ্য করল লিজা। তোনিয়া যে করচাগিনকে 'পাভ্‌লুশা' বলে উল্লেখ করেছে এটা লক্ষ্য করে এতদিন পর্যন্ত লিজা যে কথাটা আবছাভাবে আন্দাজ করেছিল, সেটার দিকে হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল যেন।

নিজেকে খানিকটা অপরাধী না মনে করে সে পারল না। একটু অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে গেল। মনে মনে ভাবল, 'তাহলে যা ভেবেছি তাই। আশ্চর্য! তোনিয়া কিনা প্রেমে পড়েছে একটা... একজন সাধারণ মজুর-ছেলের সঙ্গে।' কথাটা নিয়ে তোনিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার ভারি ইচ্ছে হল লিজার, কিন্তু সৌজন্যের জন্য সে সামলে নিল নিজেকে। অন্যায়ের চেতনাটা খানিকটা হালকা করার জন্য সে তোনিয়ার হাতদুটো চেপে ধরল, 'ভয়ানক ভাবনা হচ্ছে তোর, তোনিয়া?'

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল তোনিয়া, 'না... হয়তো ভিক্তর সম্বন্ধে আমি যতোটা ভেবেছি, ততটা বেইমান সে হয়তো নয়।'

Э. ВОЙНИЧ
ОВОД
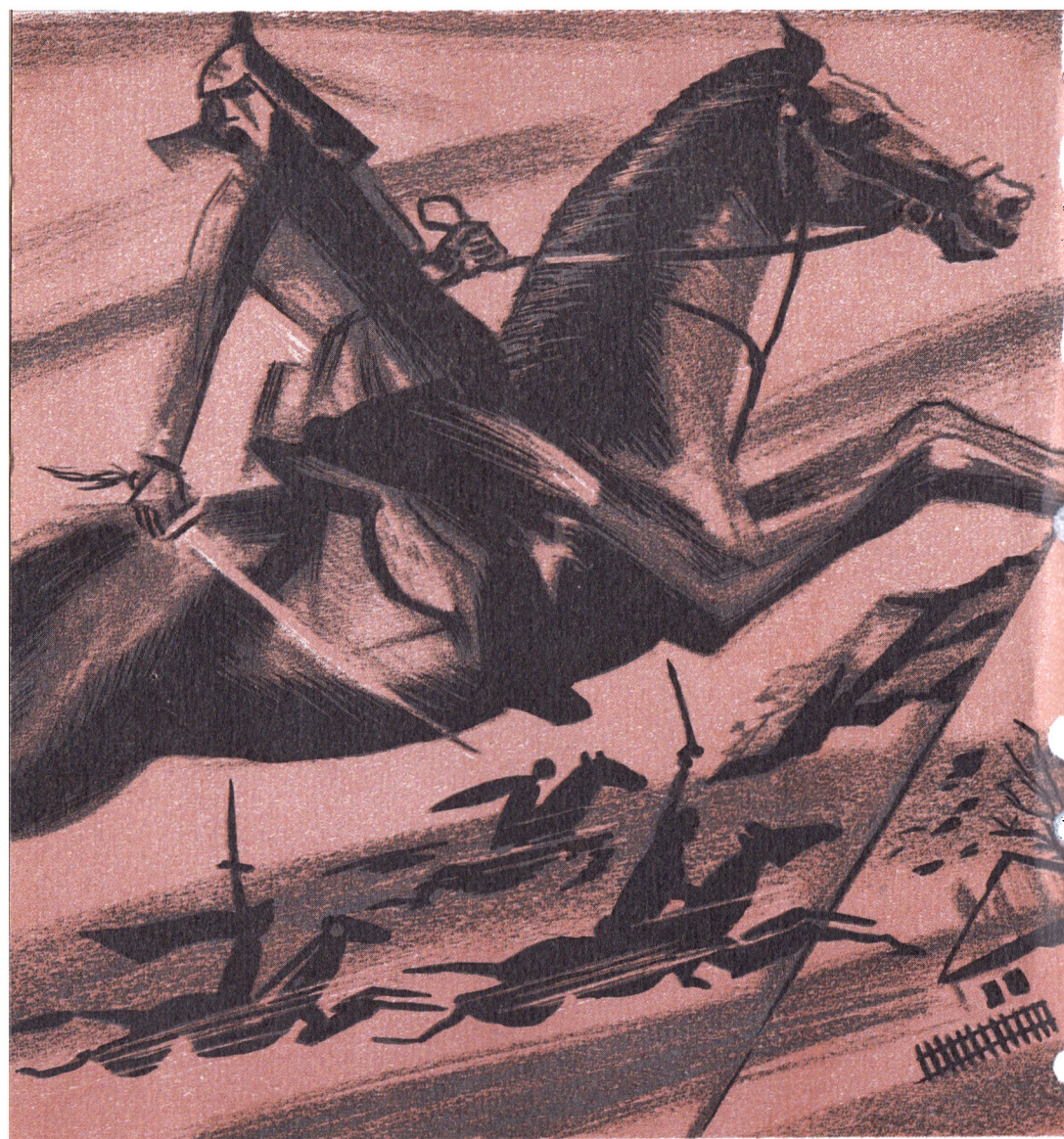
একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল — সেটা ভেঙে গেল ওদের স্কুলের দেমিয়ানভ নামে লাজুক আর আনাড়ী ধরনের একজন সহপাঠী এসে পড়াতে।

বিদায়ী বন্ধুদের এগিয়ে দেবার পর তোনিয়া বাগানের ফটকটায় ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শহরমুখো অন্ধকার রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বসন্তকালের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা বাতাস ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে গেল তোনিয়ার মুখে। দূরে শহরের বাড়িগুলোর জানলায় আবছা ছমছমে লাল আলো মিটমিট করছে। ওখানে ওই শহরের জীবন তার জীবনযাত্রা থেকে ভিন্ন রকমের। ওখানকার কোথাও কোন একটা বাড়িতে রয়েছে তার বিদ্রোহী বন্ধু পাভেল, যে তার আসন্ন বিপদের কথাটা কিছুমাত্র জানে না। বোধহয় সে ভুলে গেছে তোনিয়াকে — তাদের শেষ দেখা হবার পর কতদিন কেটে গেছে ? সেবারে পাভেলই অন্যায় করেছিল, কিন্তু সেসব অনেকদিন আগেই ভুলে গেছে তোনিয়া। আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করবে তোনিয়া, তাহলেই আবার তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে — সুদৃঢ়, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যে যে আবার নিশ্চয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তোনিয়ার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু যদি আজকের এই রাতটার মধ্যেই পাভেলের কোন বিপদ না ঘটে ! যেন অশুভ সংকেতে ভরা এই রাত্রিটা বুঝি পাভেলের জন্য ওৎ পেতে আছে...

তোনিয়া একবার শিউরে উঠল; রাস্তাটার দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে সে ভেতরে এল। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার সময়েও তার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঘোরাফেরা করতে লাগল, 'শুধু যদি আজকের এই রাত্তিরটা পাভেলের ভালোয় ভালোয় কেটে যায় !'

আর কেউ জেগে ওঠার আগেই ভোরে ঘুম ভাঙল তোনিয়ার, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল সে। বাড়ির আর কেউ যাতে জেগে না যায় তার জন্য নিঃশব্দে বেরিয়ে এল তোনিয়া, বিরাট লোমশ ট্রেসরকে শিকল থেকে খুলে নিয়ে শহরমুখো রওনা দিল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে। করচাগিনদের বাড়ির সামনেটায় এসে সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপরে বেড়ার দরজাটা ঠেলে খুলে ভেতরে আঙিনায় এসে পড়ল। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এগুল ট্রেসর...

সেইদিন ভোরেই আরতিওম ফিরে এসেছে গ্রাম থেকে। যে কামারটির সঙ্গে সে কাজ করছিল, সেই তাকে তার ঘোড়ার গাড়িতে করে পেঁৗছে দিয়ে গেছে শহরে। বাড়ি পেঁৗছিয়ে রোজগার করা ময়দার বস্তাটা কাঁধে ফেলে সে আঙিনায় ঢুকেছে — পেছনে তার অন্য জিনিসপত্তর বয়ে নিয়ে আসছে কামারটি। খোলা দরজাটার সামনে বস্তাটা নামিয়ে রেখে আরতিওম ডাক দিল, 'পাভ্‌কা !'

কোন উত্তর নেই।

এগিয়ে আসতে আসতে কামারটি বলল, 'ব্যাপারখানা কী? ভেতরে ঢোকোই না?'

রান্নাঘরে তার জিনিসপত্রগুলো রেখে আরতিওম ঢুকল পাশের ঘরটায়। এ ঘরের দৃশ্য যেটা তার চোখে পড়ল, তাতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল: সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে আছে জায়গাটা, পুরোনো কাপড়-চোপড় ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর।

কিছুই মাথায় ঢুকছে না আরতিওমের। কামারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ব্যাপারখানা কী?'

তার সঙ্গে সায় দিয়ে কামারটি বলল, 'হ্যাঁ, গণ্ডগোলের ব্যাপারই বটে।'

'ছেলেটা গেল কোথায়?' চটে উঠছিল আরতিওম।

কিন্তু ফাঁকা বাড়িটায় কেউ নেই তার কথার জবাব দেবার।

বিদায় নিয়ে চলে গেল কামারটি।

আঙিনায় এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল আরতিওম, 'মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না! দরজাগুলো সব হাঁ করে খোলা, এদিকে পাভ্‌কা নেই।'

তারপরে আরতিওম তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে বিরাট একটা কুকুর তার সামনে কানদুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে। ফটকের দিক থেকে একটি অচেনা মেয়ে বাড়িটার দিকে আসছে। আরতিওমকে আপাদমস্তক দেখে সে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি একবার পাভেল করচাগিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমিও তো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু কোথায় যে সে গেছে শয়তানই জানে! বাড়িতে পেঁছে দেখি ঘরদোর সব খোলা, পাভ্‌কার দেখা নেই কোথাও। আপনিও তাহলে ওর খোঁজেই এসেছেন?'

উত্তরে একটা প্রশ্ন করল মেয়েটি, 'আপনি কি তার ভাই আরতিওম?'

'হ্যাঁ, কেন?'

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল খোলা দরজাটার দিকে। মনে মনে ভাবল সে, 'কেন আমি কাল রাত্রেই এলাম না? না, এ হতে পারে না, হতেই পারে না...' বুকখানা আরও ভারি হয়ে উঠল তার।

আরতিওম তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, মেয়েটা জিজ্ঞেস করল তাকে, 'আপনি এসে দেখেছেন দরজা খোলা আর পাভেল নেই?'

'কিন্তু পাভেলের সঙ্গে আপনার কী দরকার সেটা জানতে পারি?'

তোনিয়া তার কাছে এসে চারিদিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না, তবে পাভেলকে যদি আপনি বাড়িতে না দেখে থাকেন, তাহলে ও নিশ্চয় গ্রেপ্তার হয়েছে।'

চমকে উঠল আর্‌তিওম, ‘গ্রেপ্তার হয়েছে? কেন?’

‘চলুন ভেতরে যাই,’ বলল তোনিয়া।

সে যা জানে সব বলল, নিঃশব্দে শুনে গেল আর্‌তিওম। সব শোনার পর হতাশায় ভরে উঠল তার মন। বিষণ্নভাবে বিড়বিড়িয়ে বলল, ‘ধুত্তোরি ছাই! এত বিপদের পরেও যেন এই গণ্ডগোলটা আর না বাধালে চলছিল না। এখন বুঝতে পারছি, বাড়িটা কেন তছনছ হয়ে আছে। ছেলেটা আবার এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে গেল কেন?.. কোথায় এখন খুঁজতে যাব ওকে? আচ্ছা, আপনি কে?’

‘আমার বাবা প্রধান বনপরিদর্শক তুমানভ। আমি পাভেলের একজন বন্ধু।’

‘ও,’ অন্যমনস্কভাবে বলল আর্‌তিওম, ‘আমি এদিকে ছেলেটাকে খাওয়াবার জন্যে ময়দা-টয়দা নিয়ে এলাম, আর এসে দেখি এই...’

তোনিয়া আর আর্‌তিওম দু’জনা দু’জনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

‘আমি এবার যাই,’ আর্‌তিওমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে বলল তোনিয়া, ‘আপনি বোধহয় খুঁজে পাবেন ওকে। সন্ধ্যায় একবার আসব ’খন। আপনার কাছ থেকে শোনা যাবে, কী হল।’

আর্‌তিওম তার দিকে একবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

* * *

শীতকালের দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে-ওঠা একটা রোগা মাছি জানলাটার এক কোণে গুনগুন করছিল। পুরনো ছেঁড়া-খোঁড়া কৌচটার এক ধারে বসে আছে অল্পবয়সী একটি চাষী-মেয়ে — কনুইদুটো তার হাঁটুর ওপর রাখা, নোংরা মেঝেটার দিকে স্থির শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মুখের এক কোণে আটকানো একটা সিগারেট চেপে ধরে কম্যাণ্ড্যাণ্ট কাগজের ওপর একটা টান দিয়ে লেখাটা শেষ করল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে এটা লিখে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠেছে। কাগজটার যেখানে লেখা আছে ‘শেপেতোভ্‌কা শহরের কম্যাণ্ড্যাণ্ট, খোরুঝিঞ্জ’ তার নিচে জাঁকালো রকমের একটা সই বসাল সে নামের শেষে একটা প্যাঁচালো টান দিয়ে। দরজার দিক থেকে জুতোর নালের শব্দ শুনে কম্যাণ্ড্যাণ্ট তাকিয়ে দেখল।

সামনে দাঁড়িয়ে সালোমিগা — হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট তাকে অভ্যর্থনা জানাল, ‘কি হে! কোত্থেকে উড়ে এলে হে?’

‘দখিনা বাতাসে নয়তো বটেই। হাড় পর্যন্ত হাতটা কেটে দিয়েছে একটা

বোগদুনেৎস্।'* মেয়েটা যে বসে আছে, সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সালোমিগা অশ্লীল গাল পাড়ল।

'তাহলে, এখানে কি করতে এসেছ? চোটের বেদনা সারাতে?'

'বেদনা সারাবার সময় পাব পরলোকে। যুদ্ধসীমান্তে ওদিকে আমাদের দারুণ চেপে আসছে ওরা।'

মাথা নেড়ে মেয়েটাকে ইসারায় দেখিয়ে সালোমিগাকে বাধা দিল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'ওসব কথা পরে হবে এখন।'

একটা টুলের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল সালোমিগা, 'ইউক্রেনীয় জাতীয় প্রজাতন্ত্রের' চিহ্ন এনামেলের ত্রিশূলের চূড়া লাগানো টুপিটা খুলে ফেলল সে। খাটো গলায় বলল, 'গোলুব পাঠিয়েছেন আমাকে। সৈন্যদের একটা বাহিনী এখানে আসবে শিগগিরই। সাধারণভাবে শহরে বেশ একটু কাণ্ডকারখানা হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে অবস্থাটা গোছগাছ করে আনা। প্রধান আতামান স্বয়ং আসতে পারেন বিদেশী হোমরা-চোমরাদের নিয়ে — সুতরাং ওই সব ইহুদী-ঠ্যাঙানো 'আমোদ-প্রমোদের' কথাটথা যেন কেউ না তোলে। কী লিখছিলে তুমি?'

কম্যাণ্ড্যাণ্ট তার মুখের অন্য কোণে সরিয়ে নিল সিগারেটটা, 'অতি বেয়াড়া এক ছোঁড়ার পাল্লায় পড়েছি এদিকে। সেই ঝুখ্রাই লোকটাকে মনে আছে? সেই যে, রেলওয়ের লোকজনদের উস্‌কে তুলেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। লোকটাকে ধরা হয়েছিল স্টেশনে।'

'ধরা হয়েছিল, আচ্ছা? তারপর?' গভীর আগ্রহের সঙ্গে সালোমিগা তার টুলটা আরও কাছাকাছি টেনে নিল।

'তারপরে, স্টেশন কম্যাণ্ড্যাণ্ট ওই নিরেট মুখ্যু ওমেল্‌চেঙ্কোটা তাকে একটা কসাকের পাহারায় পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের কাছে। মাঝপথে এখানে আমার হাতে এই ছোঁড়াটা পরিষ্কার দিনের আলোয় কিনা ছিনিয়ে নিল গ্রেপ্তার করা মানুষটাকে। হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল কসাকটার, তারপর পালিয়ে গেছে। ঝুখ্রাই তো পালিয়েছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে আমরা ধরতে পেরেছি। এই যে, এই কাগজটায় সব লেখা আছে,' বলে সে একতাড়া লেখায় ভর্তি কাগজ সালোমিগার দিকে ঠেলে দিল।

---

* বোগদুনেৎস্ — লাল ফৌজের বোগুন-সেনাবাহিনীর সৈন্য। সপ্তদশ শতকে ইউক্রেনের জনসাধারণ যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেমেছিল, সেই সংগ্রামের নেতা বোগুন-এর নামেই লাল ফৌজের একটা বাহিনীর এই নামকরণ। — সম্পাঃ

বাঁ হাতে কাগজগুলো উল্‌টে উল্‌টে সে পড়ে গেল রিপোর্টটা। পড়া শেষ করে কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে তাকাল সে, 'তাহলে, কিছুই বের করতে পার নি ওর পেট থেকে?'

অস্বস্তির সঙ্গে কম্যাণ্ড্যাণ্ট তার টুপির কানাটা ধরে টান দিল, 'আজ পাঁচ দিন ওর পেছনে লেগে আছি আমি। শুধুই বলে, 'আমি কিচ্ছু জানি না, আমি লোকটিকে ছাড়াই নি।' শয়তানের বাচ্চা! পাহারাওলাটা ওকে চিনতে পেরেছে, বুঝলে? — প্রায় গলা টিপে মেরে ফেলেছিল আর-কি ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। কসাকটাকে তো টেনে ছাড়াতেই পারি নি প্রায় — লোকটার রাগ তো হতেই পারে, কারণ ওমেল্‌চেঙ্কো ওদিকে স্টেশনে তাকে কয়েদী হাতছাড়া করার জন্যে পঁচিশ ঘা কষিয়েছে। ছেলেটাকে আর রাখার কোন মানে হয় না — তাই, আমি ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্টটা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সালোমিগা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে থুতু ফেলল, 'আমার পাল্লায় পড়লে কথা বলত নিশ্চয়। জেরা করার ব্যাপারে তুমি কোন কর্মের নও। ধর্মতত্ত্বের ছাত্রকে আবার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হতে কে কবে শুনেছে? তুমি ডাণ্ডার ব্যবস্থাটা চেষ্টা করেছিলে?'

রাগে ক্ষেপে গেল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ওসব নাক-সিঁটকানি রেখে দাও। আমি এখানকার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে বলছি আমার কাজে নাক গলাতে এসো না।'

সালোমিগা ক্রুদ্ধ কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে চেয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল, 'হাঃ হাঃ হাঃ... অতো ফুলে উঠো না হে পুরুতের পো! শেষে আবার ফেটে যাবে, দেখো! তা, চুলোয় যাও তুমি আর তোমার যতো সব সমস্যা। তার চেয়ে বরং বাৎলাও কয়েক বোতল 'সামোগন' এনে দিতে পারবে কে।'

হাসল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'তা পারা যাবে এখন।'

'আর এই ব্যাপারটায়,' সালোমিগা কাগজের তাড়াটার ওপর আঙুল ঠুকে ঠুকে বলল, 'ছেলেটার সম্বন্ধে ঠিকমতো ব্যবস্থা যদি করতে চাও, তাহলে ওর বয়সটা ষোলো বছরের বদলে আঠারো বছর বলে লেখো। ছ'য়ের মাথাটা এইভাবে ঘুরিয়ে আট করে দাও। তা নইলে ওরা তোমায় অনুমতি না দিতেও পারে।'

* * *

ভাঁড়ারঘরটায় ওরা তিনজন। দাড়িওয়ালা এক বুড়ো, গায়ে পুরনো কোট, দেয়ালে আটকানো কাঠের তক্তাটার ওপর শুয়ে আছে পাশ ফিরে, কাঠির মতো তার পাদুটো চওড়া ছিটের কাপড়ের প্যাণ্টের মধ্যে শরীরের নিচে গুটোনো। তাকে গ্রেপ্তার করার

কারণ — যে-পেৎলিউরার লোকটি তার ওখানে বাসা নিয়েছিল, তার ঘোড়াটা চালা থেকে হারিয়ে গেছে। মেঝের ওপর বসে আছে এক বুড়ি, চঞ্চল ছোট ছোট তার চোখদুটো, সরু থুতনি। চোলাই 'সামোগন' মদ বেচে পেট চালায় ও. একটা ঘড়ি আর অন্য কয়েকটা দামী জিনিস চুরি করার অভিযোগে ওকে এখানে এনে পোরা হয়েছে। জানলার নিচে একটা কোণে চেপ্টে যাওয়া টুপিটার ওপর মাথা রেখে পাভেল পড়ে আছে আধা-অচেতন অবস্থায়।

* * *

একটি অল্পবয়সী মেয়েকে এনে ঢোকানো হল এই ভাঁড়ারঘরে — মেয়েটির মাথায় জড়ানো রঙিন রুমাল, আতঙ্কে বিস্ফারিত তার চোখদুটো। দু'-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে 'সামোগন'-বেচা বুড়ির পাশে বসে পড়ল।

আগন্তুক মেয়েটিকে অদ্ভুত চোখে দেখে নিয়ে বুড়ি দ্রুত উচ্চারণে বলে উঠল, 'কি রে ছুঁড়ি, ধরা পড়েছিস, অ্যাঁ ?'

কোন উত্তর দিল না মেয়েটা, কিন্তু 'সামোগন'-বুড়িটা ছাড়বার পাত্রী নয়, 'ধরল কেন তোকে, অ্যাঁ ? 'সামোগনের' কোন ব্যাপার নাকি, অ্যাঁ ?'

দাঁড়িয়ে উঠে চাষী-মেয়েটা তাকাল এই নাছোড়বান্দা বুড়িটার দিকে। শান্ত স্বরে বলল সে, 'না, আমাকে ধরেছে আমার ভাইয়ের জন্যে।'

'সেটি কে ?' বুড়িটা ছাড়বে না কিছুতেই।

বুড়ো মানুষটি বলে উঠল, 'ওকে ছেড়ে দাও না বাপু। এমনিতেই ওর ভয়-ভাবনার অন্ত নেই—তার ওপরে আবার তুমি বকবক করে জ্বালাও কেন ওকে ?'

বোঁ করে বুড়িটা ঘাড় ফেরাল দেয়ালে আটকানো বাঙ্কের দিকে, 'তা তুমি বলবার কে ? তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি নাকি ?'

থুতু ফেলল বুড়ো, 'ওর পেছনে লেগো না বলছি।'

আরেকবার নৈঃশব্দ নেমে এল ভাঁড়ারঘরটায়, চাষী-মেয়েটা একটা বড়ো রুমাল বিছিয়ে বাহুর ওপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ল।

খেতে শুরু করল 'সামোগন'-বুড়ি। বুড়ো উঠে বসল, মেঝের ওপর পাদুটো রেখে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট তৈরি করে নিয়ে ধরিয়ে নিল সেটা। ঝাঁজালো ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

'এই দুর্গন্ধের জন্য শান্তিতে বসে একটু খাবারও জো নেই,' মুখ ভর্তি খাবার

নিয়ে গবগব করে খেতে খেতে গজগজ করে বলল বুড়ি, 'গোটা ঘরটাই ফুঁকে দেবে দেখছি।'

নাক সিঁটকে পালটা জবাব দিল বুড়ো, 'রোগা হয়ে যাবার ভয় অ্যাঁ? শিগগিরই তো এ দরজা দিয়ে আর বেরুতে হবে না। নিজের পেটে সবটা না ঠেসে ওই ছেলেটাকে একটু কিছু দাও-না খেতে।'

বুড়ি একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল, 'দিতে গিয়েছিলাম তো। কিছু খেতে চায় না যে। আর, দ্যাখো বাপু আমার ব্যাপার যদি বল তো মুখটি বুঁজে থেকো বলে দিচ্ছি — তোমারটা খাচ্ছি নে।'

মেয়েটি 'সামোগন'-বুড়ির দিকে ফিরে করচাগিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে এখানে এনেছে কেন, জানো?'

মেয়েটি কথা বলাতে খুশি হয়ে উঠল বুড়ি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'এখানকার ছেলে ও — করচাগিনার ছোট ছেলে। ওর মা রাঁধুনী।'

তারপর মেয়েটার দিকে ঝুঁকে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল 'একজন কয়েদী বলশেভিককে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ও — লোকটা একজন জাহাজী, আমাদের পড়শী জোজুলিখার বাড়িতে ছিল।'

অল্পবয়সী মেয়েটার মনে পড়ল তার শোনা কথাগুলো, 'ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্টটা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

* * *

সৈন্য-ভর্তি ট্রেনগুলো একে একে এসে থামতে লাগল জংশনে আর তার থেকে দলে দলে এলোমেলোভাবে নামতে লাগল সৈন্যদলভুক্ত লোকেরা। পাশের একটা লাইন বেয়ে এসে দাঁড়াল সাঁজোয়া-রেলগাড়ি 'জাপোরোজেৎস্' — চারটে কামরা তার, ইস্পাতে মোড়া তার চতুর্দিকে বড়ো বড়ো নাচি বসানো। ছাদ-খোলা গাড়িগুলো থেকে নামিয়ে আনা হল কামানগুলো, ছাদওয়ালা মালগাড়ির কামরাগুলো থেকে বের করে আনা হল ঘোড়াগুলোকে। সেইখানেই ঘোড়াগুলোয় জিন এঁটে তাদের পিঠে চেপে ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর লোকেরা পদাতিক-বাহিনীর লোকদের ভীড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল স্টেশনের আঙিনার দিকে যেখানে সারবন্দি হচ্ছে তারা।

অফিসাররা তাদের নিজেদের ইউনিটের নম্বর হেঁকে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

গোটা স্টেশনটায় বোলতার চাকের মতো কর্মতৎপরতা। আকারহীন একটা বিরাট

জনসমষ্টি সোরগোল তুলে পাক খেয়ে যাচ্ছিল — ক্রমশ সেটাকে কতকগুলো সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যদলের রূপ দিয়ে নেওয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারবন্দি বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী ঢুকতে থাকল শহরে। রাত্রি পর্যন্ত শহরের পথে পথে ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল ঘোড়ার গাড়ি আর পশ্চাদবর্তী রাইফেল-বাহিনীর লোকজন বড়ো রাস্তা বেয়ে চলল। সব শেষে এগিয়ে গেল সদর ঘাঁটির ফৌজীদলটা — একশো কুড়ি জন লোক গলা মিলিয়ে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে:

হৈ-হল্লা কেন এত, কিসের হাঁকাহাঁকি?
পেৎলিউরার দল যে এল — সন্দ' আছে নাকি!...

জানলা দিয়ে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল পাভেল। গোধূলির আলো-আঁধারির মধ্যে সে শুনতে পাচ্ছিল রাস্তায় চাকার ঘড়ঘড়ানি, অসংখ্য পায়ের শব্দ আর অনেকগুলি গলায় গেয়ে ওঠা গান।

পেছনে একটা মৃদু গলার স্বর শোনা গেল, 'ফৌজ এসেছে শহরে।'

ঘুরে দাঁড়াল করচাগিন।

যে-মেয়েটিকে আগের দিন এখানে আনা হয়েছে, সেই বলেছিল কথাটা।

ইতিমধ্যে পাভেল শুনেছে মেয়েটির কাহিনী — 'সামোগন'-বুড়ি তাকে বাধ্য করেছে সব কথা বলতে। শহর থেকে চার মাইল দূরে একটা গ্রামে তার বাড়ি। সোভিয়েত যখন ক্ষমতা দখল করে ছিল, তখন সেখানে তার বড়ো ভাই গ্রিৎস্কো গরিব চাষীদের একটা কমিটির নেতৃস্থানীয় ছিল — এখন সে একজন লাল পার্টিজান সৈনিক।

লাল সৈনিকেরা চলে যাবার সময় গ্রিৎস্কোও তাদের সঙ্গে চলে গেছে মেশিনগানের একটা কোমরবন্ধনী পরে। তারপর থেকে পরিবারের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে পেৎলিউরার লোকজন। এদের একমাত্র ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাপকে কিছুদিন কয়েদ করে রেখেছিল—ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল তার। গ্রিৎস্কো যাদের জব্দ করেছিল, তাদের একজন হচ্ছে গাঁয়ের মাতব্বর। সে লোকটা এখন এদের ওপর নেহাত প্রতিশোধ তুলবার জন্যই যতোসব আগন্তুকদের এদের বাড়ি জায়গা নেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। গোটা পরিবারটাই নিঃস্ব। আগের দিন কম্যাণ্ড্যাণ্ট গ্রামে এসেছিল খানাতল্লাশি চালাবার জন্য, গাঁয়ের মাতব্বর তাকে নিয়ে গিয়েছিল এই মেয়েটির বাড়ি! মেয়েটার ওপর নজর পড়ে তার, পরের দিন সে ওকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে আসে 'জেরা করার জন্যে'।

করচাগিনের ঘুম আসে নি, প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার চোখে একটু

বিশ্রামের ঘুম নামে নি। একটা চিন্তা অবিরাম তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'এর পরে কী?' কিছুতেই তাড়াতে পারছে না প্রশ্নটা মন থেকে।

থেঁৎলে যাওয়া তার দেহের সর্বাঙ্গে একটা দারুণ যন্ত্রণার অনুভূতি। সেই পাহারাওলাটা পাশবিক একটা নির্মমতার সঙ্গে তাকে ধরে মেরেছে।

মনের মধ্যে ভিড় জমিয়ে তোলা সেই নিদারুণ চিন্তাগুলোকে ভুলে থাকার জন্য সে এই মেয়ে দু'জনের ফিসফিসিয়ে কথা বলা শুনতে লাগল।

অস্পষ্ট নিচু গলায় অল্পবয়সী মেয়েটি বলছিল কীভাবে কম্যাণ্ড্যাণ্ট তার পেছনে লেগেছে, শাসিয়েছে, ফুসলিয়েছে এবং তার কাছ থেকে পাল্টা জবাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভীষণ রাগে বলে উঠেছে, 'মাটির নিচের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখব তোমাকে, দেখি কী করে সেখান থেকে ছাড়া পাও!'

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে ঘরটার আনাচে-কানাচে। আরেকটা রাত্রি আসছে—দম-আটকানো অস্থিরতায় ভরা রাত্রি। কাল সকালে কী হবে? বন্দী অবস্থায় এই তার সপ্তম রাত্রি, কিন্তু পাভেলের মনে হচ্ছে যেন সে এখানে মাসের পর মাস ধরে কয়েদ হয়ে আছে। শক্ত মেঝেটার ওপর পড়ে আছে পাভেল আর যন্ত্রণা মোচড় দিচ্ছে সর্বাঙ্গে। এখন ওরা তিনজন এই ভাঁড়ারঘরটায়। 'সামোগন'-বুড়িকে খোরুঝিঞ্জ ছেড়ে দিয়েছে ভোদ্‌কা সংগ্রহ করে আনার জন্য। বুড়ো দাদুটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তক্তাটার ওপর—যেন বাড়িতে শুয়ে আছে সে তার রুশী উনুনের উপর। দার্শনিক-সুলভ একটা বৈরাগ্যের সঙ্গে লোকটা তার মন্দ-ভাগ্যকে শান্তভাবে মেনে নিয়েছে, সারারাত্রি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোয় সে। খ্রিস্তিনা আর পাভেল প্রায় পাশাপাশি মেঝের ওপর শুয়ে আছে। গতকাল পাভেল জানলা দিয়ে সের্গেইকে দেখতে পেয়েছিল—অনেকক্ষণ ধরে সে বিষণ্ন চোখে বাড়ির জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপরে।

পাভেল মনে মনে ভেবেছিল, 'ও জানে আমি এখানে আছি।'

তিন দিন ধরে রোজ কে যেন পাভেলের জন্য কালো টক রুটি এনে দিয়ে গেছে—কে তা সান্ত্রীরা কিছুতেই বলে নি। দু'দিন কম্যাণ্ড্যাণ্ট তাকে জেরা করে নি। এসবের মানে কী?

আগের জেরার সময়ে সে কিছুই ফাঁস করে নি, বরং সবকিছু অস্বীকারই করেছে। কেন যে সে মুখ বুজে ছিল, তা সে নিজেই জানে না। বইয়ে পড়া বীর-নায়কদের মতো সে নিজেকে সাহসী আর বলিষ্ঠহৃদয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু সেই রাত্রে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবার সময় একজন সান্ত্রী বলেছিল, 'এটাকে আর টানাটানি করে কী হবে, পান্ খোরুঝিঞ্জ? পিঠে একটি গুলি চালিয়ে দিলেই তো চুকে যায়,'—

তখন ভয় পেয়েছিল পাভেল। হ্যাঁ, ষোল বছর বয়সে মৃত্যুর চিন্তাটা বড়ো সাংঘাতিক! মৃত্যু — অর্থাৎ সবকিছুর শেষ।

খৃস্তিনাও ভাবছে। এই তরুণটি যা জানে না, সে তা জানে। খুব সম্ভবত ও জানে না ওর কপালে কী আছে... যা খৃস্তিনা শুনে ফেলেছিল।

পাভেল সারারাত্রি ঘুমোতে না পেরে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করেছে। পাভেলের প্রতি নিবিড় মমতায় ভরে উঠেছে খৃস্তিনার মন — যদিও তার নিজের জন্য দুর্ভাবনাটাও কম নয়: কম্যাণ্ড্যাণ্টের কথাগুলির নিদারুণ শাসানি সে ভুলতে পারে না, 'কালই তোমার একটা ব্যবস্থা করে ফেলব — আমাকে যদি না চাও, তাহলে সেপাইদের ঘরে পাঠিয়ে দেব তোমায়। কসাকগুলো তোমাকে পেয়ে খুশি হবে। যা হয় বেছে নাও।'

বড়ো কঠিন, বড়ো নির্মম এই পৃথিবী, কোথাও এতটুকু দয়ামায়া নেই! গ্রিৎস্কো যে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছে, সেটা কি তার দোষ? জীবন বড়ো নিষ্ঠুর!

একটা বুক-চাপা বেদনার অনুভূতিতে দম বন্ধ হয়ে এল খৃস্তিনার, অসহায় হতাশায় আর ভয়ের যন্ত্রণায় তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল একটা নিদারুণ কান্নায়।

দেয়ালের কোণে একটা ছায়া নড়ে উঠল, 'কাঁদছ কেন?'

খৃস্তিনা তার এই কয়েদখানার নির্বাক সঙ্গীটির কাছে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার কথা দারুণ আবেগের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলে গেল। কোন কথা বলল না পাভেল, শুধু খৃস্তিনার হাতের ওপর হাত রাখল হালকাভাবে।

ঢোঁক গিলে গিলে চোখের জল চেপে আতঙ্কভরা গলায় বলল খৃস্তিনা, 'আমার ওপর অত্যাচার করে ওই শয়তানগুলো মেরে ফেলবে আমায়, বাঁচার উপায় নেই!'

কী ওকে বলার আছে পাভেলের? কিছু বলার নেই। ওদের দু'জনকেই জীবন যেন একটা লোহার জাঁতাকলে পিষে মারছে।

কাল যখন ওকে নিয়ে যাবার জন্য আসবে, তখন পাভেল কি বাধা দেবার চেষ্টা করবে? সে ক্ষেত্রে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলবে তাকে, কিংবা মাথার ওপরে একটা তলোয়ারের চোট নেমে এলেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ভাবনায় অস্থির এই মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পাভেল তার হাতে আদর করে হাত বুলিয়ে দেয়। কান্নাটা থেমে এল ওর। কিছুক্ষণ পর পর পথ-চলতি লোকের উদ্দেশে দেউড়ির সান্ত্রীটার হাঁক শোনা যাচ্ছে, 'কে যায়?' আর, তারপরেই আবার সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বুড়ো দাদু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে — যেন শেষ নেই। তারপর একসময়, কখন তা পাভেল টের পায় নি — মেয়েটি দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে।

'শোন,' দুটি উষ্ণ ঠোঁট ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আমার তো আর পার নেই: হয় ওই অফিসারটা, আর না হয় ওই সেপাইগুলো। তার চেয়ে, প্রিয়, তুমিই আমাকে নাও — ওই কুত্তাগুলোই যেন সর্বপ্রথম আমার কুমারীত্ব নাশ করতে না পারে।'

'এ কী বলছ খ্রিস্তিনা!'

কিন্তু বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধন থেকে সে মুক্তি পেল না। জ্বলন্ত, পরিপূর্ণ দুটি ঠোঁট চেপে বসল তার ঠোঁটের ওপর — এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সহজ আর কোমল মেয়েটির কথাগুলি — পাভেল জানে কেন ও বলছে এই কথাগুলো।

মুহূর্তের জন্য সে তার পরিবেশ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গেল। তালাবন্ধ দরজা, কটা-চুলওয়ালা সেই কসাক, কম্যাণ্ড্যাণ্ট, নির্মম প্রহার, সাতটি রুদ্ধশ্বাস বিনিদ্র রাত্রি — সবকিছু ভুলে গেল সে। সেই মুহূর্তের জন্য সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রইল শুধু সেই জ্বলন্ত ঠোঁটদুটি আর চোখের জলে ভেজা সেই মুখখানি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তোনিয়াকে।

'কী করে সে ভুলে যেতে পারল তোনিয়াকে, তার আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখদুটোকে?'

দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিজেকে ছিনিয়ে নিল সে খ্রিস্তিনার বাহুবন্ধন থেকে। দাঁড়িয়ে উঠে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে চেপে ধরল জানলার শিকগুলো।

খ্রিস্তিনা হাতড়ে হাতড়ে এসে ধরল তাকে, 'কেন, কী হল?'

তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই একটি প্রশ্নে। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতদুটো চেপে ধরে বলে উঠল পাভেল, 'তা হয় না খ্রিস্তিনা। তুমি এতো... এতো ভাল।' এছাড়া আরও যে কী সব পাভেল বলেছিল, তা সে নিজেও জানে না।

অসহ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে আটকানো বাংকটার দিকে এল — একধারে বসে সে জাগিয়ে তুলল বুড়োকে, 'একটা সিগারেট দাও আমাকে, দাদু!'

সর্বাঙ্গ শালে জড়িয়ে মেয়েটা কোণে বসে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন কয়েক জন কসাকের সঙ্গে এসে কম্যাণ্ড্যাণ্ট খ্রিস্তিনাকে নিয়ে গেল। বিদায়ের দৃষ্টিতে সে তাকাল পাভেলের দিকে, অভিযোগ-ভরা তার চাউনি। ও চলে যাবার পর যখন দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল, তখন পাভেলের সমস্ত মন আরও নিবিড় একটা বেদনায় আর নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠল।

সারাদিনে বুড়ো দাদু পাভেলের মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারল না। কম্যাণ্ড্যাণ্টের পাহারাওলা আর সান্ত্রী বদল হল। সন্ধ্যার দিকে একজন নতুন বন্দীকে

এনে ঢোকানো হল এই ঘরে। পাভেল তাকে চিনতে পেরেছে: চিনি-কারখানার ছুতোর দোলিন্নিক। একটু খাটো, বলিষ্ঠ চেহারা, দেহের গড়নটা শক্ত, পুরানো একটা কোর্তার নিচে ফিকে হয়ে আসা হলদে একটা শার্ট্ তার পরনে। তীক্ষ্ম চোখে সে খুঁটিয়ে দেখল ভাঁড়ারঘরটা।

পাভেল তাকে দেখেছিল ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে যখন বিপ্লবের ঢেউ তাদের শহরেও এসে পেঁৗছেছে। সেই সময়ের সোরগোলের সভা-মিছিলে পাভেল মাত্র একজন বলশেভিককেই বক্তৃতা দিতে শুনেছে এবং সেই বলশেভিকটি হচ্ছে দোলিন্নিক। রাস্তার ধারে একটা বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সে সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিল। তার শেষ কথাগুলো মনে আছে পাভেলের, 'বলশেভিকদের পথে চলো সৈনিক ভাইসব, তারা কখনও তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না!'

তারপর থেকে সে আর ছুতোরটিকে দেখে নি।

কয়েদখানায় এই নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে বুড়ো দাদু খুশি হয়ে উঠেছে— সারাদিন নিশ্চুপ বসে কাটানোটা যে তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল সেটা বোঝা যায়। দোলিন্নিক তার পাশে তক্তাটার ধারে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর সিগারেট খেতে খেতে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল।

তারপরে এই আগন্তুকটি এল করচাগিনের কাছে। পাভেলকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমাকে এখানে আসতে হল কেন?'

পাভেল 'হ্যাঁ,' 'না' করে জবাব দিচেছ দেখে দোলিন্নিক বুঝল যে সাবধানতার খাতিরেই তরুণটি বিশেষ কথা বলতে চাচ্ছে না। পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগটা শোনার পর তার বুদ্ধিভরা চোখদুটি বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠল। ছেলেটার পাশে এসে বসল সে, 'ও, তুমিই তাহলে ঝুখ্রাইকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলে বলছ? ভারি আশ্চর্য তো। এরা যে তোমায় পাকড়েছে, সেটা জানতাম না আমি।'

কথাটা জানাজানি হয়ে যাচ্ছে বুঝে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে পাভেল বলল, 'আমি কোন ঝুখ্রাই-টুখ্রাইকে চিনি না। এরা তো এখানে যে কোন অভিযোগই আনতে পারে।'

দোলিন্নিক হেসে সরে এল তার দিকে, 'ঠিক আছে, ভাই। আমার কাছে তোমার অতো সাবধান হবার দরকার নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

বুড়ো দাদুটি যাতে শুনতে না পায়, সেইভাবে নিচুগলায় সে বলে গেল, 'ঝুখ্রাইকে আমি নিজেই রওনা করে দিয়েছি, এতক্ষণে সে বোধহয় যেখানে যাবার সেখানে পেঁৗছে গেছে। সে আমাকে ঘটনাটা সবই বলেছে।'

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন একটু ভেবে দোলিনিক বলল, 'তুমি দেখছি খাঁটি জিনিসে তৈরি — তবে এরা তোমাকে ধরে ফেলেছে আর সবকিছু জানে, সেটা খারাপ বটে — খুবই খারাপ।'

কোর্তাটা খুলে ফেলে দোলিনিক সেটাকে বিছিয়ে নিল মেঝের ওপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে সেটার ওপর বসে সে আরেকটা সিগারেট বানাতে লাগল।

তার শেষ কথাটায় পাভেলের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। দোলিনিক যে খাঁটি লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, সে ঝুখ্রাইকে রওনা করে দিয়েছে, তার মানেই...

সেই সন্ধ্যায় পাভেল জানতে পারল — পেৎলিউরার কসাক-সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলন চালাবার জন্য দোলিনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া, সে ধরা পড়ে হাতে-নাতে — সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করে লাল সৈনিকদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য আবেদন জানিয়ে জেলার বিপ্লবী কমিটি যে ইশ্‌তেহার বের করেছিল, সেটা বিলি করার সময়ে।

দোলিনিক সাবধান ছিল, পাভেলকে সে বেশি কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল সে, 'কে জানে, হয়তো ওরা ছেলেটার ওপর ডাণ্ডা চালাতে পারে — ও এখনও নেহাত ছেলেমানুষ।'

রাত্রি গড়িয়ে গেলে যখন ওরা ঘুমোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন সে তার আশঙ্কার কথাটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল, 'আমরা বড়ো বেকায়দায় পড়ে গেছি, বুঝলে করচাগিন। দেখা যাক, কদ্দূর কি হয়।'

পরের দিন একজন নতুন কয়েদীকে এনে পোরা হল — বড় কানওয়ালা, ঘাড়-লিকলিকে নাপিত শ্লিওমা জেলৎসার। মহা উত্তেজনার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সে বলছিল দোলিনিককে, 'ফুক্‌স্‌, ব্লুভস্তেইন্‌ আর ত্রাখ্‌তেন্‌বের্গ্‌ তো লোকটাকে নুন আর রুটি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে বলে ঠিক করেছে। আমি বললাম, ওরা যদি তা করতে চায় তো করুক, কিন্তু ইহুদীদের আর-সবাই কি ওদের সমর্থন করবে? মোটেই করবে না—এই আমি বলে রাখলাম তোমায়। এদের তিনজনের অবশ্য নিজেদের ঘর সামলাতে হবে: ফুক্‌স্‌-এর দোকান আছে, ত্রাখ্‌তেন্‌বের্গের ময়দা-কল আছে — কিন্তু আমার আছে কী? আর-সবাই যারা উপোস করে মরছে, তাদের আছে কী? কিচ্ছু নেই। নিঃস্ব আমরা সব্বাই। আমার আবার জিভটা তো একটু আলগা। আজ একজন অফিসারের দাড়ি কামাচ্ছিলাম — ওই নতুন যারা দু'একদিনের মধ্যে শহরে এসেছে, তাদেরই একজন — জিজ্ঞেস করলাম, 'আতামান পেৎলিউরা এই ইহুদী-ঠেঙানোর ব্যাপারটা জানেন নাকি? আপনার কি মনে হয় তিনি দেখা করবেন প্রতিনিধিদলের

সঙ্গে ?' হায়, হায় — আমার এই আলগা জিভের জন্যে কতবার যে বিপদে পড়তে হয়েছে! এতো কায়দা আর তরিবত করে অফিসারটার দাড়ি কামিয়ে মুখে পাউডার ঘষে দেবার পর সে কী করলে জানো? উঠে দাঁড়িয়ে পয়সা দেবার বদলে লোকটা আমায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে গ্রেপ্তার করল!'

বুকে একটা চাপড় মারল জেলৎসার, 'আন্দোলনটা কী করলাম বলো দেখি? কী বলেছি কথাটা? শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছি লোকটাকে আর তারই জন্যে কিনা জেলে?..'

উত্তেজনার চোটে জেলৎসার দোলিম্বিকের শার্টের একটা বোতাম টেনে ধরে তার বাহুতে টান দিতে থাকল।

ক্রুদ্ধ শ্লিওমার কথা শুনতে শুনতে দোলিম্বিক অজানতেই হেসে ফেলল। নাপিতের কথা শেষ হবার পর সে গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মতো এরকম একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কাজটা একটু বোকার মতোই হয়ে গেছে বটে। ওই অবস্থায় জিভটাকে আলগা হতে দিয়ে একটা বেমক্কা কাজ করে ফেলেছ। আমি হলে তোমাকে ওইভাবে এখানে এসে পড়ার পরামর্শ দিতাম না।'

জেলৎসার সমর্থনসূচক মাথা নেড়ে হাত ছড়িয়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল। ঠিক সেই সময়ে দরজাটা খুলে গেল আর বাইরে থেকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'সামোগন'-বুড়িকে। কসাক-সেপাইটার দিকে ইতর গাল পাড়তে পাড়তে বুড়ি ভেতরে এসে পড়ল, 'আগুনে পুড়ে মর্ তোরা আর তোদের ওই কম্যাণ্ড্যাণ্ট! আমার এনে দেওয়া ওই মদ খেয়ে ও যেন টেঁসে যায়!'

দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল পাহারাওলাটা, বাইরে তালাবন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বুড়ি তক্তাটার এক পাশে বসার পর বুড়ো তাকে কৌতুক করে বলল, 'এই যে বক্‌বক্‌-করুনেওয়ালী বুড়ি, আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছ দেখতে পাচ্ছি, এ্যাঁ? আচ্ছা, বোসো তাহলে আরাম করে।'

শত্রুতাভরা চোখে তার দিকে একনজর তাকিয়ে বুড়ি তার পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপর দোলিম্বিকের পাশে বসল। দেখা গেল, অফিসারদের জন্য কয়েক বোতল 'সামোগন' জোগাড় করতে যতক্ষণ লাগে, শুধু ততক্ষণের জন্যই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎ পাশে সেপাইদের ঘরটা থেকে চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ ভেসে এল। কে যেন কর্কশ স্বরে হুকুম দিচ্ছে। কয়েদীরা সকলে ব্যাপারটা শোনার জন্য দরজার দিকে মাথা ঘোরাল।

* * *

প্রাচীন ঘণ্টা-ঘরের দেখতে-বিশ্রী গির্জাটার সামনের মাঠে ইতিমধ্যে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। মাঠটার তিনদিকে আয়তক্ষেত্রের আকারে সারি বাঁধা ফৌজের বহর — পুরোদস্তুর সামরিক পোশাকে আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী।

সামনে, গির্জার প্রবেশপথের মুখে বর্গক্ষেত্রের আকারে সারিবাঁধা চৌখুপীর ছকে তিনটে পদাতিক পল্টন পাশের স্কুলের বেড়াটা অবধি পর পর সাজানো।

রাইফেল ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর আর নোংরা পেৎলিউরার পল্টন — মাথায় তাদের আজব রাশিয়ান হেল্‌মেট্‌, অনেকটা আধাআধি কাটা কুমড়োর মতো দেখতে। বুকে কার্তুজের বেল্ট আড়াআড়ি লাগানো। এরাই পেৎলিউরার সেরা ডিভিশনের সৈন্য।

ভূতপূর্ব জারের সৈন্যবাহিনীর গুদাম থেকে হাতিয়ে নেওয়া এদের উর্দিগুলো আর বুট বেশ ভাল। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যারা সচেতনভাবে লড়াই করছে, এদের লোকজন প্রধানত সেই কুলাক্‌দের মধ্যে থেকেই নেওয়া। স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই রেল-জংশনটাকে রক্ষা করবার জন্যই ডিভিশনটাকে এখানে বদলি করা হয়েছে।

শেপেতোভ্‌কা শহরে এসে মিশেছে পাঁচটা রেলপথ — পেৎলিউরার পক্ষে এই জংশনটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানেই সর্বনাশ। বাস্তবিকপক্ষে, এই ডিভিশনের হাতে ইদানীং খুব সামান্য জায়গাই আছে, ছোট্ট ভিনিৎসা শহরটা এখন পেৎলিউরার রাজধানী।

প্রধান আতামান নিজে তার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করবে বলে স্থির করেছে। সবকিছু প্রস্তুত হয়ে আছে তার আসার অপেক্ষায়।

মাঠটার দূরের এক কোণে যেখানে তাদের দেখতে পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, সেইখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন রঙ্‌রুটের একটা দল — বিভিন্ন রকমের ঢিলেঢালা বেসামরিক পোশাক-পরা, খালি-পা একদল তরুণ। এরা সব খামারে কাজ-করা ছেলের দল — মাঝরাত্রে গিয়ে হামলা চালিয়ে এদের ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে কিংবা রাস্তা থেকে ধরে আনা হয়েছে। লড়াই করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে এদের কারুর নেই।

নিজেদের মধ্যে এরা বলাবলি করছে, 'আমরা তো আর পাগল নই।'

পাহারাওয়ালা দিয়ে এদের শহরে আনিয়ে বিভিন্ন পল্টনে ভাগ করে দিয়ে

হাতিয়ার হাতে দেওয়া ছাড়া এদের নিয়ে পেৎলিউরার অফিসাররা আর কিছুই করে উঠতে পারে নি।

পরের দিনই অবশ্য এইভাবে জড়ো করা এই রঙরুটদের এক-তৃতীয়াংশ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং প্রতিদিনই এদের সংখ্যা কমে আসছে।

এদের বুটজুতো দেওয়াটা হবে বোকামিরও বাড়া, বিশেষ করে যখন বুটজুতোর সংখ্যা নিতান্তই কম। অবশ্য সবাইকেই সৈন্যদলভুক্ত হবার জন্য উপযুক্ত রকম 'পাদুকা' পরে আসবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তার ফলটা হয় আশ্চর্যরকম: পাদুকা বলতে কতকগুলো ছেঁড়া, পচা চামড়ার সঙ্গে সুতো আর তারের একটা বিচিত্র সংগ্রহ!

অতএব, এদের খালি পায়েই কুচকাওয়াজের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

পদাতিক পল্টনের পেছনেই গোলুবের ঘোড়সওয়ার-বাহিনী।

কুচকাওয়াজ দেখবার জন্য কৌতূহলী শহরবাসীদের জমাট ভীড় ঠেকিয়ে রাখছে ঘোড়সওয়ারেরা।

কম কথা নয়, স্বয়ং প্রধান আতামান উপস্থিত থাকবেন! এ-ধরনের ঘটনা শহরে বড়ো একটা ঘটে না, সুতরাং কেউই বিনা পয়সায় মজা দেখার এই সুযোগ নষ্ট করতে চায় না।

গির্জার সিঁড়ির ওপর জড়ো হয়েছে কর্নেল আর ক্যাপ্টেনরা, পাদ্রীর দুই মেয়ে, জনকতক ইউক্রেনীয় শিক্ষক, একদল 'স্বাধীন' কসাক, আর স্থানীয় পৌরপ্রধান, যার পিঠটা অল্প একটু কুঁজো — এক কথায় বলতে গেলে শহরের 'সমাজের' প্রতিনিধি — স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই, এদের মধ্যে চেরকেস্কা-পরা পদাতিক পল্টনের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল। সে-ই আজকের এই কুচকাওয়াজের পরিচালক।

গির্জার ভেতরে পাদ্রী ভাসিলি ইস্টার পরবের পোশাক-আশাক পরছেন।

পেৎলিউরাকে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সংবর্ধনা জানানো হবে। বিশেষ করে এই নতুন রঙরুটের দলকে আজ আনুগত্যের শপথ নেওয়ানো হবে বলে একটা হলদে-আর-নীল পতাকা আনা হয়েছে।

একটা ঝরঝরে পুরনো 'ফোর্ড' মোটরগাড়িতে চেপে ডিভিশনটার সেনাপতি স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল পেৎলিউরাকে অভ্যর্থনা করার জন্য।

সে চলে যাবার পর, লম্বা, মজবুত গড়ন, পাকানো-গোঁফওয়ালা কর্নেল চেরনিয়াককে ডেকে পদাতিক বাহিনীর ইন্স্পেক্টর বলল, 'আপনার সঙ্গে একজন কাউকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখে আসুন কম্যাণ্ড্যাণ্টের অফিসটা ঠিক কেতাদুরস্ত আছে কিনা আর সেখানকার সব কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে কিনা। যদি সেখানে কোন কয়েদী দেখেন, তাহলে দেখে-শুনে আজেবাজে লোকদের ছেড়ে দেবেন।'

চের্নিয়াক পায়ে পায়ে খট্ করে জুতো ঠুকল, তারপর প্রথমেই যে কসাক ক্যাপ্টেনটি তার চোখে পড়ল তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ইন্স্পেক্টরমশাই তারপর পাদ্রীর মেয়েটার দিকে ফিরে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ভোজসভার খবর কি ? সব ঠিক আছে তো ?'

সুপুরুষ ইন্স্পেক্টরমশাইয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কম্যাণ্ড্যাণ্ট যতদূর করবার সব করছে।'

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল: একজন সওয়ার ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। হাতটা নেড়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'আসছেন ওঁরা !'

'সামিল হো !' গাঁক গাঁক করে উঠল ইন্স্পেক্টর।

অফিসাররা ছুটল নিজের নিজের জায়গায়।

গির্জার কাছে এসে 'ফোর্ড' গাড়িটা থামতেই, 'ইউক্রেন এখনও মরে নি' গানের সুরে ব্যাণ্ড বেজে উঠল।

ডিভিশন-সেনাপতির পরেই গাড়িটা থেকে প্রধান আতামান তার ভারি দেহটা টেনে নামল কষ্টেসৃষ্টে। পেৎলিউরার দেহের উচ্চতা মাঝারি গোছের, লাল ঘাড়ের ওপরে বেঢপ মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো। মিহি পশমের একটা নীল জোব্বা তার পরনে, কোমরের কাছে হলদে রঙের বন্ধনী আঁট করে জড়ানো, বন্ধনীটায় বাঁধা একটা শ্যাময়া চামড়ার খাপের মধ্যে ছোট ব্রাউনিং-পিস্তলটা ঝুলছে। মাথার ওপরে চুড়োওয়ালা একটা খাকি উর্দি-টুপি, তার সামনের দিকটায় এনামেলের ত্রিশূল-চিহ্ন বসানো।

সিমন পেৎলিউরার চেহারায় এমন কিছু একটা জঙ্গী ভাব নেই। বাস্তবিকপক্ষে, তাকে দেখে মোটেই সামরিক লোক বলে মনে হয় না।

মুখে একটা অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে সে ইন্স্পেক্টরের রিপোর্ট শুনল। তারপরে পৌরপ্রধান তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিল।

পৌরপ্রধানের মাথার ওপর দিয়ে সারি-বাঁধা ফৌজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে শুনে গেল পেৎলিউরা।

তারপরে ইন্স্পেক্টরের দিকে মাথা নাড়ল সে, 'এবার শুরু করা যাক !'

নিশানটার পাশে ছোট মঞ্চটার ওপরে উঠে পেৎলিউরা ফৌজের উদ্দেশে দশ মিনিট বক্তৃতা দিল।

বক্তৃতাটা বিশেষ প্রত্যয় জাগাবার মতো কিছু হল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, আতামান এতখানি রাস্তা এসে ক্লান্ত, তাই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা করতে পারল না। সৈন্যদের নিয়মমাফিক 'জয়তু ! জয়তু !' চিৎকারের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করে সে

মঞ্চ থেকে নেমে এল রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। তারপরে ইন্‌স্পেক্টর আর সেনাপতির সঙ্গে সে ফৌজ পরিদর্শনে এল।

নতুন রঙরুটদের সারির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাচ্ছিল্যে ভরে উঠল তার চোখদুটো, বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়াল সে।

সারি সারি নতুন রঙরুটের দল অসমান পা ফেলে ফেলে নিশানটার দিকে এগিয়ে এল। নিশানটার কাছে পাদ্রী ভাসিলি বাইবেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রথমে তিনি বাইবেলটার ওপরে আর তারপরে নিশানের মুড়িতে চুমো খেতে দিলেন তাদের। আর তখনই পরিদর্শনের শেষের দিকে ঘটল অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা।

কি এক অজ্ঞাত উপায়ে মাঠে ঢুকে পড়ে একটা প্রতিনিধিদল পেৎলিউরার দিকে এগিয়ে এল। দলের সামনে চলেছে কাঠের ব্যবসাদার ধনী ব্লুভস্তেইন নুন আর রুটি উপহার নিয়ে, তার পেছনে বস্ত্রব্যবসায়ী ফুক্‌স্‌ আর অন্য তিনজন বড়লোক ব্যবসাদার।

মাথা নিচু করে একটা দাসোচিত সেলাম ঠুকে ব্লুভস্তেইন থালাটা দিল পেৎলিউরার দিকে। পাশের একজন অফিসার সেটা হাত বাড়িয়ে নিল।

'রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আপনার প্রতি স্থানীয় ইহুদী বাসিন্দারা তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। দয়া করে এই মানপত্রটি গ্রহণ করুন।'

'বেশ,' বিড়বিড় করে বলে পেৎলিউরা তাড়াতাড়ি কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেল।

ফুক্‌স্‌ এগিয়ে এল, 'আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের উদ্যোগ আবার খুলবার অনুমতি দিন। দাঙ্গার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' আমতা-আমতা করে ফুক্‌স্‌ বলে ফেলল 'দাঙ্গা' শব্দটা।

একটা ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটিতে অন্ধকার হয়ে উঠল পেৎলিউরার মুখ, 'আমার সৈন্যরা দাঙ্গা করে বেড়ায় না, মনে রাখবেন।'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বাহু বিক্ষেপ করল ফুক্‌স্‌।

পেৎলিউরার কাঁধটা একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় সংকুচিত হল—অসময়ে এই প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি তাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে গোলুব তার কালো গোঁফ কামড়াচ্ছিল। তার দিকে ফিরে পেৎলিউরা বলল, 'পান্ কর্নেল, আপনার কসাকদের বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ এসেছে। ব্যাপারটা তদন্ত-করে যা ব্যবস্থা করতে হয় করুন।' তারপর ইন্‌স্পেক্টরের দিকে ফিরে শুকনো গলায় বলল, 'কুচকাওয়াজ আরম্ভ করতে পারেন এবার।'

মন্দভাগ্য প্রতিনিধিদল এখানে এসে গোলুবকে দেখতে পাবে বলে আশা করে নি, তাই এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টা করল।

এতক্ষণে অনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি দর্শকদের সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছে। উচ্চকিত গলায় নির্দেশ জারি হতে শুরু হয়েছে।

গোলুব বাইরে একটা শান্ত ভাব নিয়ে ব্রুভস্তেইনের দিকে এগিয়ে এসে জোরে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বেরো এখান থেকে, হতভাগা কাফের। নইলে কিমা বানিয়ে ছাড়ব তোদের!'

ব্যাণ্ড বাজতে শুরু করল, সামনের দলগুলো কুচকাওয়াজ করে গেল মাঠের মাঝখান দিয়ে। পের্গেলিউরার সামনে দিয়ে পরপর যাবার সময় তারা যান্ত্রিকভাবে হেঁকে উঠল 'জয়তু'! তারপর বড়ো সড়কে নেমে পড়ে একে একে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এক-একটা সৈন্যদলের সামনে আনকোরা নতুন খাকি রঙের উর্দি-পরা অফিসাররা তাদের হাতের ছড়িগুলো দুলিয়ে হালকা চালে হেঁটে চলেছে — ভাবখানা যেন তারা এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সৈন্যদের বন্দুকে শিক ব্যবস্থাটার মতোই এই কায়দা করে ছড়ি দুলিয়ে চলার চালটাও ডিভিশনে সবে চালু হয়েছে।

কুচকাওয়াজের শেষের দিকটায় রাখা হয়েছে নতুন রঙরুটদের দলটাকে। এলোমেলোভাবে সারি বেঁধে, অসমানভাবে পা ফেলে, পরস্পরের গায়ে ধাক্কা মেরে এগিয়ে আসছে তারা।

সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের খালি-পা ফেলার একটা মৃদু আওয়াজ উঠল — এদের চলার মধ্যে কোনমতে একটা শৃঙ্খলার ভাব আনবার জন্য অফিসাররা বৃথাই প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে। এদের দ্বিতীয় দলটা কুচকাওয়াজ করে যাবার সময় মণ্ডটার কাছাকাছি একটা সারিতে সাদা কাপড়ের শার্ট পরা একটি চাষী-ছেলে প্রধান আতামানের দিকে বড়ো বড়ো চোখে হাঁ করে তাকিয়ে এতোই আশ্চর্য হয়ে গেল যে পথের ওপর একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পাথরে ঠুকে গিয়ে একটা জোরালো আওয়াজ তুলে ছিটকে পড়ল তার রাইফেলটা। উঠবার চেষ্টা করতেই সে তার পেছনের লোকদের ধাক্কায় আবার পড়ে গেল।

দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপরে সারি ভেঙে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে রঙরুটদের এই দলটা মাঠ পার হয়ে গেল। হতভাগ্য ছেলেটা তার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল নিজের দলের পিছু ধরতে।

পের্গেলিউরা আর এই কিম্ভূত দৃশ্যটা না দেখে মুখ ঘুরিয়ে কুচকাওয়াজে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই চলে এল মোটরগাড়ির দিকে। পেছন পেছন এসে ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞেস করল, 'পান্ আতামান কি ভোজে উপস্থিত হবেন না?'

সংক্ষেপে তীক্ষ্ন উত্তর দিল পের্গেলিউরা, 'না!'

গির্জাটাকে ঘেরাও করা উঁচু বেড়াটার গায়ে চেপে গিয়ে সের্গেই ব্রুঝাক, ভালিয়া আর ক্লিমকা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ দেখছিল।

বেড়াটার শিকগুলো চেপে ধরে মাঠের মধ্যে লোকদের দিকে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সের্গেই।

ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উদ্ধত স্বরে বলল সে, 'চল্ রে ভালিয়া, দোকানপাট গুটিয়ে নিয়েছে।'

বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল বেড়াটার কাছ থেকে। অবাক হয়ে কিছু লোক তার দিকে তাকিয়ে রইল। সবাইকে উপেক্ষা করে সে তার বোন আর ক্লিমকার সঙ্গে চলে গেল গেটের দিকে।

* * *

কর্নেল চের্নিয়াক আর সেই ক্যাপ্টেনটি ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে কম্যান্ড্যান্টের অফিসে নামল। একজন পেয়াদার তদ্বিরে ঘোড়াদুটো রেখে দ্রুতপায়ে তারা এসে ঢুকল সান্ত্রীদের ঘরে।

পেয়াদাটিকে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল চের্নিয়াক, 'কম্যান্ড্যান্ট কোথায় ?'

থতোমতো খেয়ে বলল লোকটি, 'জানি না, কোথায় যেন গেছেন।'

নোংরা অগোছালো ঘরটার চারিদিকে তাকাল চের্নিয়াক — ছড়ানো-ছিটানো বিছানাগুলোর ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে কম্যান্ড্যান্টের কসাক-সান্ত্রীগুলো, অফিসারদের ঢুকতে দেখে তাদের কারও ওঠার কোন চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না।

গর্জন করে উঠল চের্নিয়াক, 'শুয়োরের খোঁয়াড় এটা, নাকি ? আর, এভাবে শুয়োরের মতো গড়াগড়ি দেবার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের ?' চিৎপাত হয়ে গা এলিয়ে দেওয়া লোকদের দিকে খেঁকিয়ে উঠল চের্নিয়াক।

একজন কসাক উঠে বসে একটা ঢেঁকুর তুলে বিরক্তিভরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, 'তুমি আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করলে কেন ? চেঁচামেচি করার লোক তো আমাদের এখানেই আছে।'

'কী বল্লি !' লাফিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল চের্নিয়াক, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে বেজম্মা ? আমি কর্নেল চের্নিয়াক, বুঝলি রে শুয়োর ? ওঠ্, উঠে পড়্ সবাই, নইলে চাবুক খাওয়াব তোদের !' ক্রুদ্ধ কর্নেল সান্ত্রীদের ঘরময় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল, 'এক মিনিট সময় দিলাম — এর মধ্যে নোংরা ঝাড়ু দিয়ে, বিছানাপত্র গুছিয়ে নিয়ে নোংরা চোপাগুলো মানুষের সামনে দাঁড় করাবার মতো করে তোল্। এক দল লুটেরা-ডাকাত বলে মনে হচ্ছে দেখে তোদের, কসাক নয় !'

রাগে আত্মহারা হয়ে কর্নেল তার পথের ওপরে পড়ে থাকা একটা ময়লা জলের পাত্রে প্রচণ্ড লাথি মারল।

ক্যাপ্টেনটাও কিছু কম যায় না — গালাগালগুলোকে আরও জোরালো করে তুলবার জন্য সে তার তিন-ফালি চাবুকটাকে চালিয়ে লোকগুলোকে তাদের বিছানা থেকে তুলে দিল, 'প্রধান আতামান কুচকাওয়াজ দেখছেন। যেকোন মুহূর্তে তিনি এখানে এসে পড়তে পারেন। তৈরি হয়ে নাও সব, জলদি!'

ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে কসাকরা সবাই লাফিয়ে উঠে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল — সত্যিই তাদের চাবুক খেতে হতে পারে, এ ব্যাপারে চের্নিয়াকের খ্যাতির কথাটা তারা জানে। মুহূর্তের মধ্যে দারুণ কাজের সাড়া পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বলল, 'কয়েদীগুলোকে একবার দেখে নিলে ভাল হয়। কাদের যে ধরে বন্ধ করে রেখেছে কিছুই বলা যায় না। প্রধান আতামান যদি দেখতে আসেন, তাহলে ফ্যাসাদ হতে পারে।'

'চাবিটা কার কাছে?' চের্নিয়াক জিজ্ঞেস করল সান্ত্রীটাকে, 'এক্ষুনি খুলে দাও দরজাটা।'

একজন সার্জেন্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তালাটা খুলে দিল।

'কম্যান্ড্যান্ট কোথায়? কতক্ষণ আর আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব? এক্ষুনি তাকে খুঁজে বের করে এখানে পাঠিয়ে দাও,' হুকুম দিল চের্নিয়াক। 'দেউড়ির সামনে সান্ত্রীদের সারবন্দি করে দাও! রাইফেলগুলোয় বেয়নেট লাগানো নেই কেন?'

'আমরা তো সবেমাত্র কাল এখানে এসেছি,' তাড়াতাড়ি কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে সার্জেন্টটি কম্যান্ড্যান্টের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা লাথি মেরে খুলে ফেলল ক্যাপ্টেন। ভেতরের কয়েকজন কয়েদী মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল, বাকি ক'জন স্থির হয়ে শুয়ে রইল।

'দরজাটা আরও ভাল করে খুলে দাও,' হুকুম দিল চের্নিয়াক, 'যথেষ্ট আলো নেই এখানে।'

তারপরে কয়েদীদের মুখগুলো ভালো করে দেখল সে। বাঙ্কের ধারে বসা বুড়ো মানুষটার দিকে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?'

আধা দাঁড়িয়ে উঠে ঢিলে প্যান্ট আঁট করতে করতে চের্নিয়াকের কড়া হুকুমে ঘাবড়ে গিয়ে বুড়ো থতোমতো খেয়ে বলল, 'আমি নিজেই সেটা জানি না। স্রেফ ধরে এনে পুরে দিয়েছে। উঠোন থেকে একটা ঘোড়া হারিয়ে যায়, কিন্তু আমি তার কিছু জানি না।'

'কার ঘোড়া?' তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'ফৌজের ঘোড়া। আমার বাড়িতে যে সেপাইগুলো আছে তারাই সেটাকে বিক্রি করে দিয়ে সেই পয়সায় মদ-টদ খেয়েছে আর এখন আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে।'

চের্নিয়াক বুড়োর সর্বাঙ্গে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে একবার কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' তারপরে সে 'সামোগন'-বুড়ির দিকে ফিরল।

বুড়ো তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না — ক্ষীণদৃষ্টি চোখদুটো পিটপিট করে সে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে, আমি যেতে পারি?'

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ল, যার অর্থ: যতো তাড়াতাড়ি পারো ততোই ভাল।

বাঙ্কের একপাশে তার পুঁটলিটা ঝুলছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়েই বুড়ো ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

'তারপর, তুমি গ্রেপ্তার হলে কেন?' চের্নিয়াক প্রশ্ন করল 'সামোগন'-বুড়িকে।

একমুখ খাবার চিবুচ্ছিল বুড়ি, সেটাকে গিলে ফেলে সে গড়গড় করে উত্তর দিয়ে গেল, 'অন্যায়রকমভাবে — অত্যন্ত অন্যায়রকমভাবে আমাকে এনে এখানে পুরেছে ওরা, পান্ কর্তা। ভেবে দেখুন একবার — গরিব বিধবার 'সামোগন' খেয়ে শেষে কিনা তাকেই এনে তালাবন্ধ করে রাখা!'

চের্নিয়াক জিজ্ঞেস করল, ' 'সামোগনের' কারবার কর নাকি তুমি?'

আহত ভঙ্গিতে বলল বুড়ি, 'কারবার? মোটেই না। কম্যান্ড্যান্ট এসেই চার-চারটে বোতল তুলে নিল, একটা পয়সাও ঠেকাল না। ব্যাপারটা কী রকম বলি শুনুন: অন্যের তৈরি মদ খাবে, কিন্তু দাম দেবে না কক্ষনো। এটাকে কি আপনি কারবার করা বলবেন?'

'খুব হয়েছে, যা ভাগ্ এখান থেকে!'

আর দ্বিতীয় বার হুকুমটা শোনার জন্য দাঁড়াল না বুড়ি। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে, কৃতজ্ঞতার সেলাম ঠুকতে ঠুকতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে বলল, 'ভগবান মঙ্গল করুন কর্তামশাইদের!'

অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখে মজাটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল দোলিন্নিক। কয়েদীদের কেউ বুঝতে পারছিল না ব্যাপারখানা কী। এইটুকুই শুধু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই আগন্তুকরা নিশ্চয়ই কোনকিছু কর্তাব্যক্তি গোছের হবে, যারা ইচ্ছে করলেই কয়েদীদের ছেড়ে দিতে পারে। 'আর, তুমি?' চের্নিয়াক দোলিন্নিককে প্রশ্ন করল।

ক্যাপ্টেনটা খেঁকিয়ে উঠল, 'পান্ কর্নেল যখন কথা কইবেন তখন উঠে দাঁড়াবে!'

ধীরে ধীরে দোলিন্নিক মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল।

চের্নিয়াক আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে ধরা হয়েছে কেন?'

দোলিন্নিক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কর্নেলের নিখুঁতভাবে পাকানো গোঁফের

দিকে, তার পরিষ্কার করে কামানো মুখের দিকে, তারপরে কর্নেলের নতুন টুপি আর তাতে আটকানো এনামেলের ত্রিশূলের দিকে। একটা বেপরোয়া চিন্তার ঝিলিক খেলে গেল তার মাথায়: 'বলা যায় না এতে যদি কার্যসিদ্ধি হয়?'

'রাত্রি আটটার পর বাইরে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম বলে আমাকে ধরা হয়েছে।' মাথায় প্রথমেই যা এল সেইটেই বলে ফেলল সে।

একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

'রাত্রিবেলা বাইরে কী করছিলে?'

'ঠিক রাত্রি হয় নি তখনও, শুধু এগারোটা হবে তখন।'

এটা বলার সময় তার আর বিশ্বাস ছিল না যে অন্ধকারে এই ঢিল ছোঁড়াটা ঠিক লেগে যাবে। 'চলে যাও!' এই সংক্ষিপ্ত হুকুমটা শোনার সময় তার হাঁটুদুটো কেঁপে গেল। কোর্তাটা ভুলে ফেলে রেখেই দোলিন্নিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল; ক্যাপ্টেন ততক্ষণে আরেকজন কয়েদীকে জেরা করতে লেগেছে।

করচাগিনকে জিজ্ঞেস করা হল সব শেষে। ঘটনাটা দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে সে মেঝের ওপর বসেছিল। প্রথমটায় সে বিশ্বাসই করতে পারে নি যে দোলিন্নিককে ছেড়ে দেওয়া হল। 'এভাবে এরা সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? কিন্তু দোলিন্নিক... ও যে বলল, আইন ভেঙে সন্ধ্যায় রাস্তায় চলার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল...' ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা এইবার বুঝে ফেলল সে।

কর্নেল ততক্ষণে হাড়জিরজিরে জেলৎসারকে জেরা করতে শুরু করেছে যথারীতি, 'তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?'

ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে নাপিতের মুখটা, বেমক্কা বলে ফেলল সে, 'ওরা তো বলে আমি নাকি আন্দোলন করছিলাম, আন্দোলনটা যে কী করলাম, তা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি না।'

কান খাড়া হয়ে উঠল চের্নিয়াকের, 'কী বললে? আন্দোলন? কিসের আন্দোলন করছিলে তুমি?'

বিমূঢ়ের মতো হাতদুটো ছড়িয়ে দিল জেলৎসার, 'আমি নিজেই তা জানি না। শুধু বলেছিলাম, প্রধান আতামানের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করার জন্যে, ওরা তাতে ইহুদীদের সই জোগাড় করছিল।'

'কিসের দরখাস্ত?' চের্নিয়াক আর ক্যাপ্টেন দু'জনেই তার দিকে রীতিমত ভয়-জাগানো ভঙ্গিতে এগিয়ে এল।

'ইহুদী-ঠেঙানো বন্ধ করার জন্যে দরখাস্ত। জানেন, সাংঘাতিক ঠেঙানি হয়ে গেছে আমাদের ওপর। লোকজন সকলেরই দারুণ আতঙ্ক।'

'হয়েছে, থাক্,' তাকে বাধা দিল চের্নিয়াক, 'দরখাস্ত পেশ করার মজাটা টের জীবনে পাবি 'খন — নোংরা ইহুদী কোথাকার!' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে সে দ্রুত উচ্চারণে বলে গেল, 'এটাকে কোথাও রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও — সেখানে আমি নিজে এর সঙ্গে কথা বলব। এই দরখাস্তের ব্যাপারটার পেছনে কে আছে সেটা দেখতে হবে।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল জেলৎসার, ক্যাপ্টেনটা তার পিঠে এক ঘা কষাল ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে, 'থাম্ ব্যাটা বেজন্মা!'

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে জেলৎসার টলে পড়ল এক কোণে। ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠল তার, গলার কাছে ঠেলে-ওঠা কান্না সে চাপল কোনক্রমে।

শেষ দৃশ্যের সময়ে পাভেল উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঁড়ারঘরে তখন জেলৎসার ছাড়া সে একমাত্র কয়েদী।

ছেলেটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল চের্নিয়াক তার কালো চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে, 'তুই কেন এখানে?'

পাভেলের জবাব তৈরি ছিল, 'জুতোর তলার জন্যে একটা জিনের চামড়া কেটে নিয়েছিলাম বলে।'

'কার ঘোড়ার জিন?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আমাদের বাড়িতে দু'জন কসাক জায়গা নিয়েছে। আমি তাদের একজনের ঘোড়ার পুরনো একটা জিনের একটুকরো চামড়া কেটে নিয়েছিলাম জুতোর তলার জন্যে। কসাকরা তাই এখানে এনে পুরেছে আমাকে।' ছাড়া পাবার একটা উদ্দাম আশায় সে আরও বলল, 'যদি জানতাম যে এটা করা অন্যায়...'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্নেল তাকাল পাভেলের দিকে, বলল, 'এই কম্যাণ্ড্যাণ্টটা কি আর কয়েদ করার লোক পায় নি? পাক্কা আহাম্মক একটা! কাদের ধরে এনেছে দ্যাখো একবার!' দরজার দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যা, বাড়ি যা, তোর বাপকে বল গে তোকে ধরে যেন দু'-ঘা লাগায় বেশ করে। শিগগির বেরো!'

ছোঁ মেরে দোলিন্নিকের কোর্তাটা তুলে নিয়েই পাভেল ছুট মারল দরজা দিয়ে — তখনও সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বুকে হাতুড়ি পিটছে, যেন এখুনি ফেটে যাবে। কর্নেলটা যখন আঙিনায় বেরিয়ে আসছে তখন তার পেছন দিয়ে পাভেল সান্ত্রীদের ঘরটা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বেড়াটার বাইরে রাস্তায় এসে পড়েছে সে মুহূর্তের মধ্যে।

হতভাগ্য জেলৎসার একা পড়ে রইল ভাঁড়ারঘরটায়। বিপন্ন-চোখে সে একবার চারিদিকে তাকাল, অনিচ্ছায় দরজাটার দিকে একবার এগিয়ে এল কয়েক পা, কিন্তু

ঠিক তখনই একজন সান্ত্রী এসে দরজাটা বন্ধ করে তালাটা ঝুলিয়ে দিয়ে দরজার পাশে টুলটায় বসল।

বাইরে দেউড়িতে বেরিয়ে এসে চেরনিয়াক নিজের ওপরে বেশ খুশি হয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'কয়েদীদের একবার দেখে নিয়ে ভালই করেছি আমরা। কী সব আজেবাজে লোককে এনে পুরেছিল ভাবো একবার! এই কম্যাণ্ড্যাণ্টটিকে দু'-এক সপ্তাহ কয়েদ করে রাখতে হবে দেখছি। আচ্ছা, তাহলে এবার যাওয়া যাক।'

সার্জেণ্টটা সমস্ত সান্ত্রীদের আঙিনায় এনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়েছে। কর্নেলকে দেখেই সে ছুটে এসে জানাল, 'সব ঠিকঠাক করে ফেলা হয়েছে পান্ কর্নেল।'

রেকাবটায় পা রেখে জিনের ওপর হালকাভাবে লাফিয়ে উঠল চেরনিয়াক। ক্যাপ্টেন তার গোঁয়ার ঘোড়াটাকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছে। রাশ টেনে চেরনিয়াক সার্জেণ্টকে বলল, 'কম্যাণ্ড্যাণ্টকে বলো, যতো বাজে লোকদের এনে সে ওখানে পুরেছিল, আমি তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। আর বলবে, এখানকার কাজকর্ম সে যেভাবে চালিয়ে এসেছে তার জন্যে আমি তাকে দু'-সপ্তাহ কয়েদখানায় রাখব। আর ওই যে লোকটা এখন আছে ওখানে, ওকে এখুনই সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। সান্ত্রীদের তৈরি থাকতে বলো।'

'যে আজ্ঞে, পান্ কর্নেল।' সার্জেণ্ট সেলাম ঠুকল।

জুতোর নাল দিয়ে ঘোড়ার তলপেট ঠুকে কর্নেল আর ক্যাপ্টেন রওনা হয়ে গেল গির্জার মাঠের দিকে। সেখানে ততক্ষণে কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে আসছে।

* * *

পর পর সাতটা বেড়া টপ্‌কে পার হবার পর পাভেল নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল। আর চলতে পারছে না সে।

দম-আটকানো ওই ভাঁড়ারঘরের খাঁচায় এই ক'দিন না খেয়ে বন্দী হয়ে থাকার ফলে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কোথায় যাবে সে? বাড়ি যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি গেলে যদি সেখানে কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে তাদের গোটা পরিবারটার ওপরেই সর্বনাশ নেমে আসবে।

কী করবে না জেনেই পাভেল আরেকবার অন্ধভাবে ছুট লাগাল শহরের বাইরের দিকে তরিতরকারির জমিগুলো আর বাগানগুলো পেছনে ফেলে। একটা বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে হুঁশ ফিরে পেয়ে সে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল: লম্বা বেড়াটার ওপারে প্রধান বনপরিদর্শকের বাগান। নিঃশেষে ক্লান্ত তার পাদুটো এইখানে এনে ফেলেছে তাকে! এদিকে আসার কোন চিন্তাই যে তার ছিল না।

তাহলে এখানে কী করে এল সে ?

প্রশ্নটার কোন উত্তর পাভেল পেল না।

তবু, বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে কিছুক্ষণের জন্য — অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নিয়ে তাকে ঠিক করতে হবে এর পরে কী করবে না-করবে। মনে পড়ল তার — বাগানটার শেষের দিকে একটা কুঞ্জ আছে, সেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

লাফ দিয়ে বেড়াটার গা বেয়ে উঠে টপ্‌কে এধারে এসে সে পড়ল বাগানের মধ্যে। গাছের ফাঁকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে সে এগোল কুঞ্জের দিকে। হতাশ হয়ে পাভেল লক্ষ্য করল, কুঞ্জের প্রায় চারিদিকই খোলা। গ্রীষ্মের সময় যে বুনো আঙুর-লতার ঝাড় কুঞ্জটাকে চারধারে ঘিরে দেয়াল তুলেছিল সেটা শুকিয়ে ঝরে গেছে।

ফিরে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল পাভেল, কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। পেছনে প্রচণ্ড ঘেউঘেউ আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে — পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাভেল দেখতে পেল বাড়িটার দিক থেকে শুকনো পাতা-ছড়ানো রাস্তাটা বেয়ে একটা বিরাট কুকুর সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কুকুরটার হিংস্র চিৎকারে বাগানের নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে।

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল পাভেল।

প্রথম আক্রমণটা সে ঠেকাল জোরে পা মেরে। কিন্তু কুকুরটা আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ওঁৎ পাতছে। এমন সময় একটা পরিচিত গলায় ডাক ভেসে এল, 'এদিকে আয় ট্রেসর ! এদিকে আয় !'

এই ডাকটা না এলে পাভেলের সঙ্গে কুকুরটার এই সংঘর্ষের ফলাফল কী দাঁড়াত বলা যায় না।

তোনিয়া ছুটে আসছিল পথটা বেয়ে। গলা-বন্ধনী ধরে ট্রেসরকে পেছনে টেনে তোনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়ানো তরুণটির দিকে তাকাল, 'এখানে কী কাজ আপনার ? কুকুরটা আর একটু হলেই ভীষণভাবে কামড়ে দিত আপনাকে, ভাগ্য ভাল যে আমি...'

হঠাৎ থেমে গেল তোনিয়া, তার চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাদের বাগানে ঢুকে পড়েছে এই যে ছেলেটা, এর চেহারার সঙ্গে করচাগিনের চেহারার কী আশ্চর্য মিল !

বেড়ার পাশে মূর্তিটা নড়ে উঠল।

'তুমি !' কোমল গলায় বলল তরুণটি, 'চিনতে পারছ না আমাকে ?'

চেঁচিয়ে উঠে তোনিয়া হঠাৎ-উত্তেজনায় ছুটে এল তার কাছে, 'পাভেল, তুমি ?'

ট্রেসর এই চিৎকারটাকে আক্রমণের ইঙ্গিত মনে করে একলাফে এগিয়ে এল।

'থাম্ ট্রেসর, থাম্!'

তোনিয়া তাকে কয়েকটা লাথি দিতেই ট্রেসর মর্মাহত হয়ে তার পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে মাথা নিচু করে চলে গেল বাড়ির দিকে।

পাভেলের দুই হাত চেপে ধরে তোনিয়া বলল, 'ছাড়া পেয়ে গেছ তুমি?'

'তুমি জানতে তাহলে?'

'সব জানি আমি,' উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে একনিঃশ্বাসে বলে গেল তোনিয়া, 'লিজা বলেছে আমাকে। কিন্তু এখানে এলে কী করে? ওরা ছেড়ে দিল নাকি তোমায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ভুল করে,' ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিল পাভেল, 'আমি পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণে বোধহয় ওরা আমাকে খুঁজতে লেগেছে। কী করে যে এখানে এলাম তা সত্যিই জানি না। তোমাদের বাগানের এই লতাঘরটায় একটু বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল।

দু'-এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল তোনিয়া। একটা নিবিড় করুণা আর স্নেহের আবেগে ছেয়ে গেল তার মন।

'পাভেল, আমার পাভেল,' তার হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে তোনিয়া মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ভালোবাসি তোমায়... শুনছ? গোঁয়ার ছেলে, সেবারে তুমি অমন করে চলে গেলে কেন? আচ্ছা, এবারে তাহলে তুমি থাকছ আমাদের কাছে, আমার কাছে। কিছুতেই আর আমি যেতে দিচ্ছি না তোমায়। আমাদের বাড়ি নিশ্চিন্তে থাকবে যতদিন খুশি — কোন গোলমাল নেই এখানে।'

মাথা নাড়ল পাভেল, 'এখানে আমাকে ওরা যদি খুঁজে পায়, তাহলে? না, তোমার বাড়িতে থাকা চলবে না আমার।'

তোনিয়ার হাত মুচড়ে ধরল পাভেলের আঙুলগুলো, তার চোখের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

'যদি রাজী না হও, তাহলে আর কক্ষনো আমাকে দেখতে পাবে না তুমি। আরতিওম নেই এখানে, তাকে পাহারাওয়ালা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রেল-স্টেশনে। সমস্ত রেলের লোকজনকে জোর করে কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোথায় যাবে তুমি?'

তোনিয়ার এই উদ্বেগ যে কেন তা পাভেল জানে। তবে এই যে মেয়েটি তার বড়ো প্রিয় তারই বিপদ ডেকে আনার ভয়েই সে ইতস্তত করছে। কিন্তু খিদেয়, ক্লান্তিতে, এই ক'দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার অবসন্নতার ফলে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গেল।

তোনিয়ার ঘরে সোফাটায় যখন সে বসে আছে তখন রান্নাঘরে মা আর মেয়ের মধ্যে এই কথাবার্তা চলছিল, 'শোনো মা, করচাগিন বসে আছে আমার ঘরে। ও আমার কাছে

পড়তে আসত, তোমার মনে আছে তো? আমি তোমার কাছে কিছু লুকোতে চাই না। একজন বলশেভিক জাহাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ও আজ জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই ওর।' গলাটা কেঁপে গেল তোনিয়ার, 'মা, লক্ষ্মীটি, কয়েকদিনের জন্যে ওকে এখানে থাকার অনুমতি দাও।'

মা তাঁর মেয়ের অনুনয়-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওকে থাকতে দিবি কোন্ ঘরে?'

হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল তোনিয়ার মুখ। বিমূঢ়ভাবে, উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলল সে, 'আমার ঘরে সোফাটার ওপরে ও ঘুমোতে পারবে। আপাতত বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।'

মা সোজাসুজি মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এরই জন্যে বুঝি তুমি কেঁদেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ও তো এখনও নেহাত ছেলেমানুষ।'

'তা জানি,' বিব্রতভাবে ব্লাউজের হাতাটা আঙুল দিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে তোনিয়া বলল, 'কিন্তু ও না পালিয়ে এলে ওকে ওরা গুলি করে মারত বয়স্কের মতো!'

করচাগিন তাঁর বাড়িতে থাকায় ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছিল এই ছেলেটা, যাকে তিনি চেনেন না বললেই হয়, তার প্রতি মেয়ের এই টান দেখে তিনি মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এদিকে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়ে তোনিয়া তার অতিথির আরাম-বিরামের ব্যাপারটা ভাবতে লেগেছে, 'আগে ওর চান করা দরকার, মা। আমি এখুনি সেটার ব্যবস্থা করছি। ভয়ানক নোংরা হয়ে আছে ও — কয়লাওয়ালারই মতো। বহুদিন ওর চান-টান হয় নি।'

ব্যস্ত হয়ে তোনিয়া চলে এল পাভেলের স্নানের জন্য জল গরমের আর কিছু ধোয়া জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে। সব করার পর সে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে পাভেলের হাত ধরে তুলে অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করে তাকে স্নান-ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'আগাগোড়া পোশাক বদলাতে হবে তোমার। এই এক-প্রস্থ পোশাক তোমার পরার জন্যে। তোমার জামা-কাপড়গুলো ধোয়াতে হবে। ইতিমধ্যে ওইগুলো পরবে।' একটা চেয়ারের ওপরে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা নীল রঙের আর গলার কাছে সাদা ডোরা-কাটা একটা জাহাজী কোর্তা, আর পায়ের-দিকে-চওড়া একটা পাৎলুন দিয়ে দেখাল সে।

অবাক-চোখে তাকাল পাভেল। তোনিয়া হেসে তাকে বুঝিয়ে দিল, 'আমি একবার

একটা শখের পোশাকের নাচের আসরে পরেছিলাম ওটা। তোমার গায়ে ঠিক হবে। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি কর এবার। তোমার চান হতে হতে আমি এদিকে কিছু খাবার ব্যবস্থা করছি।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। কাপড়-চোপড় খুলে টবের জলে নেমে পড়া ছাড়া পাভেলের আর গত্যন্তর রইল না।

ঘণ্টাখানেক পরে মা, মেয়ে আর পাভেল তিনজনে রান্নাঘরে খেতে বসল।

ভয়ানক খিদে পেয়েছিল পাভেলের, তিন প্লেট খেয়ে ফেলার পর সে নিজের খাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। প্রথমটায় সে ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার সামনে কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তিনি এত বন্ধুর মতো ব্যবহার করছেন দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সে ভাবটা কেটে গেল।

খাওয়ার পর তারা তোনিয়ার ঘরে এসে বসল। ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার অনুরোধে পাভেল যা যা ঘটেছিল সব বলল। শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপরে, এখন তুমি কী করবে বলে ভেবেছ?'

প্রশ্নটা শুনে পাভেল দু'-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'আগে একবার আরতিওমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তারপরে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু যাবে কোথায়?'

'ভাবছি উমান কিংবা কিয়েভে চলে যেতে পারব বোধহয়। নিজেই সেটা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু এখান থেকে যতো শিগগির পারি চলে যেতেই হবে।'

এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে তার পরিবেশটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে সেটা যেন পাভেলের বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র আজ সকালেই সে ছিল নোংরা একটা গারদের মধ্যে, আর এখন কিনা সে বসে আছে তোনিয়ার পাশে ফর্সা জামাকাপড় পরে — আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সে এখন মুক্ত।

জীবনে কত অদ্ভুত পরিবর্তন না আসতে পারে! কোন মুহূর্তে আকাশটা রাত্রির মতো কালো মনে হয়, তারপরেই আবার সূর্যের দীপ্তি ফোটে। ফের ধরা পড়বার বিপদ যদি না থাকত, তাহলে এই মুহূর্তে তাকেই বলা যেতে পারত সবচেয়ে সুখী ছেলে।

কিন্তু সে জানে, এই বিরাট নিস্তব্ধ বাড়িটায়ও সে মোটেই নিরাপদ নয়।

তাকে চলে যেতেই হবে এখান থেকে, তা সে যেখানেই হোক না কেন।

কিন্তু চলে যাবার কথাটা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছে না। বীর গ্যারিবল্ডির জীবনী পড়তে পড়তে কী উম্মাদনায় ছেয়ে গেছে তার মন! গ্যারিবল্ডির ওপরে ভারি হিংসা হত পাভেলের, অথচ গ্যারিবল্ডির জীবন কেটেছে নানান কষ্টের মধ্যে দিয়ে — সবসময় তাঁর পেছন পেছন তাড়া করে ফিরেছে আর তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এক

জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। আর পাভেলের তো মোটে সাতদিন কেটেছে কষ্ট আর নির্যাতনের মধ্যে, তাতেই তার কাছে এই সাতদিন যেন পুরো একটি বছর বলে মনে হয়েছে। না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সে ঠিক বীরের গড়নটা পায় নি।

তোনিয়া তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?' তার দুই চোখের নীলিমা যেন অগাধ।

'তোনিয়া, খ্রিস্তিনার কথা বলব, শুনবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' আগ্রহের সঙ্গে বলল তোনিয়া।

পাভেল তার কারা-সঙ্গিনীর সেই দুঃখের কাহিনী বলে গেল, '...আর সেই শেষ তার সঙ্গে দেখা।' শেষের কথাগুলো অতি কষ্টে উচ্চারণ করল পাভেল।

তারপর নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ আওয়াজটা জোরালো হয়ে উঠল। মাথাটা নিচু হয়ে গেল তোনিয়ার, গলায় ঠেলে-ওঠা কান্নাটাকে আটকাবার জন্য সে জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

তার দিকে তাকিয়ে পাভেল মনস্থির করে বলল, 'আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে।'

'না, না, আজ রাত্রে আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না!'

পাভেলের এলোমেলো চুলগুলোর ফাঁকে সে সস্নেহে তার পেলব উষ্ণ আঙুল বুলিয়ে দিল...

'তোনিয়া, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একজন কাউকে ডিপোয় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আরতিওমের কী হয়েছে আর সেরিওঝাকে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে। একটা কাকের বাসায় আমার একটা পিস্তল লুকানো আছে। সেটা আনবার জন্যে আমি যেতে পারি না। কিন্তু সেরিওঝা সেটা আমাকে এনে দিতে পারবে। তুমি পারবে আমার জন্যে এই কাজটা করতে?'

উঠে দাঁড়াল তোনিয়া, 'আমি এক্ষুনি লিজা সুখারুকোর কাছে যাচ্ছি। ও আর আমি দু'জনে একসঙ্গে ডিপোয় যাব। চিঠিটা লিখে দাও, সেরিওঝাকে দিয়ে দেব আমি। কোথায় থাকে সে? সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে কি তাকে বলব তুমি কোথায় আছ?'

একটু ভেবে পাভেল বলল, 'আজ সন্ধ্যেয় তোমাদের বাগানে তাকে পিস্তলটা নিয়ে আসতে বলো।'

অনেক দেরিতে তোনিয়া ফিরল। পাভেল তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠল পাভেল, চোখ মেলে দেখে তোনিয়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে, খুশির হাসি তার মুখে।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আরতিওম আসছে এখানে। সবেমাত্র ফিরেছে সে। লিজার বাবা তার জামিন হয়েছেন, এক ঘণ্টার জন্যে তাকে ওরা আসতে দিতে রাজী হয়েছে। ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়েই আছে ডিপোয়। তুমি যে এখানে রয়েছ, সেটা আমি আরতিওমকে বলে উঠতে পারি নি। শুধু বলেছি, আমার তাকে খুব জরুরী কিছু কথা বলার আছে। এই যে, এসে গেছে সে!'

ছুটে গেল তোনিয়া দরজাটা খুলে দেবার জন্যে। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আরতিওম দাঁড়িয়ে রইল দরজাটার কাছে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আরতিওম ঢোকার পর তোনিয়া দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে পড়বার ঘরটায় টাইফাসে অসুস্থ তার বাবার কানে কথাবার্তা না যায়।

আর এক মুহূর্তের মধ্যেই আরতিওম ছুটে এসে এমন দারুণ জোরে চেপে জড়িয়ে ধরল পাভেলকে যে তার হাড় মটকে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল আরতিওম, 'পাভেল! ভাইটি আমার!'

* * *

তারপর সব কথাবার্তার শেষে ঠিক হল: পাভেল পরের দিন চলে যাবে এখান থেকে; কাজাতিনগামী একটা ট্রেনে ব্রুঝাক তাকে তুলে নেবে, সে-ব্যবস্থা আরতিওম করে দেবে।

আরতিওম সাধারণত গম্ভীর আর স্বল্পভাষী, কিন্তু এখন সে তার ভাইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা — পাভেলের কী হল না-হল জানতে না পেরে তার এই ক'টা উদ্বিগ্ন দিন কেটেছে গভীর দুশ্চিন্তায়।

'তাহলে তাই ঠিক হল। কাল ভোর পাঁচটায় তুই মালগুদামে আসবি। ওরা যখন ইঞ্জিনে কাঠ নিতে থাকবে, তুই তখন সেঁধিয়ে যাবি। আমার ইচ্ছে করছে আরও কিছুক্ষণ বসে তোর সঙ্গে গল্প করি, কিন্তু ফিরে যেতে হবে আমাকে। কাল তোর রওনা হবার সময় দেখা করব। ওরা রেলের লোকজনদের নিয়ে একটা পল্টন গড়ে তুলবার জোগাড়ে আছে। জার্মানরা এখানে থাকার সময়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি এখনও আমরা রাইফেলধারী সান্ত্রীদের পাহারায় চলাফেরা করি।'

ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল আরতিওম।

দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সের্গেই এক্ষুনি এসে পড়বে পিস্তলটা নিয়ে। সের্গেইয়ের অপেক্ষায় পাভেল উত্তেজনায় অন্ধকার ঘরটায় পায়চারি করতে থাকল। তোনিয়া তার বাবার ঘরে, সেখানে তার মাও আছেন।

বাগানে বেড়াটার ধারে অন্ধকারে সের্গেইয়ের সঙ্গে দেখা হল তার, নিবিড় আবেগে

পরস্পরের করমর্দন করল দুই বন্ধু। সের্গেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভালিয়াকে। নিচু গলায় কথাবার্তা চালাল তারা।

সের্গেই বলল, 'আমি পিস্তলটা আনতে পারি নি। তোদের উঠোনটায় গিজগিজ করছে পেৎলিউরার লোক। চারিদিকে গাড়িগুলোকে জড়ো করে রেখেছে ওরা, আগুন জ্বালিয়ে হৈ-হল্লা করছে। তাই গাছে চড়ে আর পিস্তলটা আনতে পারি নি — ভারি বেইজ্জত হলাম তোর কাছে!' খুব দমে গেছে সের্গেই।

তাকে সান্ত্বনা দিল পাভেল, 'যাক্ গে। এই হয়তো ভাল হল — পিস্তলটা সমেত যদি পথে ধরা পড়ি তাহলে বরং আরও খারাপ। কিন্তু ওটা জোগাড় করে তোর কাছে রাখিস নিশ্চয়।'

পাভেলের কাছে সরে এল ভালিয়া, 'কখন যাচ্ছ?'

'কাল, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে।'

'কী করে সরে পড়লে ওখান থেকে? বলো, শুনি।'

তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে পাভেল ঘটনাটা বলে গেল।

তারপরে সে তার সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। সের্গেই সাধারণত বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ তার কোন ঠাট্টা নেই, সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। রুদ্ধ-কণ্ঠে ভালিয়া বলল, 'আমাদের শুভেচ্ছা রইল, পাভেল। ভুলে যেও না আমাদের।'

তারপরে তারা চলে গেল, মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

বাড়ির ভেতরে সব কিছু নিস্তব্ধ, শুধু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এই বাড়ির দু'জন বাসিন্দার চোখে সে রাত্রের মতো আর ঘুম নেই। ছ'ঘণ্টা পরেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে, বোধহয় আর তাদের মধ্যে দেখাই হবে না — সুতরাং কী করে ঘুমোবে তারা? মনের মধ্যে তাদের অজস্র না-বলা ভাবনা-চিন্তা পাক খেয়ে উঠছে — এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কি আর সেই সব ভাবনা-চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

আশ্চর্য মধুর আর পবিত্র সেই যৌবনের প্রারম্ভে প্রেমের মাদকতা যখন অজ্ঞাত, তখন সেটা শুধু অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় হৃদয়ের দ্রুতগতি-স্পন্দনের মধ্যে দিয়ে; প্রিয়তমার বুকের হঠাৎ স্পর্শ পেয়ে তখন হাতটা যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে আর শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীর মতো বাধা দেয় প্রথম যৌবনের পবিত্র বন্ধুত্ব! প্রিয়তমার বাহুবন্ধনের অনুভূতি আর অগ্নিময় চুম্বন-স্পর্শের চেয়ে মধুর আর কী আছে!

তাদের এতদিনের বন্ধুত্বের মধ্যে এই হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় চুম্বন। পাভেলের মার খাবার অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে, কিন্তু আদর সে মায়ের কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর

কাছ থেকে পায় নি। তাই আজ তার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল পর্যন্ত নিবিড় আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠছে।

এ পর্যন্ত জীবনের নির্মম দিকটাই সে দেখে এসেছে, সে জানত না যে জীবন এত সুন্দর হতে পারে — এতদিনে তোনিয়ার কাছ থেকেই সে বুঝল আনন্দ কাকে বলে।

তোনিয়ার চুলের সুগন্ধ-ভরা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে তার মনে হল যেন সে অন্ধকারে তার চোখদুটি দেখতে পাচ্ছে।

'তোনিয়া, তোমাকে যে কতো ভালোবাসি কী করে বোঝাব, কী করে বলতে হয় তা তো আমার জানা নেই।'

পাভেলের মাথার মধ্যে যেন কী রকম করে উঠেছে। তোনিয়ার কোমল পেলব দেহটা কি আশ্চর্যরকম সংবেদনশীল!.. কিন্তু প্রথম যৌবনের বন্ধুত্ব পরম নির্ভরে পবিত্র!

'তোনিয়া, এই সমস্ত গোলমাল যখন কেটে যাবে, আমি নিশ্চয়ই মিস্ত্রি হিসেবে কাজ পেয়ে যাব একটা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, যদি সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমাকে নিয়ে এটা যদি তোমার একটা খেলা না হয়, আমি তোমার খুব ভাল স্বামী হয়ে থাকব। কক্ষনো মারধোর করব না তোমায়, তোমার মনে একটুও আঘাত দেব না কখনও — প্রতিজ্ঞা করছি।'

পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে আলাদা হয়ে গেল তারা — পাছে তোনিয়ার মা তাদের দেখে ফেলে কিছু খারাপ ভেবে বসেন।

পরস্পরকে কখনও ভুলবে না — এই প্রতিজ্ঞা করার পর যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা পাভেলকে ভোর-ভোর ডেকে তুললেন।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল সে বিছানা ছেড়ে।

স্নানের ঘরে গিয়ে যতক্ষণে সে তার নিজের পোশাক আর জুতো পরে দোলিন্নিকের কোর্তাটা ওপরে চাপিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণে ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা তোনিয়াকে জাগিয়ে তুললেন।

ভোরের ধূসর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তারা দু'জনে দ্রুত পায়ে এগুল স্টেশনমুখো। পেছনের পথটা দিয়ে কাঠের গুদামে পেঁছে দেখে আরতিওম কাঠ-বোঝাই একটা ইঞ্জিনের পাশে তাদের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।

হিস্‌হিস্‌ শব্দে বাষ্প বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটা বিরাট ইঞ্জিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে — ব্রুঝাক জানলার মধ্যে থেকে মাথা বের করল।

তোনিয়া আর আরতিওমের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে পাভেল লোহার শিকটা চেপে ধরে উঠে পড়ল ইঞ্জিনটার ভেতরে। পেছনে তাকিয়ে দেখল লেভেল-ক্রসিং-এর

কাছে দুটো পরিচিত চেহারা: আরতিওমের লম্বা আকৃতিটা আর তার পাশে তোনিয়ার ছোট্ট পেলব দেহখানি।

এক ঝলক বাতাস তার ব্লাউজের গলাবন্ধনীটা উড়িয়ে দিয়ে আর তার বাদামী চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। পাভেলের দিকে হাত নাড়ছে তোনিয়া।

তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আরতিওম দেখল, তোনিয়ার চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবল আরতিওম, 'হয় আমি একটা আস্ত আহাম্মক, নয়ত এদের মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। বোঝ পাভেলের কাণ্ডটা! আমি কিনা এদিকে ভাবছি যে ও আজও আমাদের সেই নেহাত ছেলেমানুষটিই আছে!'

ট্রেনটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সে তোনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আমরা তাহলে বন্ধু হলাম এখন থেকে, কেমন?' তোনিয়ার ছোট্ট হাতখানা তার বিরাট থাবাটার মধ্যে হারিয়ে গেল।

ট্রেনটা গতি সঞ্চয় করছে — দূর থেকে তার গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ ভেসে এল।

সপ্তম অধ্যায়

পুরো এক সপ্তাহ ধরে শহরের বাসিন্দারা রাত্রে ঘুমোতে যায় আর সকালে জেগে ওঠে কামানের গুম্‌গুম্‌ শব্দ আর রাইফেলের খট্‌খট্‌ আওয়াজের মধ্যে। সর্বত্র ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে, গোটা শহরটাকে যেন কাঁটাতারের বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে। শুধু মাঝরাত্রির পরে কয়েক ঘণ্টার জন্য গণ্ডগোলটা কমে আসে, কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে নিঃশব্দতাটুকু ভেঙে ভেঙে যায় ফৌজী ফাঁড়িগুলোর থেকে দু'পক্ষের অস্তিত্ব জানবার জন্য গুলি চালানোর শব্দে। ভোরবেলায় রেল-স্টেশনের গোলন্দাজ-বাহিনী তাদের কামানের সারির পাশে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক একটা কামানের লম্বা নল তার কালো নাক দিয়ে হিংস্র উদ্‌গিরণ করে আর লোকগুলো দফায় দফায় তার ভেতরে গুঁজে দেয় আরও গোলা আর বিস্ফোরক। যতবার একজন গোলন্দাজ কামানের রশিটা ধরে টান মারছে, ততবারই পায়ের নিচে মাটিটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে লাল বাহিনী একটা গ্রাম অধিকার করে ঘাঁটি গেড়ে আছে — গোলাগুলো সেই গ্রামের ওপর দিয়ে সাঁসাঁ শব্দে অন্যসব আওয়াজকে ছাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ছে মাটির চাঙড়।

গ্রামের মাঝখানে একটা উঁচু টিলার ওপরে পুরনো পোলিশ মঠটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে তার সামনের জমিতে লাল বাহিনীর কামানগুলো।

এই কামানশ্রেণীর সামরিক কমিশার কমরেড জামোস্তিন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

সে এতক্ষণ একটা কামানের পেছন দিকের ওপরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। ভারি একটা মাউজার পিস্তল ঝোলানো তার কোমরবন্ধনীটা আঁট করে বাঁধতে বাঁধতে জামোস্তিন উড়ন্ত একটা গোলার সাঁইসাঁই শব্দ শুনতে শুনতে সেটার ফেটে-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। তারপর তার জোরালো গলার আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সারা জায়গাটা, 'বাকি ঘুমটা কাল হবে কমরেডসব। উঠে পড়!'

গোলন্দাজরা সবাই তাদের নিজের নিজের কামানের পাশে ঘুমুচ্ছিল। কমিশার জামোস্তিনের মতোই তারা সবাই চটপট উঠে দাঁড়াল — শুধু সিদোর্চুক্ ছাড়া। অনিচ্ছাভরে মাথাটা তুলে সে চারিদিকে তাকাল ঘুমে ভারি তার চোখদুটো তুলে, 'শুয়োরগুলো — দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই আরম্ভ করে দিয়েছে। স্রেফ বদমাইশ — যতোসব বেজম্মা!

জামোস্তিন হেসে উঠল, 'সব কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক, বুঝলে সিদোর্চুক, ওরা হচ্ছে তাই। তুমি যে একটু ঘুমোতে চাও, সেটাও ওরা গ্রাহ্যই করে না।'

গোলন্দাজটি অসন্তুষ্ট হয়ে গজগজ করতে করতে টেনে তুলল নিজেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মঠের সামনের কামানগুলো থেকে গোলা ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল — শহরের মধ্যে ফেটে পড়তে লাগল গোলাগুলো। চিনি-কলের লম্বা চিমনিটার মাথার ওপরে কাঠের তক্তা জুড়ে একটা মাচার মতো ক'রে নিয়ে সেখানে পাহারায় বসে রয়েছে একজন পেৎলিউরা-অফিসার আর একজন টেলিফোন-করার লোক।

চিমনিটার ভেতরের দিককার লোহার মই বেয়ে তারা সেখানে উঠেছে।

এখান থেকে গোটা শহরটা স্পষ্ট দেখা যায়। এই সুবিধাজনক জায়গাটা থেকে তারা গোলন্দাজবাহিনীকে গোলা ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। শহর অবরোধ করে রয়েছে যে লাল সৈন্যদল তাদের সমস্ত গতিবিধি এরা দূরবীন দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। বলশেভিকরা আজ বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অনবরত গুলি চালাতে চালাতে একটা সাঁজোয়া ট্রেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে পদোল্স্ক স্টেশনের দিকে। তার ওদিকটায় হামলাদার পদাতিক ফৌজের অবস্থান দেখা যায়। হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শহরটাকে অধিকার করে নেবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছে লাল বাহিনী। কিন্তু শহরে ঢোকার মুখগুলোর দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে পেৎলিউরা-বাহিনীর সৈন্যেরা। ট্রেঞ্চ্গুলো এক এক ঝলক বারুদের আগুন উদ্গিরণ করেছে, একটা কানে-তালা-ধরা আওয়াজে ভরে গেছে চারিদিক। তারপরে সেটা একটা নিরবচ্ছিন্ন গর্জনের রূপ নিয়ে আক্রমণগুলো চালাবার সময়ে চরমে উঠেছে। জ্বলন্ত সীসের সেই শিলাবৃষ্টির ঝাপটায় অমানুষিক একটা প্রয়াসের চাপ সইতে না পেরে বলশেভিক বাহিনীর সারিটা পিছিয়ে গেছে, সামনে মাঠের ওপরে তারা ফেলে এসেছে কতকগুলো অসাড় দেহ।

আজ শহরের ওপরে আঘাতগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ় আর ঢের বেশি ঘন ঘন। কামানের গোলা-ছোঁড়ার প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠছে চারিদিক। চিমনির মাথায় বাঁধা মাচাটার ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে — বলশেভিক সৈন্যসারি ক্রমশই ধীরে ধীরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে মাটির ওপরে শুয়ে পড়ছে মানুষগুলো, আবার উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে তারা স্টেশনটা প্রায় দখল করে নিয়েছে। পেৎলিউরা-বাহিনীর ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ সৈন্যদল যে-ক'টা ছিল, সেগুলিকেও লড়াইয়ে লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থানের বিভিন্ন জায়গায় যে ভাঙন ধরেছে, সেটাকে রুখতে পারল না। একটা বেপরোয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলশেভিক বাহিনীর আক্রমণকারী দলটা ঠেলে এসে স্টেশন-সংলগ্ন রাস্তাগুলোর ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। স্টেশনের ওপরে আক্রমণটাকে রুখছিল যারা, সেই পেৎলিউরা-বাহিনীর তৃতীয় রেজিমেণ্ট শহরের প্রান্তে বাগান আর সবজিক্ষেতগুলোয় তাদের শেষ অবস্থানগুলি থেকে লাল সৈনিকদের একটা সংক্ষিপ্ত আর সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে উৎখাত হয়ে শহরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। নতুন করে তাদের ঘাঁটি গাড়বার আগেই লাল ফৌজের সৈন্যরা শহরের রাস্তায় দলে দলে নেমে এল। পশ্চাদ্‌রক্ষী কিছু পেৎলিউরা-সৈন্য তাদের আক্রমণ রুখতে চেষ্টা করছিল — লাল ফৌজের সৈন্যরা বেয়নেট চালিয়ে তাদের হঠিয়ে দিল প্রচণ্ড বেগে।

সের্গেই ব্রুঝাকের পরিবার আর তাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীরা আশ্রয় নিয়েছে মাটির তলার কুঠরিতে — সের্গেইকে সেখানে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না। মায়ের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও সে মাটির নিচের ঠাণ্ডা ঘরটা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। 'সাগাইদাচ্‌নি' নাম লেখা একটা সাঁজোয়া গাড়ি বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে ঘড়ঘড় শব্দে বেরিয়ে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে। তার পেছন পেছন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে পালাচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত পেৎলিউরার লোকজন। ওদের একজন সের্গেইদের আঙিনায় ঢুকে পড়ে পাগলের মতো কোনরকমে তাড়াতাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলল তার কার্তুজের কোমরবন্ধনী, শিরস্ত্রাণ আর রাইফেলটা; তারপরে বেড়াটা টপকে ওদিককার সবজি-বাগানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাস্তাটা দেখে নিল সের্গেই। রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে পেৎলিউরা-সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনের দিকে; তারা যাতে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, তার জন্য একটা সাঁজোয়া গাড়ি পেছন পেছন চলেছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। শহরমুখো বড়ো রাস্তাটা একেবারে জনহীন। তারপরে একজন লাল ফৌজের লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে সে গুলি চালাতে লাগল। তার পেছনে একে একে আরও দু'জন লাল ফৌজের লোক এসে পড়ল... সের্গেই দেখতে পেল — গুঁড়ি মেরে মেরে গুলি চালাতে

চালাতে এগিয়ে আসছে তারা। রোদে-পোড়া তামাটে রঙ একজন চীনা শরীরটাকে টান করে সোজা দৌড়ে আসছে — তার চোখদুটো রক্তাক্ত, গায়ে তার একটা গেঞ্জি, মেশিনগানের কার্তুজ-বন্ধনী পরা, দুই হাতে দুটো হাত-বোমা। ওদের সবার আগে আগে আসছে একজন নিতান্ত অল্পবয়সী লাল ফৌজের লোক, তার হাতে একটা হালকা মেশিনগান। লাল ফৌজের এই অগ্রগামী দলটাকে শহরে ঢুকতে দেখে সের্গেইয়ের মন আনন্দে ভরে উঠল। রাস্তার ওপরে ছুটে বেরিয়ে এসে সে যতো জোরে পারে চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেডসব জিন্দাবাদ!'

এমন আকস্মিকভাবে সে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায় যে চীনাটি তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আর কি। লাল ফৌজের লোকটির প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ছেলেটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ইচ্ছে। কিন্তু সের্গেইয়ের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে সে সামলে নিল নিজেকে। ভয়ানক রকম হাঁফাতে হাঁফাতে চীনাটি তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেৎলিউরা কোথায়?'

কিন্তু তার কথা শুনতে পায় নি সের্গেই। বাড়ির আঙিনায় ছুটে ফিরে এসে সে ইতিমধ্যে পেৎলিউরা-সৈন্যটির ফেলে-যাওয়া কার্তুজ-বন্ধনী আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে লাল ফৌজের লোকদের পেছনে পেছনে ছুটেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনটা দখল করে না নেওয়া পর্যন্ত তারা সের্গেইকে লক্ষ্যই করে নি। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র-গোলা-বারুদ আর রসদে বোঝাই কতকগুলো ট্রেন বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শত্রুপক্ষকে বনের মধ্যে তাড়িয়ে দেবার পর তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন করে দল সাজাবার জন্য কিছুক্ষণের মতো থামল।

সের্গেইয়ের কাছে এগিয়ে এসে তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোত্থেকে এলে কমরেড?'

'আমি এই শহরের ছেলে। আমি তোমাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম।'

লাল ফৌজের লোকেরা ঘিরে ধরল সের্গেইকে।

চীনাটি ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় বলল, 'আমি জানি ওকে, 'কমরেডসব জিন্দাবাদ!' বলে ও চেঁচিয়ে উঠেছিল। বলশেভিক, আমাদের লোক, বেশ ভাল ছেলে!' সের্গেইয়ের কাঁধে একটা সমর্থনের চাপড় মেরে একগাল হেসে সে বলল।

আনন্দে নেচে উঠল সের্গেইয়ের মন। সঙ্গে সঙ্গেই এরা তাকে আপন করে নিয়েছে নিজেদের একজন হিসেবে। ওদের সঙ্গে সেও বেয়নেট-চার্জ্ করে স্টেশনটার দখল নিয়েছে।

নড়েচড়ে উঠেছে শহরটা। এই ক'দিনের কষ্টের অভিজ্ঞতার পর শহরের লোকজন তাদের মাটির নিচের কুঠরিগুলো থেকে বেরিয়ে ফটকে এসে দাঁড়াল লাল ফৌজের

দলগুলোর শহরে ঢোকা দেখবার জন্য। এইভাবেই সের্গেইয়ের মা আর বোন ভালিয়া তাকে লাল ফৌজের সৈন্যসারির মধ্যে কদম ফেলে যেতে দেখল। তার মাথায় টুপি নেই, কিন্তু একটা কার্তুজ-বন্ধনী পরে আছে সে আর কাঁধে ঝুলছে একটা রাইফেল।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাতদুটো নাড়ল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্না।

তার ছেলেটা শেষ পর্যন্ত এই সব লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফল পেতে হবে ওকে! দ্যাখো একবার কাণ্ডখানা — গোটা শহরের লোকজনের সামনে দিয়ে কিনা সেরিওঝা কুচকাওয়াজ করে চলেছে রাইফেল নিয়ে! পরে ফ্যাসাদে পড়বে নিশ্চয়।

আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্না আর সামলাতে পারল না নিজেকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'সেরিওঝা, এক্ষুনি বাড়ি আয়! হতভাগা, দেখাচ্ছি দাঁড়া! শিখিয়ে দেব কী করে লড়াই করতে হয়!' এই বলে সে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে এগিয়ে এল।

মায়ের হাতে কত কানমলা খেয়েছে সের্গেই, কিন্তু এবার সে তার মায়ের দিকে দুই চোখের কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকাল, অপমানে আর লজ্জায় লাল হয়ে সে পালটা জবাব দিল, 'চেঁচিও না অতো! আমি যাব না।' বলতে বলতে সে না থেমেই কদম কদম এগিয়ে গেল।

রাগে আত্মহারা হয়ে উঠেছে আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্না, 'এই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গে ব্যবহার! আচ্ছা, এর পরে বাড়ি ফিরবি নে!'

'ফিরব না বাড়ি!' মুখ না ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সের্গেই।

নিতান্ত বিমূঢ় হয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভ্না। তার পাশ দিয়ে রোদে-পোড়া ধুলোয় ভরা লাল ফৌজের সৈন্যের সারি পা ফেলে এগিয়ে গেল।

হাসিখুশিভরা একটা জোরালো গলায় কে-একজন বলে উঠল, 'কেঁদো না, মা! তোমার ছেলেকে আমরা কমিশার করে দেব।'

হালকা খুশিভরা হাসির একটা দমক ছড়িয়ে গেল গোটা পল্টনটার মধ্যে। সৈন্যসারির সামনের দিকে লোকেরা গলা মিলিয়ে গান ধরল:

কমরেড, শোনো ওই বেজে ওঠে ভেরী —
চলো সংগ্রামে, তুলে নাও হাতিয়ার।
মুক্তির রাজ্যকে জয় করে নিতে
যতো বাধা কেটে চলি, গতি দুর্বার।

দুপ্ত সেই ঐকতানে যোগ দিল সৈন্যরা সবাই, আর সের্গেইয়ের কাঁচ তাজা গলা মিশে গেল সেই গানের জোয়ারে। একটা নতুন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সের্গেই। সেখানে তার হাতেও ধরা আছে একটা বন্দুক।

* * *

লেশ্চিনস্কিদের বাড়ির ফটকে এক টুকরো সাদা কার্ডবোর্ড আটকানো আছে। তার গায়ে সংক্ষেপে লেখা: 'বিপ্লবী কমিটি'।

তার পাশেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো আরেকটা পোস্টার: লাল ফৌজের একজন লোক দর্শকের চোখের দিকে তাকিয়ে তার দিকে সোজা আঙুল দেখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার নিচে লেখা — 'তুমি কি লাল ফৌজে ভর্তি হয়েছ?'

ডিভিশনের রাজনীতি বিভাগের লোকেরা সারারাত্রি ধরে শহরের সর্বত্র এই পোস্টারগুলো লাগিয়ে ফিরেছে। পোস্টারের কাছেই ঝুলছে শেপেতোভ্কা শহরের মেহনতীদের উদ্দেশে বিপ্লবী কমিটির প্রথম ঘোষণাপত্র:

কমরেডসব! প্রলেতারীয় ফৌজ এই শহরের দখল লইয়াছে। সোভিয়েত শাসনক্ষমতা আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আপনাদের আহ্বান জানাইতেছি — শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। রক্তপিপাসু খুনীদের হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদের আর কখনও ফিরিয়া আসা যদি না চাহেন, তাহারা নিঃশেষে ধ্বংস হউক — ইহাই যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে লাল ফৌজে সৈন্যদলভুক্ত হউন। মেহনতীদের হাতে যাহাতে ক্ষমতা বজায় থাকে, তাহার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন। এই শহরের সামরিক কর্তৃত্ব এখানে মোতায়েন সেনাবাহিনীর অধিনায়কের হাতে থাকিবে। বেসামরিক কাজকর্মের পরিচালনা করিবেন বিপ্লবী কমিটি।

দোলিন্নিক

বিপ্লবী কমিটির সভাপতি

নতুন এক ধরনের লোকজন দেখা দিয়েছে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে। যে 'কমরেড' কথাটির জন্য লোকের কাল পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়েছে, আজ সেই কথাটাই শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। 'কমরেড!' — কী অনির্বচনীয় আবেগে ভরা কথাটি!

দোলিন্নিকের আর এই ক'দিন ধরে ঘুম বা বিশ্রাম নেই।

বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে সে আজকাল বড় ব্যস্ত। ছোট্ট একটা কামরার দরজায় একটা কাগজের টুকরো ঝুলছে — কাগজটার ওপরে পেন্সিলে লেখা: 'পার্টি কমিটি'। এই ঘরে কমরেড ইগ্নাতিয়েভা তার চিরাচরিত শান্ত আর সুস্থির ভঙ্গিতে

বসে আছে। ইগ্নাতিয়েভা আর দোলিন্নিকের ওপরেই সোভিয়েত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা স্থাপনের ভার দিয়েছে রাজনীতি বিভাগ।

একদিনের মধ্যেই ডেস্কে ডেস্কে বসে গেছে অফিসের কর্মীরা, টাইপ-রাইটারে উঠেছে ব্যস্ত খটাখট আওয়াজ। একটা সরবরাহ কমিশারিয়েট সংগঠিত হয়েছে তিজিৎস্কির নেতৃত্বে — অত্যন্ত চটপটে আর কর্মতৎপর লোক সে, আগে ছিল স্থানীয় চিনি-কলের একজন সহকারী মিস্ত্রি। শহরে সোভিয়েত সরকার কায়েম হবার পরে সে কোমর বেঁধে নেমেছে চিনি-কলের কর্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এই কর্তাদের ইদানীং সময় খারাপ যাচ্ছে, বলশেভিকদের ওপরে নিদারুণ ঘৃণা মনে চেপে রেখে তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কলের শ্রমিকদের এক সভায় সে রুক্ষ আর কঠোর কথা ছুঁড়ে দিয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে, 'আগের অবস্থা আর ফিরে আসতে দেব না আমরা,' কথাটার অর্থের উপরে জোর দিয়ে, মঞ্চের ধারটায় একটা ঘুষি মেরে সে পোলিশ ভাষায় ঘোষণা করল, 'আমাদের বাপ-দাদারা আর আমরা জীবনভোর পতোৎস্কিদের কাছে ঢের গোলামি করেছি। ওদের জন্যে আমরা প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছি, আর মহামান্য কাউণ্টমশাই তার বদলে আমাদের পেট-ভাতা দিয়েছে যাতে আমরা একেবারে না খেয়ে মারা না পড়ি।

'কতোকাল ধরে এই সব পতোৎস্কি-কাউণ্ট আর সাঙুশ্‌কা-রাজপুত্তুরেরা আমাদের ঘাড়ে চেপে বেড়িয়েছে? রাশিয়ান আর ইউক্রেনীয় মজুরদের মতোই পোলিশ মজুরদের রক্তও এই কাউণ্ট পতোৎস্কি শুষেছে। আর এখন কিনা এই পতোৎস্কির দালালরা সেই শ্রমিকদের মধ্যেই গুজব ছড়াচ্ছে যে সোভিয়েত সরকার তাদের শক্ত মুঠোয় বেঁধে জবরদস্তি শাসন চালাবে।

'কমরেডসব, এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা! বিভিন্ন জাতির খেটে-খাওয়া মানুষরা এর আগে আর কখনও এতখানি আজাদি পায় নি।

'প্রলেতারিয়ানরা সব ভাই-ভাই। আর ওই অভিজাতগুলোকে আমরা শিগগিরই ঠাণ্ডা করে দেব, ঠিক জেনো।' বক্তৃতা-মঞ্চের বেড়াটার ওপরে আবার সজোরে নেমে এল তার হাতটা, 'কে আমাদের জাতিতে-জাতিতে ভাগ করে দিয়েছে? ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তারক্তিটা বাধিয়েছে কারা? শত শত বছর ধরে রাজা-রাজড়ারা পোলিশ চাষীদের পাঠিয়েছে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। ওরাই বরাবর এক জাতির মানুষের বিরুদ্ধে আরেক জাতির মানুষকে উস্কিয়ে এসেছে। সেই নিদারুণ খুনোখুনি আর দুঃখদুর্দশার কথাটা ভেবে দেখ একবার! আর তাতে লাভের কড়ি পেয়েছে কারা? কিন্তু এসবই বন্ধ হয়ে যাবে শিগগিরই। ছুঁচোগুলোর দিন ফুরিয়েছে। বলশেভিকরা এমন একটা আওয়াজ তুলেছে যা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠছে বুর্জোয়াদের দিল্:

'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!' এই ধ্বনিই আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখী ভবিষ্যতের সেই সুদিনের আশা, যেদিন তামাম মেহনতী মানুষ ভাই-ভাই হবে। কমরেডসব, সবাই এসে যোগ দাও কমিউনিস্ট পার্টিতে!

'পোলিশ প্রজাতন্ত্রও গড়ে উঠবে একদিন — সেটা হবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, যেখানে পতোৎস্কিদের কোন ঠাঁই থাকবে না। ওদের তখন নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরাই হব সেই সোভিয়েত পোল্যাণ্ডের মালিক। তোমরা তো সবাই ব্রোনিক প্‌তাশিনস্কিকে জানো? বিপ্লবী কমিটি তাকেই আমাদের কারখানার কমিশার নিযুক্ত করেছে। 'আমরা কিছুই ছিলাম না, এবার আমরাই হব সব।' কমরেডসব, আমাদের আনন্দের দিন আসছে। শুধু সাবধান থাকতে হবে — চোরাগোপ্তা সাপগুলোর হিসহিসানিতে কান দিও না যেন! শ্রমিকদের বিশ্বাস অটুট থাকলে আমরা দুনিয়ার তামাম মানুষের ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারব!'

সহজ-সরল একজন মেহনতী মানুষের অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবেগ আর আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হল কথাগুলি। শ্রোতাদের মধ্যে তরুণ যারা তাদের সোৎসাহ কথার মধ্যে সে নেমে এল বক্তৃতার জায়গাটা থেকে। প্রবীণ শ্রমিকরা কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল। কে জানে — কালই হয়তো বলশেভিকরা এই শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে, আর তারপরে যারা রয়ে যাবে তাদেরই শেষে এই সব গরম গরম কথাবার্তার প্রত্যেকটির জন্য চড়া দাম দিতে হবে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচা গেলেও, চাকরিটি যাবে নিশ্চয়।

শিক্ষা-বিভাগের কমিশার ছিমছিমে সুঠাম চেরনোপিজস্কি এ অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত একমাত্র লোক যে বলশেভিকদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। বিপ্লবী কমিটির বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকেই বিশেষ কাজের জন্য তৈরি একটি দলের ঘাঁটি। এর সৈনিকেরা বিপ্লবী কমিটির বাড়িতে ডিউটি দিচ্ছিল। রোজ রাত্রে বাড়িটাতে ঢোকার মুখে বাগানে একটা 'ম্যাক্সিম' মেশিনগান খাড়া থাকে — তার পেছনটায় আটকে থেকে ঝোলে একটা এবড়োখেবড়ো টোটার পাত। রাইফেলধারী দু'জন সান্ত্রী তার দু'পাশে পাহারা দেয়।

বিপ্লবী কমিটিতে যাবার পথে ইগ্নাতিয়েভা ওই দু'জনের মধ্যে একজন তরুণ লাল ফৌজী সৈনিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কতো বয়েস আপনার, কমরেড?'

'সতেরো চলছে।'

'এইখানেই থাকেন?'

লাল ফৌজের ছেলেটা হাসল, 'হ্যাঁ, আমি সবে পরশুদিন লড়াইয়ের সময়ে লাল ফৌজে ঢুকেছি।'

তার মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করল ইগ্‌নাতিয়েভা, 'আপনার বাবা কী করেন?'

'ইঞ্জিন-চালকের সহকারী।'

এমন সময়ে আরেকজন সামরিক পোশাক-পরা লোকের সঙ্গে দোলিন্নিক এসে পড়ল সেখানে। ইগ্‌নাতিয়েভা দোলিন্নিকের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে। কমসমোলের* জেলা কমিটির ভার নেবার মতো ঠিক ছেলেটিকে খুঁজে বের করেছি। এখানকারই ছেলে ও।'

দোলিন্নিক তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল সের্গেইয়ের দিকে — এই ছেলেটিই সের্গেই।

'ও, আচ্ছা। তুমি তো জাখারের ছেলে, না? ঠিক আছে, যাও দেখি, ছোটদের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তোলো।'

বিস্ময়ের চোখে সের্গেই তাকাল তাদের দিকে, 'কিন্তু আমাদের ফৌজী দলের কী হবে?'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দোলিন্নিক বলল, 'ও ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা আমরা করব 'খন।'

দু'দিন পরেই বিকেলের দিকে ইউক্রেনীয় যুব কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় কমিটি স্থাপিত হল।

নতুন জীবনের স্পন্দন জেগে উঠল একেবারে অকস্মাৎ, সেটা সের্গেইকে পেয়ে বসল সম্পূর্ণভাবে, তাকে টেনে নিল তার ঘূর্ণিপাকে। তার সমগ্র অস্তিত্বকে এটা এমনভাবে আচ্ছন্ন করল যে সে এতো কাছে থেকেও নিজের পরিবারকে ভুলে গেল।

সের্গেই ব্রুঝাক এখন একজন বলশেভিক। এই নিয়ে বোধহয় দশবার সে ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির দেওয়া পরিচয়পত্রখানা পকেট থেকে বের করে দেখেছে, তাতে তাকে কমসমোলের সভ্য আর কমসমোল কমিটির সম্পাদক হিসেবে মনোনয়নের কথা লেখা। এতেও যদি কেউ কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে তার রয়েছে প্রিয় বন্ধু পাভেলের উপহার দেওয়া সেই ভারি আর জবরদস্ত মান্‌লিশের পিস্তলটা — হাতে তৈরি ক্যাম্বিসের খাপের মধ্যে তার কোর্তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো। এটা নিশ্চয়ই রীতিমতো নির্ভরযোগ্য একটা পরিচয়পত্র! আহা, পাভলুশকা এখন এখানে নেই!

বিপ্লবী কমিটির দেওয়া নানান কাজে সের্গেইয়ের দিনগুলো কাটছে। আজও ইগ্‌নাতিয়েভা তার অপেক্ষায় ছিল। রেল-স্টেশনে ডিভিশনের রাজনীতি বিভাগে গিয়ে বিপ্লবী কমিটির জন্য খবরের কাগজ আর বইপত্র নিয়ে আসার কথা তাদের। বাড়িটার বাইরে রাস্তায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সের্গেই — রাজনীতি বিভাগের একজন লোক একটা মোটরগাড়ি নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

* যুব কমিউনিস্ট লীগের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

স্টেশন অনেক দূরে। ইউক্রেনের প্রথম সোভিয়েত ডিভিশনের সদর দপ্তর আর রাজনীতিক বিভাগ বসেছে স্টেশনের রেল-কামরাগুলি জুড়ে। সেখানে যাবার পথে ইগ্নাতিয়েভা সের্গেইকে অনবরত প্রশ্ন করে চলল, 'কী রকম চলছে তোমার কাজকর্ম? সংগঠনটা ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছ নাকি? তোমার বন্ধু মজুরদের ছেলেমেয়েদের কমসমোলে যোগ দেবার জন্যে রীতিমতো উৎসাহ দিতে থাকবে। শিগগিরই তরুণ কমিউনিস্টদের একটা দল গড়ে তোলা দরকার আমাদের। কালই আমরা একটা খসড়া তৈরি করে কমসমোলে যোগ দেবার জন্যে প্রচারপত্র ছাপব। তারপর ওই থিয়েটার-ঘরটায় এখানকার তরুণদের নিয়ে বড়ো রকম একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করা যাবে। রাজনীতি বিভাগে গিয়ে আমি উস্তিনোভিচের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, চল। যতদূর জানি, ও এখন তরুণদের মধ্যে কাজ করছে।'

দেখা গেল, উস্তিনোভিচ আঠারো-বছরবয়সী একটি মেয়ে — ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, সরু চামড়ার কোমরবন্ধনী আঁটা, খাকি কাপড়ের নতুন কোর্তা পরা। সের্গেইকে সে তার কাজের অনেকগুলো রীতিনীতি বাতলে দিল, তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিল। সের্গেইয়ের চলে আসার সময় সে তাকে বই আর কাগজপত্তরের মস্তবড়ো একটা বাণ্ডিল দিল, এগুলির মধ্যে একটা বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: কমসমোলের কার্যক্রম আর নিয়মকানুন ছাপা আছে তাতে।

বিপ্লবী কমিটিতে সেদিন একটু বেশি রাতে ফিরে এসে সের্গেই দেখে বাগানে ভালিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছে। সের্গেইকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এভাবে বাড়ি-ছাড়া হয়ে থাকার মানে কী? লজ্জা করে না তোর? কেঁদে কেঁদে মা-র চোখ গেল। বাবা তো ভীষণ চটে আছে তোর ওপর। ভয়ানক একটা বকাবকি হবে কিন্তু।'

'না, তা হবে না।' সের্গেই তাকে আশ্বাস দিল, 'বাড়ি যাবার সময়ই পাচ্ছি না মোটে, সত্যি। আজও যেতে পারব না। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে — কথা আছে তোর সঙ্গে। চল্ ভেতরে যাই।'

ভালিয়া যেন চিনতেই পারছে না তার ভাইকে — রীতিমত বদলে গেছে সের্গেই। উৎসাহে-উদ্দীপনায় ফেটে পড়ছে সে। ভালিয়া বসতে না বসতেই সের্গেই সরাসরি কথাটা পাড়ল, 'শোন্ ভালিয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে — তোকে কমসমোলে যোগ দিতে হবে। সেটা কী জানিস না বুঝি? যুব কমিউনিস্ট লীগ। এখানে ওটার কাজকর্ম আমিই চালাচ্ছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা! দ্যাখ্ তাহলে এটা।'

কাগজটা পড়ার পর ভালিয়া অবাক চোখে তাকালে ভাইয়ের দিকে, 'কমসমোলে এসে আমি কী করব?'

দু'হাত ছড়িয়ে সের্গেই বলল, 'বিস্তর কাজ করবার আছে, ভাই। এই আমাকেই

দ্যাখ্ না—এতো কাজ করতে হয় যে রাতের পর রাত জাগতে হচ্ছে। প্রচার চালাতে হবে আমাদের। ইগ্‌নাতিয়েভা বলছেন, শিগগিরই থিয়েটার-ঘরটায় আমাদের এক সভার ব্যবস্থা করে সোভিয়েত রাজ সম্বন্ধে বলতে হবে। আমাকে বক্তৃতা দিতে বলছেন তিনি। এটা কিন্তু ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না — বক্তৃতা কী করে দিতে হয়, কিছুই জানি না আমি। নির্ঘাত সব ঘুলিয়ে-টুলিয়ে ফেলব। আচ্ছা, তাহলে তোর কমসমোলে আসার কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কী জবাব দেব। মা তো একেবারে ক্ষেপে যাবে তাহলে।'

'মা-র জন্যে ভাবতে হবে না।' পীড়াপীড়ি করতে লাগল সের্গেই, 'মা তো এসব বোঝে না, শুধু ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে আগলে রাখতে পারলেই হল। কিন্তু সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তো মা-র কিছু বলার নেই। বরং মা তার পক্ষেই। কিন্তু মা চায় লড়াইটা করুক অন্য লোকের ছেলেরা। এটা কি ঠিক? ঝুখ্‌রাই কী বলেছিল আমাদের, মনে আছে তো? আর পাভেলকে দ্যাখ্ — সে তো তার মায়ের কথা ভেবে ইতস্তত করে নি। এখন সময় এসে গেছে আমাদের উচিতমতো বেঁচে থাকবার জন্যে। তুই নিশ্চয়ই নারাজ হবি না, ভালিয়া! কী চমৎকার হবে ভেবে দ্যাখ্। তুই মেয়েদের মধ্যে কাজ করবি আর আমি কাজ চালাব ছেলেদের নিয়ে। ভাল কথা মনে পড়ল — আমি আজই ওই কটা-চুলো ক্লিমকা শয়তানটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব। কী বলিস, ভালিয়া? তুই তাহলে আসছিস আমাদের দলে, নাকি? এই ছোট্ট বইটা আছে আমার কাছে — এর মধ্যেই সব বলা আছে।' কমসমোলের নিয়ম-কানুন ছাপা সেই পুস্তিকাটি পকেট থেকে বের করে সের্গেই ভালিয়াকে দিল।

ভাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে ভালিয়া নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পেৎলিউরা যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে?'

এই প্রশ্নটা এ পর্যন্ত সের্গেইয়ের মনে আসে নি। দু'-এক মুহূর্ত সে কথাটা ভেবে নিল। তারপর বলল, 'আর সবার সঙ্গে তাহলে আমাকেও অবশ্য শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু তোর কী হবে? হ্যাঁ, তাহলে মা ভয়ানক কষ্ট পাবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

'আচ্ছা সেরিওঝা, মাকে বা আর-কাউকে কিছু না জানিয়ে তুই আমাকে কমসমোলের সভ্য করে নিতে পারিস না? শুধু তুই জানবি আর আমি জানব! আমি সব কাজে সাহায্য করব। সেইটেই সবচেয়ে ভাল হবে।'

'হ্যাঁ, তোর কথাটা ঠিক মনে হচ্ছে, ভালিয়া।'

এমন সময়ে ইগ্‌নাতিয়েভা ঘরে ঢুকল।

'কমরেড ইগ্‌নাতিয়েভা, এ আমার বোন ভালিয়া। আমি এইমাত্র ওকে কমসমোলে যোগ দেবার কথা বলছিলাম। কমসমোলের সভ্য হিসেবে ও বেশ ভালই হবে, কিন্তু

আমাদের মা গণ্ডগোল বাধাতে পারে। কাউকে না জানিয়ে কি ওকে সভ্য করে নেওয়া যেতে পারে? আমাদের শহর ছেড়ে দিতে হতেও পারে, জানেনই তো। আমি অবশ্য ফৌজের সঙ্গে চলে যাব, কিন্তু ভালিয়ার তখন ভয় — মা বড় মুশকিলে পড়বে।'

টেবিলের এক ধারে বসে ইগ্নাতিয়েভা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল কথাটা। সের্গেইয়ের সঙ্গে সে একমত হল, 'হ্যাঁ, সেইটেই সবচেয়ে ভাল হবে।'

* * *

সারা শহর জুড়ে যে পোস্টার লাগানো হয়েছে, তারই আহ্বানে কিশোর-কিশোরীরা এসে ভর্তি করে তুলেছে থিয়েটার-ঘরটা, তাদের উত্তেজিত কলরবে জায়গাটা মুখর। চিনি-কলের শ্রমিকদের ঐকতান-বাদন চলেছে। সমবেত শ্রোতার দলে আছে প্রধানত স্থানীয় স্কুল তিনটির ছাত্র-ছাত্রীরা — সভায় বক্তৃতা শোনার চেয়ে শেষের দিকে যে অভিনয় হবে, সেইটার প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

শেষ পর্যন্ত পর্দা উঠল। সদর পার্টি কমিটির সম্পাদক কমরেড রাজিন এইমাত্র সদর থেকে এসে পেঁছেছে। সে মঞ্চের ওপরে আসতেই সকলের চোখ গিয়ে পড়ল এই খাটো ছিপছিপে গড়নের ছোট তীক্ষ্ণ নাকওয়ালা মানুষটির দিকে। সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার বক্তৃতা শুনল। গোটা দেশ জুড়ে যে সংগ্রামের জোয়ার জেগেছে তার কথা বলে সে দেশের তরুণদের আহ্বান জানাল কমিউনিস্ট পার্টির চারদিকে সমবেত হবার জন্য। অভিজ্ঞ বক্তার মতোই সে বক্তৃতা দিয়ে গেল, 'গোঁড়া মার্কসবাদী', 'সোশ্যাল-শোভিনিস্ট' ইত্যাদি কতকগুলো কথা সে একটু বেশি বলল, এসব কথা শ্রোতারা ঠিক বুঝে উঠছিল না। তবু, তার বক্তৃতার শেষে সবাই তাকে উচ্ছ্বসিত হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। তারপর, তার পরবর্তী বক্তা সের্গেইকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল।

সের্গেই যা ভয় করেছিল, ঠিক তাই হল: শ্রোতাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ভেবে পেল না কী বলবে। থতমত খেয়ে গেল প্রথমটায়।

এমন সময়ে ইগ্নাতিয়েভা তাকে উদ্ধার করল: টেবিলের সামনে নিজের আসন থেকে সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কমসমোলের একটা 'সেল্' গড়ে তোলার কথা এদের বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে সের্গেই তার বক্তব্যটা সরাসরি পাড়ল।

'কমরেডসব, যা বলার তা তোমরা সবই শুনেছ। আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা 'সেল্' গড়ে তোলা। প্রস্তাবের পক্ষে কারা?'

একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল শ্রোতাদের মধ্যে। উস্তিনোভিচ এগিয়ে এল সাহায্য দেবার জন্য; দাঁড়িয়ে উঠে সে বলে গেল মস্কোর তরুণরা কীভাবে সংগঠিত হয়ে উঠছে। সের্গেই সসংকোচে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

'সেল্' গড়ে তোলার প্রস্তাবটায় শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে রাগ জমে উঠছিল তার। ভ্রূকুটি করে সে তাকিয়ে ছিল সভার দিকে। উস্তিনোভিচের কথায় শ্রোতারা বিশেষ কান দিচ্ছে বলে মনে হয় নি। সের্গেই দেখতে পেল — বক্তৃতামঞ্চে উস্তিনোভিচের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে জালিভানভ কী যেন ফিসফিসিয়ে বলল লিজা সুখারেকোকে। হাই স্কুলের ওপরের শ্রেণীর মেয়েরা পাউডার-মাখা মুখে সামনের সারিতে বসে আশেপাশে তির্যক চোখে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। এক কোণে মঞ্চে উঠবার সিঁড়ির কাছে একদল লাল ফৌজের ছেলে বসে আছে — তাদের মধ্যে সেই তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটিকে সের্গেই দেখতে পেল। মঞ্চের প্রান্তটার ওপরে বসে সে অস্বস্তির সঙ্গে উসখুস করছে আর খোলাখুলি ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে জাঁকালো পোশাক-পরা লিজা সুখারেকো আর আন্না আদ্‌মোভস্কায়াকে — এরা দু'জনে তখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে তাদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলেছে।

কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না বুঝতে পেরে উস্তিনোভিচ তাড়াতাড়ি তার বক্তব্য শেষ করে নিয়ে বসে পড়ল। এর পর বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল ইগ্নাতিয়েভা। তার ধীর-স্থির বক্তৃতার প্রভাবে অস্থির শ্রোতারা এবার মনোযোগী হয়ে উঠল।

ইগ্নাতিয়েভা বলল, 'কমরেডসব, আজ এখানে যেসব কথা তোমাদের বলা হল, সেগুলো তোমাদের প্রত্যেককে আমি ভেবে দেখতে বলছি। আমি নিশ্চয় জানি, তোমাদের মধ্যে বেশ কিছুজন শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় না থেকে বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। তোমাদের জন্যে দরজা সবসময়েই খোলা — যা হয় তোমরাই ঠিক কর। তোমাদের মতামত কী তাও আমরা জানতে চাই। কারুর কিছু বলার থাকলে, তাকে মঞ্চের ওপরে এসে বলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল হল-ঘরে। তারপর পেছনের দিক থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'আমি কিছু বলতে চাই!'

অল্প ট্যারা-চোখ আর বাচ্চা ভালুকের মতো চেহারার মিশা লেভচুকভ নামে একটি ছেলে মঞ্চের ওপর উঠে এসে বলল, 'ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে বলশেভিকদের সাহায্য করাই আমাদের উচিত। আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সেরিওঝ্‌কা আমাকে জানে। আমি কমসমোলের সভ্য হব।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সের্গেইয়ের মুখ।

হট্ করে মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখলে তো কমরেডরা! আমি বরাবর বলে এসেছি — মিশা আমাদের একজন। ওর বাবা ছিলেন রেল-লাইনের পয়েণ্টস্‌ম্যান, গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেন, আর তাই মিশার আর লেখাপড়া শেখা হয়ে উঠল না। কিন্তু এই রকমের সময়ে কী করা দরকার সেটা বুঝবার জন্যে মিশার হাই ইস্কুল শেষ করার প্রয়োজন হয় নি।'

দারুণ একটা হৈ-হল্লা উঠল হল-ঘরের মধ্যে। সযতনে বুরুশ-করা চুলওয়ালা একটি তরুণ কিছু বলতে চাইল। ওকুশেভ্ তার নাম — স্থানীয় এক ওষুধের দোকানওয়ালার ছেলে, হাই স্কুলের ছাত্র। কোর্তাটা টেনে ধরে সে শুরু করল, 'মাপ করবেন, কমরেডরা। আমাদের কী করতে বলা হচ্ছে সেইটেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। আমাদের কি রাজনীতি করতে বলা হচ্ছে? তা যদি হয়, তাহলে পড়াশোনা করব কখন? ইস্কুলটা তো ডিঙোতে হবে আমাদের। এটা যদি কোন খেলাধুলোর সমিতি বা ক্লাব গড়ে তোলার ব্যাপার হত, যেখানে জড়ো হয়ে আমরা পড়াশোনা করতে পারতাম, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে ঢোকা মানে, পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলার ঝুঁকি নেওয়া। মাপ করবেন, কিন্তু এতে কেউ রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না।'

একটা হাসির রোল উঠল হল-ঘরে। ওকুশেভ্ মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আবার তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। পরবর্তী বক্তা সেই তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটি। সক্রোধে কপালের ওপর টুপিটা টেনে নামিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এত হাসি কিসের, জানোয়ার যতসব?'

চোখদুটো তার দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লা, রাগে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। সজোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সে বলে চলল, 'ইভান ঝারকি আমার নাম। বাপ-মা কেউ নেই আমার, বাড়িঘর বলতেও কিছু ছিল না কখনও। রাস্তার ধারে বড়ো হয়ে উঠেছি, রুটির টুকরো ভিক্ষে মেগে ফিরেছি আর বেশির ভাগ দিন কেটেছে উপোস দিয়ে। কুকুরের জীবন কেটেছে আমার — সে জীবন সম্বন্ধে তোমরা, মায়ের আদুরে গোপালরা, কিছুই জান না। তারপরে, সোভিয়েত রাজ কায়েম হল — লাল ফৌজের লোকেরা আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখাশোনা করতে লাগল। পুরো একটা পল্টন আমাকে তাদের পোষ্য হিসেবে নিয়েছে — জামাকাপড় দিয়েছে, লিখতে পড়তে শিখিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা: আমি যে একজন মানুষ — সেই শিক্ষা তারা আমায় দিয়েছে। তাদের জন্যেই আমি আজ বলশেভিক হয়ে উঠেছি এবং মরবার দিনটি পর্যন্ত আমি বলশেভিক থাকব। আমি হাড়ে হাড়ে জানি আমরা লড়াই করছি কিসের জন্যে — আমাদের লড়াই আমাদের মতো এই সব গরিব মানুষদের জন্যে, মজুরদের রাজের

জন্যে। তোমরা তো এখানে বসে বসে দাঁত বের করে হাসছ, আর ওদিকে যে এই শহরের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে দু'শো জন কমরেড মারা পড়েছে সেটা তোমরা জান না...' বলতে বলতে ঝারুকির গলা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল টানটান করে বাঁধা বেহালার তারের মতো, 'প্রাণ দিয়েছে তারা আমাদের সুখের জন্যে, আমাদের আদর্শের জন্যে... দেশের সর্বত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে — প্রত্যেকটি লড়াইয়ের মোর্চায়, আর তোমরা এদিকে নাগরদোলায় চেপে ফুর্তির খেলায় মেতে আছো। কমরেডসব!' — হঠাৎ সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের দিকে ফিরে বলে উঠল সে, 'আপনারা এদের এসব কথা শুনিয়ে বৃথাই সময় নষ্ট করছেন,' হল-ঘরের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দেখাল সে, 'এরা সব আপনাদের কথা বুঝবে ভেবেছেন? মোটেই না! খালিপেটের সঙ্গে ভরপেটের মিতালি নেই। মাত্র একজন আজ এখান থেকে এগিয়ে এসেছে, তার কারণ সেও অনাথ, গরিবদেরই একজন।' সভার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠল সে, 'মরুক গে যাক্! তোমাদের না হলেও আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার জন্যে আমরা হাতজোড় করব না তোমাদের কাছে — জাহান্নমে যাও তোমরা সবশুদ্ধ! একমাত্র মেশিনগানের মারফতই তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যেতে পারে!' হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ কথা চেঁচিয়ে বলে সে মঞ্চ থেকে নেমেই কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল বেরিয়ে যাবার দরজাটার দিকে।

সভাপতিমণ্ডলীর কেউ অভিনয়ের জন্য রইল না।

বিপ্লবী কমিটিতে ফেরার পথে সের্গেই ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! ঝারুকি ঠিকই বলেছে। ওই হাই ইস্কুলের ছেলেমেয়ের পাল নিয়ে আমরা কিছু করে উঠতে পারব না। শুধু হয়রানির চোটে রাগে পাগল হওয়াই সার হবে!'

ইগ্নাতিয়েভা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে প্রলেতারিয়ান তরুণরা আসেই নি বলতে গেলে। বেশির ভাগই এসেছে এখানকার মধ্যবিত্ত ঘরের কিংবা বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েরা — শহরের যত সব কূপমণ্ডুক। তোমাকে ওই চিনি-কল আর করাত-কলের মজুরদের মধ্যে কাজ চালাতে হবে। তবে, এ সভাটা যে একেবারেই কোন কাজের হয় নি, তা নয়। ছাত্রদের মধ্যে কিছু খুব ভাল কমরেড যে আছে সেটা দেখতে পাবে।'

উস্তিনোভিচ ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে একমত হল। সে বলল, 'দেখ সেরিওঝা, আমাদের আদর্শটাকে, আমাদের স্লোগানগুলোকে প্রত্যেকের মনে ঢোকানো আমাদের কাজ। প্রত্যেকটি নতুন ঘটনার তাৎপর্যের দিকে পার্টি সমস্ত মেহনতী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের বহু সভা, সম্মেলন, কংগ্রেস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতি বিভাগ রেল-স্টেশনে একটা গ্রীষ্মকালীন থিয়েটার খুলবে। দু'চার দিনের

মধ্যেই একটা প্রচারের ট্রেন এখানে এসে পড়ার কথা — তখন আমাদের উঠে-পড়ে লাগতে হবে কাজে। লেনিনের কথাটা মনে করে দেখ: জনগণকে, কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষকে সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে না পারলে আমরা জয়ী হতে পারব না।'

সেদিন রাত্রের দিকে উস্তিনোভিচকে স্টেশনে পেঁাছে দিতে গেল সের্গেই। বিদায় নেবার সময় সে দৃঢ় মুঠোয় উস্তিনোভিচের হাতখানা একটু বেশিক্ষণের জন্যই চেপে ধরে রইল। উস্তিনোভিচের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেশ খেলে গেল।

ফেরবার পথে সের্গেই নিজের বাড়িতে এল সবার সঙ্গে দেখা করতে। নিঃশব্দে সে মায়ের তিরস্কার শুনে গেল, কিন্তু তার বাবাও যখন বকাবকিতে যোগ দিলেন, তখন সের্গেই এমনভাবে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল যে বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেল জাখার ভার্সিলিয়েভিচ্।

'আচ্ছা, শোনো বাবা, এই শহর জার্মানদের হাতে থাকার সময়ে তুমি যখন ধর্মঘট করেছিলে আর রেল-ইঞ্জিনের সেই সান্ত্রীটাকে মেরে ফেলেছিলে, তখন তুমি তোমার পরিবারের কথা ভেবেছিলে, না, ভাবো নি ? নিশ্চয় ভেবেছিলে — কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যে পিছপাও হও নি , তার কারণ তোমার শ্রমিকের বিবেক তোমাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গেছে। আমিও পরিবারের কথা ভেবেছি। খুব ভালোভাবেই আমি জানি যদি আমাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাহলে আমার জন্যে তোমাদের ওপরে অত্যাচার চলবে। এদিকে আমরা জিতলে আমরাই শাসন চালাব। কিন্তু তবু, বাড়িতে বসে থাকতে তো পারি না। তুমি নিজেই সব বোঝো, বাবা। তবে আর এতো ঝামেলা কিসের ? আমি একটা ভাল কাজে নেমেছি — বকাঝকা না করে তোমার তো আমাকে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। এসো বাবা, আমরা একটা বোঝাপড়া করে নিই, তাহলে মা-ও আর আমাকে বকুনি দিতে আসবে না।' বাবার দিকে স্বচ্ছ নীল চোখে তাকিয়ে থেকে সের্গেই স্নেহের হাসি হাসল, সে যে ঠিক কথাই বলছে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

অস্বস্তির সঙ্গে বেঞ্চিটার ওপরে নড়েচড়ে বসল জাখার ভার্সিলিয়েভিচ, তারপরে তার ঝাঁকড়া গোঁফ আর খোঁচা দাড়ির আড়ালে মৃদু হাসির ফাঁকে বেরিয়ে এল হলদে দাঁতগুলো।

'শ্রেণী-চেতনার কথাটথা এর মধ্যে টেনে আনছিস, অ্যাঁ, হতভাগা ছোঁড়া। ওই পিস্তলটা বাগিয়ে বেড়াস বলে ভেবেছিস বুঝি আমি তোকে একচোট ধোলাই না দিয়েই ছেড়ে দেব, অ্যাঁ ?'

কিন্তু তার গলার স্বরে বিন্দুমাত্র রাগের চিহ্ন নেই। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে

সে তার গিঁঠে-পড়া হাতখানা ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে রে সেরিওঝা, তোর কাজ তুই চালিয়ে যা। একবার চাবুক হাঁকিয়েছিস যখন, তখন আমি আর রাশ টেনে ধরব না। কিন্তু দেখিস, আমাদের একেবারেই ভুলে যাস না, মাঝে মধ্যে এসে দেখাটেখা করে যাস।'

* * *

রাত্রি। বিপ্লবী কমিটির একটা আলোচনা-সভা বসেছে। দরজাটার একটা ফাটল দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির ওপরে। মখমলের গদি-আঁটা দামী চেয়ার আর আসবাবপত্রে সাজানো বড়ো ঘরটার মধ্যে উকিল লেশ্চিন্স্কির বিরাট টেবিলের ধারে বসেছে পাঁচ জন: দোলিন্নিক, ইগ্নাতিয়েভা, 'চেকা'র* কর্তা তিমোশেঙ্কো — পশমের কসাকটুপি মাথায় তাকে দেখাচ্ছে কির্গিজের মতো, রেলকর্মী শুদিক্ — দৈত্যের মতো দেহখানা তার, আর, ডিপোর শ্রমিক, ভোঁতা-নাক ওস্তাপচুক।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইগ্নাতিয়েভার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলে চলল দোলিন্নিক, 'যুদ্ধসীমান্তে সরবরাহ দিতেই হবে। শ্রমিকদের খেতে হবে তো। আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদাররা আর চোরাবাজারিরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে জিনিসপত্রের। সোভিয়েত মুদ্রা ওরা নিতে চায় না। এখানে চালু শুধু পুরোনো জার-আমলের মুদ্রা, আর না হয় কেরেন্স্কি সরকারের কাগজের নোট। আজ আমাদের বসে সব জিনিসের দাম বেঁধে ফেলতে হবে। এটা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে মুনাফাখোররা কেউই ওই বাঁধা দামে জিনিস বেচবে না। যা আছে সব লুকিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমরাও খানাতল্লাশি চালিয়ে রক্তচোষাদের মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত করে নেব। এখন আর ভালোমানুষি চলবে না। শ্রমিকদের আমরা আর উপোস করিয়ে রাখতে পারি না। কমরেড ইগ্নাতিয়েভা আমাদের সাবধান করছেন যাতে বাড়াবাড়ি রকমের লাঠির ব্যবহার না করে ফেলি। এটা বুদ্ধিজীবীদের দুর্বলচিত্তের পরিচয় বলেই আমার মনে হয়। রাগ করো না, জোয়া, আমি বুঝেই কথা বলছি। যাই হোক, এটা খুদে-ব্যাপারীদের ব্যাপার নয় — আজ খবর পেলাম, সরাইখানাওয়ালা বরিস জোন্-এর বাড়িতে একটা চোরাই গুদাম আছে — পেৎলিউরার দলবল আসার

---

* সারা-রাশিয়া জরুরী কমিশন, সংক্ষেপে ভেচেকা কিংবা চেকা — প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ১৯১৭ সালে সংগঠিত স্থানীয় সংস্থাসমূহ। ১৯২২ সাল পর্যন্ত এগুলির অস্তিত্ব ছিল। — সম্পাঃ

আগে থেকেই বড়ো বড়ো দোকানদাররা প্রচুর মাল সেখানে লুকিয়ে রেখেছে।' একটু থেমে দোলিন্নিক তিমোশেঙ্কোর দিকে একটা তির্যক বিদ্রূপভরা চাউনি হানল।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তিমোশেঙ্কো জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলে?' এ খবরটা আসলে তিমোশেঙ্কোরই রাখার কথা, কিন্তু দোলিন্নিক যে তার চেয়ে বেশি খবরাখবর রাখে — এটা জেনে সে একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

চাপা হেসে বলল দোলিন্নিক, 'সব খবরই রাখি, ভাই। এই গুদামের কথাটা ছাড়াও, এও আমি জানি যে কাল তুমি আর ডিভিশন-কম্যাণ্ডারের মোটরচালক দু'জনে মিলে আধ-বোতল 'সামোগন' উড়িয়েছ।'

তিমোশেঙ্কো নড়েচড়ে বসল তার চেয়ারে, একঝলক রক্ত উঠে এল তার ফ্যাকাসে মুখে।

নিজের অজানতেই দোলিন্নিককে তারিফ জানাল সে, 'দারুণ লোক দেখছি!' কিন্তু ইগ্নাতিয়েভার মুখেচোখে ব্যাপারটাকে অনুমোদন-না-করার ভ্রূকুটি দেখে সে থেমে গেল। বিপ্লবী কমিটির সভাপতি দোলিন্নিকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, 'এই ছুতোর-মিস্ত্রি হতভাগাটার দেখছি নিজেরই একটা 'চেকা' আছে!'

দোলিন্নিক বলে চলল, 'সের্গেই ব্রুঝাক বলেছে আমায়। স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কাজ করত এমন একটি ছেলেকে সে জানে। সেই ছেলেটাই রেস্তোরাঁর রাঁধুনিদের কাছে শুনেছিল যে ওদের যখন যা দরকার হয় সবই প্রচুর পরিমাণে বরিস জোন্ আগে তাদের জোগান দিত। গতকাল সের্গেই ওই গুদামটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পেরেছে। এখন শুধু সেটা ঠিক কোন্ জায়গায় সেইটেই বের করার ওয়াস্তা। ছেলেদের এখুনি কাজে লাগিয়ে দাও, তিমোশেঙ্কো, সের্গেইকেও। যদি ভাগ্যক্রমে মিলে যায়, তাহলে শ্রমিকদের আর গোটা ডিভিশনটাকে খাবার জিনিসপত্র সবই সরবরাহ করতে পারা যাবে।'

আধঘণ্টা বাদে আটজন সশস্ত্র মানুষ সরাইখানাওয়ালার বাড়িতে ঢুকল। সদর দরজায় পাহারায় থাকল দু'জন।

বেঁটে-খাটো, তাগড়া পিপের মতো গোল শরীর মালিকের, একটা পা কাঠের, খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি-ভর্তি মুখ। বিনয়ের অবতার সেজে সে এগিয়ে এল আগন্তুকদের কাছে। ভাঙা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'কী খবর, কমরেডরা? এমন অসময়ে যে?'

জোন্-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়েরা, তারা তাড়াতাড়ি কোনক্রমে ড্রেসিং-গাউন পরে নিয়েছে, তিমোশেঙ্কোর টর্চের উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছে। পাশের ঘরটা থেকে ভেসে আসছে জোন্-এর মুটকী বউয়ের ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ, তাড়াহুড়া করে পোশাক পরছে সে।

'আমরা বাড়িটা খানাতল্লাশি করতে এসেছি,' সংক্ষেপে বলল তিমোশেঙ্কো।

তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হল গোটা বাড়ির মেঝেটা। চ্যালা কাঠের উঁচু স্তূপে বোঝাই একটা বিরাট গোলাঘর, গোটা কতক ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর আর একটা বড়ো তলের ভাঁড়ার — সবই সযতনে খুঁজে দেখা হল। কিন্তু কোথাও চোরা গুদামের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে একজন ঝি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা যে সে এদের ঘরে ঢোকাটা টের পায় নি। সের্গেই আস্তে করে তাকে জাগাল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাজ কর এখানে?'

ঘুমভরা চোখে হকচকিয়ে গিয়ে মেয়েটা তার কাঁধের ওপর কম্বলটা টেনে দিয়ে আলো থেকে হাত দিয়ে আড়াল করল তার চোখদুটো। বলল, 'হ্যাঁ। তোমরা কারা?'

তার কথার উত্তর দিয়ে সের্গেই তাকে জামা-কাপড় পরে নিতে বলে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে।

তিমোশেঙ্কো এদিকে প্রশস্ত খাবার-ঘরটায় জেরা করছে সরাইখানার মালিকটাকে। থুতু ছিটিয়ে দারুণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকটা, 'কী চান আপনারা? আমার আর-কোন ভাঁড়ার-গুদাম নেই। আমি বলছি, বৃথাই সময় নষ্ট করছেন আপনারা। হ্যাঁ, এক সময়ে আমার একটা সরাইখানা ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং আমি একেবারে গরিব। পেৎলিউরার দলবল আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর একটু হলে। সোভিয়েত রাজ কায়েম হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু এই আমার সম্পত্তি বলতে যা-কিছু, সবই আপনাদের চোখের সামনে।' মোটা খাটো হাতদুটো ছড়িয়ে ধরল সে আর সমস্তক্ষণ তার লাল চোখদুটো 'চেকা'র কর্তার মুখ থেকে সের্গেইয়ের মুখের দিকে আর সেখান থেকে এক কোণে আর ছাদের দিকে ঘুরে ফিরে যেতে লাগল।

ঠোঁট কামড়ে ধরল তিমোশেঙ্কো।

'বলবেন না তাহলে? এই শেষবারের মতো হুকুম দিচ্ছি আপনাকে, কোথায় সেই গুদামটা দেখিয়ে দিন।'

সরাইখানা-মালিকের বউটা অবার আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের নিজেদেরই কিছু খাবার নেই, কমরেড অফিসার। যা ছিল সব ওই পেৎলিউরার লোকজন নিয়ে গেছে।' কান্নার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পেরে উঠল না কাঁদতে।

সের্গেই বলে উঠল, 'খেতে পান না বলছেন, এদিকে তো ঝি রেখেছেন দেখছি।'

'ও তো ঝি নয় — গরিব মেয়ে একটা, কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই থাকে। খৃস্তিনার নিজের মুখেই শুনুন।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তিমোশেঙ্কোর। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আচ্ছা, বেশ, এবার তাহলে আমাদের উঠে-পড়ে লাগতেই হচ্ছে!'

দিনের আলো ফুটল। তল্লাশি চলেছে তখনও। তেরো ঘণ্টা ধরে বৃথা খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত হতাশ তিমোশেঙ্কো যখন চলে যাবে বলে মনস্থ করেছে, ঠিক সেই সময়ে ঝি-মেয়েটির ঘরটা খোঁজা শেষ করে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে সের্গেই তার পেছনে মেয়েটির ক্ষীণ ফিসফিসানি শুনল, 'রান্নাঘরে উনুনটার ভেতরে একবার দেখ গে।'

দশ মিনিট বাদেই সেই ভেঙে-ফেলা রুশ চুল্লীটার ফাঁকে একটা লোহার চোরা-দরজার সন্ধান পাওয়া গেল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ-মণ-ভারবাহী একটা লরি পিপে আর বস্তায় বোঝাই হয়ে রওনা হয়ে গেল সরাইখানাটা থেকে। ততক্ষণে বাড়িটাকে ঘিরে উৎসুক এক জনতার ভিড় জমে উঠেছে।

* * *

মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনা করচাগিনা গরমকালে একদিন বাড়ি ফিরে এল তার জিনিসপত্রের ছোট্ট পুঁটুলিটা নিয়ে। পাভেলের ঘটনাটা আরতিওমের কাছে শুনে ভয়ানক কান্নাকাটি করল সে। জীবনটা এখন তার কাছে শূন্য আর নিরানন্দ হয়ে উঠেছে। টাকা-পয়সা ছিল না, কাজের চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে তাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সে লাল ফৌজের লোকদের জামাকাপড় কেচে দেবার জন্য বাড়িতে আনা শুরু করল, তারা তাকে মজুরি বাবদ নগদ পয়সার বদলে সৈন্যদের জন্য বরাদ্দ খাবার দেয়।

একদিন সে জানলার বাইরে আরতিওমের পায়ের শব্দ শুনল — শব্দটা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু দ্রুত। দরজাটা ঠেলে চৌকাঠের ওপর থেকেই আরতিওম জানাল, 'পাভকার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।'

পাভেল লিখেছে:

'প্রিয় ভাই আরতিওম, আমি বেঁচে আছি, তবে খুব একটা ভাল নই। কোমরের নিচে একটা গুলি বিঁধেছিল, অবশ্য এখন সেরে উঠছি ক্রমশই। ডাক্তার বলছেন, হাড়টা অক্ষতই আছে। সুতরাং আমার জন্যে ভেবো না, ঠিক হয়ে উঠব আমি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি হয়ত ছুটি পাব, তখন কিছুদিনের জন্যে একবার বাড়ি যাব। আমি মা-র ওখানে যাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। আমি কমরেড কতোভ্স্কি-পরিচালিত ঘোড়সওয়ার-বাহিনীতে ঢুকেছি। তুমি তাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত তিনি। তাঁর মতো লোক আমি আর দেখি নি, আমাদের এই কম্যাণ্ডার কতোভ্স্কির প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা জন্মেছে। মা

কি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরেছেন ? ফিরে থাকলে তাঁকে আমার ভালোবাসা জানিও। আমার জন্যে তোমার যা যা অসুবিধে ঘটেছে, তার জন্যে মাপ কর।

ইতি, তোমার ভাই পাভেল।

'পুনশ্চ: আরতিওম, দয়া করে বনপরিদর্শকের বাড়ি গিয়ে এই চিঠিটার কথা একবার বলে এসো।'

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা পাভেলের চিঠিখানা নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলল। মাথা-মোটা ছোঁড়াটা হাসপাতালের ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানায় নি।

* * *

স্টেশনের যে সবুজ-রঙের রেল-গাড়িটার গায়ে লেখা আছে 'রাজনীতি বিভাগের আন্দোলন ও প্রচার-দপ্তর', সের্গেই আজকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করে। প্রচার ও আন্দোলন বিভাগের এই গাড়ির একটা কামরায় উস্তিনোভিচ আর মেদভেদেভার অফিস। সের্গেই এলেই তাকে দেখে মেদভেদেভা ঠোঁটে সদাসর্বদা ধরে থাকা সিগারেটের ফাঁকে কৌতুকের হাসি হাসে।

রিতা উস্তিনোভিচের সঙ্গে জেলা কমসমোল কমিটির সম্পাদকের অলক্ষ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। উস্তিনোভিচের সঙ্গে প্রতিবার কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর চলে আসার সময়ে বই আর কাগজপত্রের বাণ্ডিল ছাড়াও অস্পষ্ট একটা খুশির অনুভূতিও সের্গেই বয়ে আনে মনে মনে।

রাজনীতি বিভাগের খোলা থিয়েটারটায় প্রতিদিন বিস্তর শ্রমিক আর লাল ফৌজের লোকের সমাবেশ হচ্ছে। বারো নম্বর আর্মির প্রচার-ট্রেনটা সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল রঙের পোস্টার সেঁটে স্টেশনের একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই কর্মমুখর সেটা। ভেতরে একটা ছাপাখানা বসানো হয়েছে, সেখান থেকে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে ছেপে বেরিয়ে আসছে খবরের কাগজ, পুস্তিকা, ঘোষণাপত্র, ইত্যাদি। লড়াইয়ের ফ্রণ্ট এখান থেকে কাছাকাছিই।

একদিন বিকেলে সের্গেই থিয়েটারে হঠাৎ এসে পড়ে একদল লাল ফৌজের লোকের সঙ্গে রিতাকে দেখতে পেল। সেদিন রাত্রে স্টেশনে রাজনীতি বিভাগের লোকদের থাকার জায়গায় রিতাকে পেঁাছে দেবার সময় সের্গেই হঠাৎ বলে ফেলল, 'কমরেড রিতা সবসময়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে কেন বলো তো ? তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, এতো ভাল লাগে ! তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর প্রতিবারই মনে হয় যেন আমি একটানা চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে যেতে পারি।'

রিতা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'দেখ, কমরেড ব্রুঝাক, এসো একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক: আর কখনো এমন ধারা কাব্যি করে কথা বলো না যেন। ওসব আমি পছন্দ করি নে।'

ধমক-খাওয়া স্কুলের ছেলের মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সের্গেই বলল, 'আমি তো সেরকম কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু দু'জনে... আমি তো প্রতিবিপ্লবী কোন কথা বলি নি, বলেছি কি? বেশ, কমরেড উস্তিনোভিচ, আমি তেমন আর একটা কথাও বলব না!'

তাড়াতাড়ি কোন রকমে রিতার করমর্দন করেই সে বিদায় নিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে গেল শহরের দিকে।

কয়েকদিন স্টেশনের দিকে আর সের্গেই যায় নি। ইগ্নাতিয়েভা তাকে আসতে বললেও সে কাজে ব্যস্ততার দোহাই পেড়ে গেল না। সত্যিই তার কাজ ছিল বিস্তর।

* * *

একদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে শুদিক্ গুলিতে আহত হল। যে-রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল, সেই পাড়াটায় চিনি-কলের ওপরওয়ালা পোলিশ কর্তাব্যক্তিদেরই বেশির ভাগ বসবাস। খানাতল্লাশি চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর 'তীরন্দাজ' নামে একটি পিলসুদ্স্কি সংগঠনের কাগজপত্র পাওয়া গেল।

বিপ্লবী কমিটিতে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। উস্তিনোভিচ উপস্থিত ছিল। সে একপাশে সের্গেইকে ডেকে শান্ত গলায় বলল, 'তোমার সংকীর্ণ আত্মাভিমানে ভারি ঘা লেগেছে দেখছি? ব্যক্তিগত ব্যাপার টেনে এনে তুমি তোমার কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাও? তা চলবে না, কমরেড।'

অতএব সের্গেই আবার আগেকার মতো স্টেশনে সেই সবুজ-রঙের রেল-গাড়িটায় যাতায়াত শুরু করল।

সদর-কমিটির একটা সম্মেলনে উপস্থিত ছিল সের্গেই। দু'দিন ধরে জোরালো তর্কবিতর্কে যোগ দিল সে। তারপর তৃতীয় দিনে সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেল নদীর ওপারে বনের মধ্যে — পুরো একটা দিন-রাত্রি কাটল সেখানে একটা বোম্বেটে দলের সঙ্গে লড়াই করে। এই দলটার নেতা জারুদ্নি নামে পেৎলিউরার একজন সামরিক অফিসার। ফিরে এসে ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে উস্তিনোভিচ্‌কেও দেখতে পেল সে। পরে তাকে স্টেশনে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে বিদায় নেবার সময়ে সে তার হাতখানা জোরে চেপে ধরল।

উস্তিনোভিচ রেগে টেনে ছাড়িয়ে নিল হাতখানা। আবার সের্গেই প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় যাতায়াত বন্ধ করে দিল বেশ কিছু দিনের জন্য, কাজ পড়লেও রিতাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তার এরকম ব্যবহারের জন্য রিতা কৈফিয়ত চাইলে সে কাটা কাটা জবাব দেয়, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ কী? বললেই তো আমাকে হয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, না হয় আত্মাভিমানী সংকীর্ণ, আর না হয় ওই রকম আর একটা কিছু বলে গাল দেবে।'

* * *

ককেশীয় 'লাল-পতাকা' অর্ডারপ্রাপ্ত ডিভিশনের ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। রোদে পোড়া তিনজন কম্যাণ্ডার এসে উঠল বিপ্লবী কমিটিতে। তাদের মধ্যে লম্বা, ছিপছিপে, কোমরে পেটাই করা রুপোর পাতের বেল্ট আঁটা একজন সরাসরি দোলিন্নিকের কাছে এসে দাবি জানাল, 'এক-শো গাড়ি খড় চাই, কোন ওজর চলবে না, যেমন করে হোক জোগাড় করে দিতেই হবে। ঘোড়াগুলো আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে।'

সুতরাং খড় জোগাড় করে আনার জন্য সের্গেইকে পাঠানো হল দু'জন লাল ফৌজের লোকের সঙ্গে। একটা গ্রামে একদল কুলাক্ তাদের আক্রমণ করল। লাল ফৌজের লোক দু'জনের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তারা নির্মম প্রহার দিয়ে ছাড়ল তাদের। ছেলেমানুষ বলে সের্গেই অল্পের ওপর দিয়ে পার পেয়ে গেল। গরিব চাষীদের কমিটির লোকজন তাদের তিনজনকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল শহরে।

একটা সশস্ত্র ফৌজীদলকে পাঠানো হল সেই গ্রামে। পরের দিনই খড় জোগাড় করা হল।

ব্যাপারটা বাড়িতে জানিয়ে সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলার ইচ্ছে ছিল না, তাই সের্গেই সেরে না ওঠা অবধি ইগ্নাতিয়েভার ওখানে থাকল। রিতা উস্তিনোভিচ তাকে এখানে দেখতে এসে সেই প্রথমবার তার হাত এমন নিবিড় আবেগে আর সস্নেহে চেপে ধরল যে সের্গেই নিজে হলে এরকম করতে সাহস করত না।

* * *

একদিন দুপুরবেলায় বেশ গরম পড়েছিল — সের্গেই প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় এল রিতার সঙ্গে দেখা করতে। পাভেলের চিঠিখানা সে তাকে পড়ে

শুনিয়ে তার এই বন্ধুটির সম্বন্ধে কিছু বলল। বেরিয়ে আসার সময় পেছন ফিরে বলল, 'বনে গিয়ে একবার হ্রদটায় একটা ডুব দিয়ে নেব ভাবছি।'

কাজ করতে করতে মুখ তুলে রিতা বলল, 'একটু দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আয়নার মতো মসৃণ আর শান্ত হ্রদটা। উষ্ণ স্বচ্ছ টলটলে জলে আরামের আমন্ত্রণ।

রিতা হুকুম দিল, 'তুমি ওই রাস্তাটার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। আমি এবার জলে নামব।'

সাঁকোটার পাশে একটা পাথরের উপর বসে সের্গেই সূর্যের দিকে তার মুখটা তুলে ধরল। পেছনে রিতার জলে ঝাঁপাঝাঁপির শব্দ তার কানে আসছে।

এমন সময়ে দেখতে পেল, প্রচার-ট্রেনের সামরিক কমিশার চুঝানিন আর তোনিয়া তুমানভা রাস্তা বেয়ে হাত ধরাধরি করে আসছে। কেতাদুরস্ত চামড়ার কোমরবন্ধনী লাগানো অসংখ্য ফিতে আঁটা সুন্দর সামরিক উর্দি-পরা আর ক্রোম-চামড়ার মচমচে বুট পায়ে চুঝানিনকে দেখাচ্ছে দিব্যি সুন্দর ছোকরা। তোনিয়ার সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা বলছে সে।

তোনিয়াকে চিনল সের্গেই — এই মেয়েটিই পাভেলের চিঠি এনে দিয়েছিল। তোনিয়াও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে — যেন তাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে। সামনাসামনি যখন এসে পড়ল ওরা, তখন সের্গেই পকেট থেকে পাভেলের চিঠিখানা বের করে তোনিয়ার কাছে গিয়ে বলল, 'একটু শুনুন, কমরেড। আমার এই চিঠিটায় আপনারও কিছু সংস্রব আছে।'

চুঝানিনের কাছ থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে চিঠিটা নিল তোনিয়া — পড়বার সময় তার হাতের মধ্যে কাগজের টুকরোটা অল্প একটু কেঁপে গেল। সের্গেইকে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওর আর কোন খবর পেয়েছেন ?'

'না,' সের্গেই উত্তরে বলল।

সেই মুহূর্তে রিতার পায়ের নিচে পাথরের নুড়িতে কড়মড় শব্দ বাজতেই চুঝানিন তাকে দেখে তোনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, 'চলো, আমরা বরং চলে যাই।'

কিন্তু রিতার বিদ্রূপ আর ভর্ৎসনায় ভরা স্বরে থেমে পড়ল সে।

'কমরেড চুঝানিন ! ট্রেনে ওরা আপনাকে সারাদিন ধরে খুঁজছে।'

বিরক্তিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুঝানিন বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে ছাড়াই ওরা চালিয়ে নেবে 'খন।'

তোনিয়া আর সামরিক কমিশারের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে রিতা মন্তব্য করল, ‘এই অকর্মাটাকে কবে যে বিদায় করবে!’

ওক্ গাছের বিরাট উঁচু মাথাগুলো হাওয়ার দমকে নাড়া খেয়ে গোটা বনটায় মর্মর ধ্বনি উঠেছে। হ্রদের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা সতেজ মধুরতা। সের্গেই উঠে পড়ল জলে নামবার জন্য।

সাঁতার কেটে ফিরে এসে দেখে, রাস্তার অদূরে একটা কাটা ওক্ গাছের গুঁড়ির ওপর রিতা বসে আছে।

কথা বলতে বলতে তারা বনের গভীরে চলে এল, লম্বা ঘন ঘাসে ভরা একটা ফাঁকা জায়গায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসল তারা। বনের মধ্যে নিবিড় প্রশান্তি। ওক্ গাছগুলো কানাকানি করছে নিজেদের মধ্যে। নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে রিতা এক হাত বিছিয়ে নিল মাথার নিচে। লম্বা ঘাসের মধ্যে তার সুঠাম পাদুটি ঢাকা পড়ল।

হঠাৎ তার পায়ের দিকে চোখ পড়ল সের্গেইয়ের। রিতার ভালো করে তালি মারা বুটজোড়ার দিকে লক্ষ্য করে সে নিজের আঙুল বেরিয়ে পড়া জুতোর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

‘হাসির কী দেখলে?’ জিজ্ঞেস করল রিতা।

নিজের জুতোটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সের্গেই বলল, ‘এরকম বুট পরে আমরা লড়াই করব কী করে?’

জবাব দিল না রিতা। একটা ঘাসের শীষ কামড়াতে কামড়াতে সে অন্য কথা ভাবছে বলে বোঝা গেল। শেষে বলল, ‘চুঝানিনটা অতি বাজে কমিউনিস্ট। আমাদের সমস্ত রাজনীতিক কর্মী ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, ও কিন্তু নিজেরটা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবে না। ও পার্টির মধ্যে দৈবাৎ এসে ঢুকেছে... ফ্রণ্টের অবস্থাটা এদিকে সত্যিই খুব গুরুতর। এখনও দীর্ঘ আর প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদের দেশকে।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘কথা আর বন্দুক—এই দুই দিয়েই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সের্গেই। কমসমোলের শতকরা পঁচিশ জন সভ্যকে ফৌজে যোগ দিতে হবে—কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত শুনেছ তো? আমার মনে হয়, এখানে আর বেশি দিন থাকার মেয়াদ আমাদের নেই।’

ওর কথা বলার মধ্যে কি একটা নতুন সুর শুনতে পেয়ে সের্গেই বিস্মিত হল। নিজের উপর রিতার কালো গভীর চোখের দৃষ্টি অনুভব করে তার সমস্ত বিচার-বিবেচনা চুলোয় দিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে হল, রিতার চোখদুটো যেন আয়নার মতো স্বচ্ছ, কিন্তু যথাসময়ে সে সামলে নিল নিজেকে।

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে রিতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিস্তলটা গেল কোথায় ?'

ক্ষোভের সঙ্গে কোমরবন্ধনীটা নাড়াচাড়া করে সের্গেই বলল, 'সেই কুলাক্‌দের দলটা ছিনিয়ে নিয়েছে।'

রিতা তার কোর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝকঝকে একটা অটোম্যাটিক পিস্তল বের করল। ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে প্রায় পঁচিশ পা দূরে একটা গাছের খাঁজ-কাটা গুঁড়ির দিকে পিস্তলের নলীটা উঁচিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই ওক্‌ গাছটা দেখছ তো ?' বলেই প্রায় নিশানা না করেই সে চোখ-বরাবর পিস্তলটা তুলে ধরে গুলি করল। গুঁড়িটার গা থেকে খানিকটা বাকল টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল নিচে।

'দেখলে তো ?' নিজের কৃতিত্বে ভারি খুশি হয়ে সে আবার গুলি ছুঁড়ল। আর একবার গাছের খানিকটা বাকল টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল ঘাসের বুকে।

'আচ্ছা, নাও,' পিস্তলটা সের্গেইয়ের হাতে দিয়ে কৌতুক করে হেসে রিতা বলল, 'দেখা যাক তোমার দৌড় কতদূর।'

তিনবার গুলি ছুঁড়ে একবার তাগ ফস্‌কালো সের্গেই।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল রিতা, 'আমি ভেবেছিলাম, তাও পারবে না বুঝি।'

পিস্তলটা জমিতে রেখে গা এলিয়ে দিল সে ঘাসের ওপর। তার নিটোল বুকের ওপরে টানটান হয়ে আছে কোর্তাটা।

কোমল গলায় সে বলল, 'এখানে এসো, সের্গেই।'

কাছে সরে এল সের্গেই।

'আকাশটা দেখ একবার। কী নীল! তোমার চোখেরও ওই রঙ। এটা কিন্তু ভাল নয়। চোখের রঙ হওয়া উচিত ছিল ধূসর — ইস্পাতের মতো। নীল রঙটা বড্ড কোমল।'

তারপর হঠাৎ তার সোনালী চুলে ভরা মাথাটাকে চেপে ধরে রিতা তার ঠোঁটে চুমো খেল প্রবল আবেগভরে।

* * *

দু'মাস কেটে গেছে। শরৎকাল।

রাত্রি যেন অলক্ষ্যে এসে গাছগুলোকে সব কালো পর্দায় ঘিরে দিয়েছে। ডিভিশনের সদর দপ্তরের টেলিগ্রাফকর্মীটি ঝুঁকে পড়েছে তার যন্ত্রটার ওপরে: টরেটক্কা শব্দে সংকেত ফুটে উঠছে একটা সরু লম্বা কাগজের ফালির ওপরে, সেটা তার আঙুলের নিচ দিয়ে

এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর সে ফুটকি আর ড্যাশ্‌চিহ্নগুলিকে দ্রুত শব্দ আর কথায় রূপান্তরিত করে চলেছে:

এক-নম্বর ডিভিশনের সদর দপ্তরের অধিনায়ককে — কপি শেপেতোভ্‌কা শহরের বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাছে। এই তার পাবার পরে দশ ঘণ্টার মধ্যে শহরের সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান সরিয়ে ফেলুন। ফ্রণ্টের ভারপ্রাপ্ত 'ক' রেজিমেণ্টের সেনাপতির অধীনে একটা ব্যাটালিয়ন শহরে রেখে যান। ডিভিশনের সদর দপ্তর, রাজনীতি বিভাগ এবং সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানকে বারাণ্চেভ্‌ স্টেশনে স্থানান্তরিত করুন। এই নির্দেশ ঠিকমতো পালন করা হল কিনা, তা ডিভিশনের সর্বাধিনায়ককে জানান।

ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক
(স্বাক্ষরিত)

দশ মিনিট বাদেই একটা মোটরসাইকেল তার হেড-লাইটের আলোয় অন্ধকার চিরে শহরের ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সেটা থামল বিপ্লবী কমিটির বাড়ির সদরে। মোটরসাইকেল-চালক দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে সভাপতি দোলিন্নিকের হাতে টেলিগ্রামখানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট কর্মিদল প্রস্তুত হয়ে নিল তাড়াতাড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যেই বিপ্লবী কমিটির জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে গাড়িগুলো শহরের পথে পথে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে চলল পদোল্‌স্ক স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে মালপত্রগুলো রেলগাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

টেলিগ্রামের খবরটা শুনে সের্গেই মোটরসাইকেল-চালকের পেছনে বাইরে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে একটু স্টেশনে পেঁাছে দেবেন, কমরেড ?'

'চেপে বসো পেছনে, কিন্তু সাবধান আঁকড়ে ধরে থাকবে জোরে।'

প্রচার-আন্দোলনের গাড়িখানা ইতিমধ্যেই ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দশ-বারো পা দূরে রিতাকে দেখতে পেল সের্গেই। সে অনুভব করল, অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আজ তার কাছ-ছাড়া হতে চলেছে। তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিদায় প্রিয় কমরেড রিতা ! আবার একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবেই। ভুলো না আমাকে।'

কান্নায় তার গলা ধরে আসছে বুঝতে পেরে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল সে। এখুনি তার চলে যাওয়া দরকার। আর কথা বলতে না পেরে সের্গেই শুধু সজোরে রিতার হাতদুটো চেপে মুচড়ে দিতে লাগল।

* * *

সকালে দেখা গেল শহর আর স্টেশন নির্জন, ফাঁকা। শেষ ট্রেনটা যেন বিদায়-ঘোষণায় সিটি বাজিয়ে বেরিয়ে গেছে। শহরে রেখে যাওয়া হয়েছে যাদের, সেই পশ্চাদ্‌রক্ষী ব্যাটালিয়নটি রেল-লাইনের দু'ধারে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে আছে।

গাছের ডালগুলোকে রিক্ত করে দিয়ে হলদে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে। পড়ন্ত পাতাগুলো হাওয়ার তাড়নায় মর্মর ধ্বনি তুলছে পথে পথে।

লাল ফৌজের ওভারকোট পরে কাঁধের ওপর কার্তুজ-আঁটা ক্যাম্বিসের ফিতে ঝুলিয়ে সের্গেই আরও দশজন লাল ফৌজের সৈনিকের সঙ্গে মিলে চিনি-কলের সামনের চৌরাস্তায় পাহারায় খাড়া। পোলিশ সৈন্যরা আসছে।

* * *

আন্‌তোনম পেত্রভিচ তার পড়শী গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচের দরজায় কড়া নাড়ল। গেরাসিমের এখনও রাত্রির ঘুমের পোশাক ছাড়া হয় নি। দরজার ফাঁকে মুখটা বের করে শুধোয়, 'কী ব্যাপার?'

রাস্তা দিয়ে চলেছে অস্ত্রসজ্জিত লাল ফৌজের সৈন্যরা — তাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আন্‌তোনম পেত্রভিচ চোখ টিপে বলল, 'ওরা চলে যাচ্ছে।'

গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচ চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পোলিশদের প্রতীক-চিহ্ন কী রকমের, জানেন?'

'এক-মুণ্ডুওয়ালা একটা ঈগল, যতদূর জানি।'

'কোন্ চুলোয় পাওয়া যেতে পারে সেটা, বলুন দেখি?'

বিব্রতভাবে তার মাথাটা একবার চুলকে নিল আন্‌তোনম পেত্রভিচ। তারপর দু'-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'এই এদের আর ভাবনা কি। স্রেফ গুটিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। আর তোমাকে-আমাকে ভেবে মরতে হবে নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানিয়ে চলা যায় কেমন করে।'

* * *

নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল মেশিনগানের খটাখট আওয়াজে। স্টেশনের দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের সিটি ভেসে এল। সেই দিক থেকেই শুনতে পাওয়া গেল কামানের গুমগুম শব্দ। একটা ভারি গোলা অনেক উঁচু দিয়ে শূন্যে হাওয়া কেটে এসে প্রচণ্ড

শব্দে আছড়ে পড়ল চিনি-কলের ওপাশের রাস্তাটায়। একরাশ নীল ধোঁয়ায় ঢেকে গেল রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়গুলো। নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে পেছনে হঠে চলা লাল ফৌজের সেনাদল সারি-বেঁধে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যেতে যেতে ঘন ঘন পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে তারা।

সের্গেইয়ের গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে ফেলে আশেপাশের কমরেডদের চোরা-চাউনিতে দেখে নিল — কেউ তা লক্ষ্য করে নি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য।

সের্গেইয়ের পাশাপাশি চলেছে আন্তেক ক্লপোতোভ্স্কি — করাত-কলের লম্বা রোগা একজন মজুর। তার রাইফেলের ঘোড়াটার ওপরে ধরে রেখেছে সে আঙুলটা। বিষণ্ণ-গম্ভীর আর চিন্তামগ্ন আন্তেকের সঙ্গে সের্গেইয়ের চোখাচোখি হতেই বলে উঠল সে, 'ওরা আমাদের লোকজনের ওপরে — বিশেষ করে আমার পরিবারের ওপরে — দারুণ অত্যাচার চালাবে, কারণ আমরা পোলিশ। বলবে, 'পোলিশ হয়েও কিনা পোলিশ লিজিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ।' নিশ্চয় ওরা আমার বুড়ো বাবাকে করাত-কল থেকে লাথি মেরে হাঁকিয়ে দিয়ে চাবুক-পেটা করবে। বাবাকে বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই সে পরিবারের আর-সবাইকে ছেড়ে আসতে চাইল না। আমার আর তর সইছে না ওই হারামজাদা শুয়োরগুলোকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে!' প্রায় চোখের ওপরে নেমে আসা তার শিরস্ত্রাণটাকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঠেলে সরিয়ে দিল আন্তেক।

...বিদায়, শেপেতোভ্কা! তুমি অসুন্দর, অপরিচ্ছন্ন তোমার পথ-ঘাট, কুৎসিত তোমার ছোট ছোট বাড়িগুলো, বাঁকাচোরা এলোমেলো তোমার সড়ক — তবু তুমি পুরাতনী, চিরপ্রিয়া। বিদায়, প্রিয়জনেরা — ভালিয়া, আর অন্যান্য কমরেডরা যারা গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য থেকে গেলে, তোমাদের সকলের কাছে বিদায়! পোলিশ লিজিয়ন এগিয়ে আসছে — নির্মম, ভয়ংকর, বেপরোয়া!

তেলচিটে কোর্তা গায়ে রেল-শ্রমিকরা বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল লাল ফৌজের চলে যাওয়ার দিকে।

'আমরা আবার আসব, কমরেড!' — বেদনার্ত মনে চেঁচিয়ে উঠল সের্গেই।

অষ্টম অধ্যায়

প্রত্যূষের কুয়াশায় অস্পষ্ট নদীটার ঝিকিমিকি তেমন ফুটছে না। দুই তীরের মসৃণ নুড়িগুলোয় জলের চাপড়ে মৃদু কুলকুল শব্দ উঠছে। পাড়-ঘেঁষা চড়ার কাছে অগভীর জলে নদী শান্ত, সেখানে রুপোলী বুকে তার যেন ঢেউয়ের ওঠা-পড়া প্রায় নেই বলেই

মনে হয়। মাঝ-দরিয়ায় কিন্তু জলের স্রোত গভীর আর অশান্ত বেগে পাক খেয়ে বয়ে চলেছে। নীপারের এই মহিমাময় সৌন্দর্য গোগলের রচনায় অমর হয়ে আছে। ডান দিকের উঁচু পাড়টা খাড়া নেমে গেছে জলে — যেন একটা পাহাড়ের অগ্রগতি থমকে গেছে ফুঁসে ওঠা জলের প্রতিরোধে। ওপারে প্রায়-সমতল বাঁ-পাড়টার বুকে এখানে-ওখানে বালিয়াড়ি — বসন্তকালে ঢলের শেষে নদীর জল সরে গিয়ে ওগুলো জেগে উঠেছে।

নদীর পাড়ে একটা ছোট ট্রেঞ্চের মধ্যে ভোঁতা-নলওয়ালা একটা 'ম্যাক্সিম' মেশিনগানের পাশে পাঁচজন। এটা সাত-নম্বর রাইফেল-ডিভিশনের একটা সামনের ঘাঁটি। নদীর দিকে মুখ করে মেশিনগানের সবচেয়ে কাছাকাছি কাত হয়ে শুয়ে আছে সের্গেই ব্রুঝাক।

আগের দিন অবিশ্রাম লড়াইয়ের পরে নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পোলিশ গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলির ঝাপটায় হঠে তারা কিয়েভ ছেড়ে দিয়ে এসে এখন নদীর বাঁ-পাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে।

এই পিছিয়ে আসা, প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুর হাতে কিয়েভকে ছেড়ে দিয়ে আসার ফলে এরা ভয়ানক আঘাত পেয়েছে। সাত-নম্বর ডিভিশনটি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। বনের মধ্য দিয়ে পথ কেটে মালিন্ স্টেশনে রেল-লাইনের কাছে বেরিয়ে এসে তারা প্রচণ্ড একটা পাল্টা আঘাত হেনে পোলিশ ফৌজকে পিছু হঠিয়ে দিয়ে কিয়েভের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

কিন্তু পরে সেই সুন্দর শহরটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে; লাল ফৌজের সৈন্যদের মনে দারুণ আফসোস।

লাল সৈন্যদলগুলিকে দারনিৎসা থেকে হঠিয়ে দেবার পর পোলিশ সেনাবাহিনী এখন নদীর বাঁ-ধারে রেল-সাঁকোটার পাশে ছোট ঘাঁটি দখল করে আছে। কিন্তু প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে তাদের এর বেশি এগুনোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আগের দিনের ঘটনাগুলো সের্গেই ভাবছিল মনে মনে।

গতকাল দুপুরে তার সৈন্যদল পোলিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে। কালকেই সে প্রথম শত্রুর সঙ্গে সরাসরি হাতাহাতি লড়াই করেছে। রাইফেলের আগায় লাগানো লম্বা তলোয়ারের মতো ফরাসী বেয়নেট সামনে বাগিয়ে ধরে তার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিল পোলিশ লিজিয়নের একজন তরুণ সৈন্য; দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে বলতে খরগোসের মতো সে সের্গেইয়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য তার উন্মাদের মতো চোখদুটো সের্গেই দেখতে পেয়েছিল। পরমুহূর্তেই

পোলিশটার বেয়নেটের সঙ্গে সের্গেইয়ের বেয়নেটের ঠোকাঠুকি হতেই চকচকে ফরাসী বেয়নেটটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল একপাশে। মুখ থুবড়ে পড়েছিল পোলিশ ছেলেটা...

হাত কাঁপে নি সের্গেইয়ের। সে জানে — এরকম আরও অনেক মানুষ মারতে হবে। যে-সের্গেই এতো নিবিড় মধুর আবেগে ভালবাসতে পারে, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে, সেই সের্গেইকেই আবার হত্যাও করতে হয়। তার স্বভাবের মধ্যে কোনরকম নিষ্ঠুরতা নেই, কোন পাপ নেই। কিন্তু সে জানে তাকে এই বিপথচালিত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে — দুনিয়ার যতো পরগাছারা ওদের মনের মধ্যে পাশব বিদ্বেষের একটা উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে ঠেলে পাঠিয়েছে সের্গেইয়ের দেশের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাকেই — সের্গেইকেই — আজ হত্যা করতে হবে যাতে যেদিন মানুষ আর মানুষকে মারবে না সেইদিনটি দ্রুত এগিয়ে আসে।

পারামোনভ আস্তে করে তার কাঁধে চাপড় মারল, 'চল, সের্গেই, এবার যাওয়া যাক বরং, নইলে ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে।'

* * *

এক বছর ধরে পাভেল করচাগিন দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে — কখনও ঘোরে মেশিনগানের গাড়িতে বা কামান-বওয়া খোলা গাড়িতে, কখনও ঘোরে ধূসর রঙের এক-কান-কাটা ছোট ঘোড়ায় চেপে। সে এখন সুপরিণত মানুষ, নানান কষ্টের মধ্যে দিয়ে অসুবিধে সয়ে সয়ে তার মন পরিণত, তার শরীর শক্ত-সমর্থ। কার্তুজ-আঁটা ভারি ফিতের ভারে তার গায়ের কোমল চামড়ায় যে ফোসকা পড়েছিল তা অনেকদিন হল সেরে গেছে, রাইফেল-ঝোলানো চামড়ার ফালিটার নিচে কাঁধের ওপর কড়া পড়ে গেছে।

এই এক বছরে পাভেলের অনেক কিছু নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশের চতুর্দিকে কুচকাওয়াজ করে ফিরেছে সে তারই মতো ছেঁড়াখোঁড়া অপ্রতুল পোশাক-পরা আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে — সেই সব মানুষ, যাদের মনে নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে দুর্জয় সংকল্পের উদ্দীপনা জ্বলছে। মাত্র দু'বার সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে পাভেল উপস্থিত থাকতে পারে নি — প্রথম বার, যখন তার কোমরের নিচে গুলি বিঁধেছিল, আর দ্বিতীয় বার, ১৯২০-র ফেব্রুয়ারির সেই নিদারুণ শীতে, সে তখন টাইফাস্ রোগের চটচটে গরমে-ঘামে ছটফট করছিল।

বারো-নম্বর আর্মির বিভিন্ন রেজিমেণ্টে আর ডিভিশনে যত লোক পোলিশ মেশিনগানের গুলিতে মারা পড়েছে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি লোক মারা গেছে

টাইফাস্ রোগে। সেই সময়ে বারো-নম্বর আর্মি প্রায় গোটা উত্তর ইউক্রেন জুড়ে বিরাট একটা এলাকায় লড়াই চালাচ্ছিল, যাতে পোলিশরা আর এগুতে না পারে।

অসুখটা থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পাভেল এসে যোগ দিয়েছে তার সৈন্যদলে। তারা এখন কাজাতিন — উমান শাখা-রেললাইনের ওপরে ফ্রন্তোভ্কা স্টেশনটা দখল করে আছে।

ফ্রন্তোভ্কা স্টেশনটার চারিদিকে বন। ছোট একটা স্টেশনঘর আর তার চারপাশে কতকগুলো ভাঙাচোরা ফাঁকা কুঁড়েঘর নিয়ে জায়গাটা। তিন বছর ধরে প্রায়ই যুদ্ধ চলার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বেসামরিক জীবন একেবারে অসম্ভব হয়ে গেছে। কতবার যে হাত-বদল হয়েছে এই ফ্রন্তোভ্কা তার ইয়ত্তা নেই।

আবার কতকগুলো গুরুতর ঘটনা ঘটতে চলেছে। বারো-নম্বর আর্মির সৈন্যসংখ্যা ভয়ানক রকম কমে গেছে, আংশিকভাবে তাদের সংগঠনও ভেঙে পড়েছে, পোলিশ সৈন্যবাহিনীর চাপে কিয়েভ পর্যন্ত পিছিয়ে আসছে তারা — এমন সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত পোলিশ শ্বেতরক্ষীদের ওপরে একটা মোক্ষম আঘাত হানবার জন্য প্রজাতন্ত্র তার সমস্ত শক্তি সংহত করতে লেগেছে।

এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির ডিভিশনগুলিকে সেই উত্তর ককেশাস থেকে বদলি করে আনা হচ্ছে একেবারে ইউক্রেনে। বহু যুদ্ধের আগুনে পোড়-খাওয়া সব লোক এরা। সামরিক ইতিহাসে অতুলনীয় এক অভিযানে এদের লাগানো হচ্ছে। উমান অঞ্চলে একে একে এসে জড়ো হয়েছে চার-নম্বর, ছ'-নম্বর, এগারো-নম্বর আর চোদ্দ-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন। এখানে আসার পথে তারা মাখ্নোর বোম্বেটে দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসে, এবার ফ্রন্টের পেছন-ঘাঁটিতে নিজেদের শক্তি সংহত করে নিচ্ছে — সাড়ে ষোল হাজার তরোয়াল, স্তেপ অঞ্চলের কড়া রোদে পোড়-খাওয়া সাড়ে ষোল হাজার সৈনিক।

শত্রুপক্ষ যাতে এই চরম আঘাতটা ব্যর্থ করে দিতে না পারে, সেইটেই এই সন্ধিক্ষণে লাল ফৌজের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের আর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সামরিক নেতৃত্বের সবচেয়ে মুখ্য ভাবনা। এই বিরাট ঘোড়সওয়ার বাহিনীটার যাতে ঠিকমতো সমাবেশ হতে পারে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উমান্-এর দিকটায় লড়াই বন্ধ রাখা হয়েছে। মস্কো থেকে ফ্রন্টের সদর দপ্তর খারকভ পর্যন্ত আর সেখান থেকে চোদ্দ-নম্বর আর বারো-নম্বর আর্মির সদর ঘাঁটি পর্যন্ত যোগাযোগের টেলিগ্রাফ-লাইন অবিরাম কর্মমুখর। টেলিগ্রাফ অপারেটররা অনবরত সাংকেতিক ভাষার হুকুম-নির্দেশ নিতে ব্যস্ত: 'ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সমাবেশের দিক থেকে পোলিশদের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও।' যখন মাঝে মাঝে পোলিশ

সৈন্যদের এগিয়ে আসার ফলে বুদিওনি-ঘোড়সওয়ার ডিভিশনগুলি বিব্রত হয়ে পড়ছে, শুধু তখনই শত্রুকে রুখবার জন্য লড়াই চালানো হচ্ছে।

সৈন্যদের তাঁবুর একপাশে আগুনের কুণ্ডলী জ্বলছে লাল শিখার ফুলকি ছড়িয়ে। আগুন থেকে ধোঁয়ার রাশি পাক খেয়ে খেয়ে উঠে গুনগুন শব্দ তোলা অস্থির মশার ঝাঁকগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বলন্ত কুণ্ডলীটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে মানুষগুলো বসে আছে, আগুনের আলোয় একটা তামাটে আভা ফুটেছে তাদের মুখে। আগুনের ধারে ধারে বসানো নীলচে-ধূসর গরম ছাইয়ের ওপর বসানো টিনের পাত্রগুলোয় জল ফুটছে।

একটা জ্বলন্ত কাঠের তলা থেকে আগুনের একটা শিখা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে ওদের মধ্যে একজনের ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ওপর পড়ল। মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বিরক্তিভরা গলায় বিড়বিড়িয়ে বলল, 'ধুত্তোরি ছাই!'

আগুনের পাশে আর-যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একদমক হাসির রোল উঠল।

গোঁফ-ছাঁটা একজন মধ্যবয়সী সৈনিক আগুনের আলোয় তার রাইফেলের নলটা পরীক্ষা করছিল — সে বলে উঠল, 'বই পড়ায় এতোই আত্মহারা ছেলেটা যে আগুনে পুড়লেও খেয়াল করে না।'

কে-একজন বলল, 'কী পড়ছ, আমাদের সবাইকে একটু শোনাও না, করচাগিন?'

লাল ফৌজের ওই তরুণ সৈনিকটি মাথা থেকে এক গোছা পোড়া চুল টেনে ফেলে মৃদু হাসল, 'সত্যিকারের একটা ভাল বই কমরেড আন্দ্রোশ্চুক। শেষ না করে আর কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।'

করচাগিনের পাশের বোঁচা-নাক ছেলেটা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার থলেটার ছেঁড়া-ফিতে মেরামত করছিল — সে জিজ্ঞেস করল, 'বইটা কী সম্বন্ধে?' মোটা সুতোটা দাঁতে কেটে বাকিটা ছুঁচের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে টুপিতে সেটাকে আটকে রেখে সে বলল, 'যদি প্রেমের গল্প হয়, তাহলে শুনতে রাজি আছি।'

একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল এই মন্তব্যে। মাৎভেইচুক তার ছোট করে ছাঁটা চুলওয়ালা মাথাটা তুলে সেই বোঁচা-নাক ছেলেটার দিকে একটা চতুর ভঙ্গিতে চোখ টিপে বলল, 'প্রেম বড়ো ভাল জিনিস, সেরেদা। আর তোমার চেহারাটাও খাসা — একেবারে পটের ছবিটির মতো। আমরা যেখানেই যাই, তোমার পেছনে ছুটোছুটি করে মেয়েদের তো জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যাবার জোগাড়। তবে তোমার মতো এমন সুন্দর সুপুরুষের চেহারাতেও একটা ছোট খুঁত আছে, এইটে বড়ো দুঃখের কথা: নাকের বদলে তোমার মুখের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা পাঁচ-কোপেক মুদ্রা। কিন্তু সেটা সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায় — এক রাত্তিরের জন্যে শুধু নাকের সঙ্গে

একটা পাঁচ-সেরী 'নভিৎস্কি'* বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো, ব্যস্, সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠাট্টাটুকু শুনে এমন উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল সবাই যে মেশিনগান বইবার গাড়িগুলোর সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ছটফটিয়ে উঠল।

সেরেদা গ্রাহ্য না করার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে তাকাল। তারপর বেশ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কপালের পাশে ঠোকা মেরে বলল, 'মুখের সৌন্দর্যের চেয়ে এর ভেতরে কী আছে সেইটেই বড়ো কথা। এই তোমার কথাই ধরো — তোমার জিভটা তো বোলতার হুলের মতো, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার গাধার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি নয়, একটা কথার মানে বুঝতেই তোমার এক বেলা লেগে যায়।'

দু'জনে প্রায় মারামারি বেধে যায় আর-কি, এমন সময়ে বিভাগীয় কম্যাণ্ডার তাতারিনভ্ তাদের শান্ত করল, 'আহা, রাগারাগি করছ কেন, ভাই? বরং ততক্ষণ করচাগিন আমাদের পড়ে শোনাক দেখি শোনার মতো কিছু যদি থাকে।'

'সেই ভাল। শুরু কর, পাভ্লুশ্কা!' চারিদিক থেকে বলে উঠল সবাই।

একটা ঘোড়ার জিন আগুনের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার ওপর বসে পাভেল ছোট মোটা বইটা তার হাঁটুর ওপর রেখে পাতা ওলটাল।

'কমরেড, বইটার নাম 'দি গ্যাড্ফ্লাই'। ব্যাটালিয়ন কমিশার বইটা আমাকে দিয়েছেন। চমৎকার বই। তোমরা যদি চুপ করে বসে শোন, তাহলে পড়তে পারি।'

'লাগাও, লাগাও! কিচ্ছু ভেবো না — কেউ বাধা দেবে না।'

কিছুক্ষণ বাদে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার কমরেড পুজিরেভ্স্কি তার কমিশারের সঙ্গে এদের অলক্ষ্যে আগুনের কাছে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে দেখে — একজন বই পড়ছে আর এগারো জোড়া চোখ তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কমিশারের দিকে ফিরে ওদের দেখিয়ে কম্যাণ্ডার বলল, 'আমাদের রেজিমেণ্টের স্কাউট-দলের অর্ধেকই এখানে আছে দেখছি। এদের মধ্যে চারজন একেবারে সদ্য কমসমোল থেকে এসেছে, বয়েসেও ছেলেমানুষ। কিন্তু এরা সবাই খুব ভাল সৈনিক। যে ছেলেটা পড়ছে, তার নাম করচাগিন। আর ওই যে বসে আছে, যার চোখদুটো নেকড়ের বাচ্চার মতো, ওর নাম ঝারকি। ওরা দু'জনে বন্ধু, কিন্তু আবার ওদের দু'জনের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতাও চলছে সবসময়। করচাগিনই এ পর্যন্ত আমাদের দলে সবচেয়ে ভাল স্কাউট ছিল, কিন্তু এখন ওর রয়েছে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন ওরা

---

* এক ধরনের হাত-বোমা, প্রায় সাড়ে চার সের ওজন, কাঁটাতারের বেড়াজাল উড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। — সম্পাঃ

যা করছে এটা রাজনীতিক কাজ, এতে বেশ ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এমন ছেলেদের খুব জুতসই নাম বানানো হয়েছে 'তরুণ প্রহরী'। ভারি জুতসই হয়েছে নামটা, আমার মনে হয়।'

কমিশার জিজ্ঞেস করল, 'যে পড়ছে, ওই কি এদের রাজনীতিক পরিচালক?'

পায়ের গুঁতো মেরে ঘোড়াটা হাঁকিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে পুজিরেভ্স্কি বলল, 'না। ক্রামের এদের রাজনীতিক পরিচালক।'

'এই যে, কী খবর কমরেডরা!' হেঁকে উঠল সে।

সবাই ফিরে তাকাল কম্যাণ্ডারের দিকে। সে ততক্ষণে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে দলটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'শরীরটাকে একটু গরম করে নিচ্ছ নাকি, ভাই?' দরাজ হাসি হেসে কথাটা বলার সময়ে তার অল্প-চেরা মঙ্গোলীয় চোখের আর শক্ত মুখের কড়া ভাবটুকু একেবারে মুছে গেল।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কমরেডকে যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়, এরা সবাই ঠিক তেমনিভাবেই তাদের কম্যাণ্ডারকে অভিবাদন জানাল। কমিশার নামল না ঘোড়া থেকে।

খাপে-ভরা মাউজার-পিস্তলটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে পুজিরেভ্স্কি করচাগিনের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'একটা করে সিগারেট খাওয়া যাক? খুব ভাল খানিকটা তামাক আছে আমার কাছে।'

একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে নিয়ে সে কমিশারের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এগোও, দরোনিন। আমি একটু বসি। আমাকে সদর ঘাঁটিতে দরকার পড়লে জানিও।'

দরোনিন চলে গেলে পুজিরেভ্স্কি করচাগিনকে বলল, 'আচ্ছা, পড়ে যাও, আমিও শুনব।'

শেষ পর্যন্ত পড়ার পর পাভেল বইটা হাঁটুর ওপরে নামিয়ে রেখে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। সবাই ভাবছে 'গ্যাডফ্লাই'এর মর্মান্তিক পরিণতির কথা।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুজিরেভ্স্কি রইল আলোচনা আরম্ভ হবার অপেক্ষায়।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সেরেদা বলল, 'বড়ো ভয়ানক কাহিনী। দেখা যাচ্ছে — পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে। 'গ্যাড্ফ্লাই' যা করেছে, খুব কম লোকই তা পারে।

কিন্তু মানুষ যখন লড়াই করবার মতো একটা আদর্শ খুঁজে পায়, তখন সে যেকোন কষ্ট সইবার বলিষ্ঠতা অর্জন করে।'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দারুণ নাড়া খেয়েছে সেরেদার মন। বইটা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে।

আন্দ্রিউশা ফমিচেভ রাগে গর্জে উঠল, 'ওই যে পাদ্রীটা ওর মুখের মধ্যে একটা ক্রুশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওই হারামজাদাটাকে হাতের কাছে পেলে পিষে মারতাম এখুনি!' — ফমিচেভ বেলায়া-সের্কভ থেকে এসেছে, সেখানে ও ছিল একজন মুচির সহকারী।

কাঠি দিয়ে একটা মেস্‌টিন আগুনের কাছাকাছি ঠেলে দিয়ে গভীর বিশ্বাস-ভরা গলায় আন্দ্রোশ্চুক বলল, 'মরবার মতো একটা সত্যিকারের আদর্শ থাকলে মানুষ মরতে কুণ্ঠিত হয় না। আদর্শই মানুষকে শক্তি জোগায়। যা করছি ঠিকই করছি — এটা জানা থাকলে সব সহ্য করে বীরের মতো মরা যায়। আমি একটা ছেলেকে জানতাম, পোরাইকা তার নাম। ওদেসায় শ্বেতরক্ষীরা তাকে কোণঠাসা করে ফেললে সে একাই একটা গোটা পল্টনের বিরুদ্ধে এগিয়েছিল। তারপর ওরা তাকে বেয়নেটে বিঁধে ফেলবার আগেই সে একটা হাত-বোমা ফাটিয়ে নিজেকে আর সেই সঙ্গে ওদের সবগুলোকে উড়িয়ে দিল। অথচ দেখতে সে এমন কিছু অসাধারণ ছেলে ছিল না। বইয়ের গল্পে যাদের সম্বন্ধে পড়া যায়, ও মোটেই সেরকম ছিল না — যদিও ওকে নিয়ে গল্প লেখা উচিত। আমাদের মধ্যে এরকম বিস্তর বীর-ছেলে আছে।'

মেস্‌টিনের ভেতরটা সে একটা চামচ দিয়ে নেড়ে ঠোঁট কুঁচকে একটু চা চেখে নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'কেউ কেউ আছে, অপমান সয়ে কুকুরের মতো অসম্মানের মরণ মরে। — ইজিয়াস্লাভ্‌ল-এর লড়াইয়ের একটা ঘটনার কথা বলি, শোন। গোরিন নদীর ধারে সেটা একটা পুরনো শহর, রাজারাজড়াদের আমলে তৈরি হয়েছিল। কেল্লার মতো করে তৈরি একটা পোলিশ গির্জা ছিল ওখানে। শহরে ঢুকে আমরা তো বাঁকাচোরা সরু রাস্তাগুলো দিয়ে একজনের পেছনে আরেকজন সার বেঁধে যাচ্ছি। আমাদের ডান দিকটায় পাহারায় আছে একদল লাত্‌ভিয়ান সৈন্য। বড়ো রাস্তাটায় পড়তেই দেখি একটা বাড়ির বেড়ার গায়ে জিন-লাগানো তিনটে ঘোড়া বাঁধা।

'আমরা তো ভাবলাম — যাক, এতক্ষণে জনকতক পোলিশ সৈন্যকে নাগালে পাওয়া গেছে! জন দশেক আমরা ছুটে ঢুকে পড়লাম আঙিনায় — আমাদের আগে আগে সেই লাতভিয়ান সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার দৌড়ল তার মাউজার-পিস্তলটা নাড়তে নাড়তে।

'সামনের দরজাটা খোলা। দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল,

পোলিশদের বদলে আমাদেরই লোক রয়েছে সেখানে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসবার জন্যে একটা টহলদার ঘোড়সওয়ার-দল এরা। আমাদের আগেই এসে পেঁাছেছে। যে দৃশ্যটা আমাদের চোখে পড়ল, সেটা মোটেই শোভন নয়। এই বাড়িতে যে পোলিশ অফিসারটি ছিল, তারই বউটার ওপরে ওরা অত্যাচার করছে। লাতভিয়ান কম্যাণ্ডার ব্যাপারটা দেখে নিয়েই তার নিজের ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল। তার সৈন্যরা এসে ওই তিনজন লোককে ধরে বাইরে টেনে আনল। ঘটনাটার সময়ে আমরা মাত্র দু'জন ছিলাম রাশিয়ান, বাকি সবাই লাতভিয়ান। এই কম্যাণ্ডারটির নাম ব্রেদিস্। আমি ওদের ভাষা বুঝি না, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে সে এই তিনজনকে খতম করে ফেলার জন্যে হুকুম দিয়েছে। এই লাতভিয়ানরা ভারি দুর্ধর্ষ, কিছুতেই দমে না কখনও। তারা তো এই তিনজনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, ওই তিনজন লোকের আর কিছুতেই পার নেই। ওদের মধ্যে একজনের খুব দশাসই লম্বা-চওড়া চেহারা, বিশ্রী মুখখানা। সে তো প্রাণপণে লাথি ছুঁড়ে যুঝছে আর চেঁচিয়ে বলছে — একটা বাজে মেয়েমানুষের জন্যে তাকে গুলি করে মারার কোন এক্তিয়ার তাদের নেই। অন্য দু'জনও প্রাণভিক্ষা চাইছে।

'আমার তো ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে উঠল। ব্রেদিস-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, 'কমরেড কম্যাণ্ডার, সামরিক আদালতের ওপরে ওদের বিচারের ভার ছেড়ে দাও, তুমি কেন ওদের রক্তে নিজের হাত নোংরা করতে যাচ্ছ? শহরে লড়াই শেষ হয় নি এখনও, এদিকে আমরা কেন এই জানোয়ারগুলোর জন্যে সময় নষ্ট করতে যাই?' সে তো আমার দিকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখে তাকাল। সত্যি বলছি, কথাটা বলে ফেলেছি বলে আমার রীতিমত আফসোস হল। পিস্তলটা আমার দিকেই বাগিয়ে ধরল সে। সাত বছর ধরে যুদ্ধ করছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে আমার সত্যিই দারুণ আতঙ্ক হয়েছিল সে কথা স্বীকার করছি। দেখলাম, লোকটা তক্ষুনি গুলি করে মারবে। ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় সে আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে যা বলল, কোন রকমে তার মানেটা বুঝলাম, 'আমাদের ঝাণ্ডা আমাদেরই রক্তের রঙে লাল। এই লোকগুলো গোটা লাল ফৌজের কলঙ্ক। দস্যুতা করার শাস্তি — মৃত্যু!'

'দৃশ্যটা আর সহ্য করতে না পেরে আমি আঙিনাটা থেকে প্রাণপণে ছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, পেছনে গুলির শব্দ শুনলাম। বুঝলাম, খতম হয়ে গেল সেই তিনজন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে যখন জুটলাম, ততক্ষণে শহরটা আমাদের দখলে চলে এসেছে।

'একেই বলতে চাই কুকুরের মতো মরা — ওই তিনজন লোক সেইভাবেই মরেছে। ওদের তিনজনের ওই টহলদার-দলটি হচ্ছে মৌলিতোপল্-এ যারা আমাদের পক্ষে যোগ

দিয়েছিল তাদেরই একটি দল। এক সময়ে তারা মাখ্নোর দলে ছিল। আজেবাজে কয়েক জন লোক — এই আর কি।'

মেস্‌টিনটা টেনে নিয়ে আন্দ্রোশ্চুক তার রুটির থলিটা খুলতে আরম্ভ করল।

'আমাদের লোকজনের মধ্যেও অমন জানোয়ারের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে মিলবে। সবারই উপর নজর রাখা তো যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তারাও বিপ্লবের পক্ষে। অথচ এদের জন্যেই আমাদের বদনাম হয়। কিন্তু দৃশ্যটা ছিল অতি অসহ্য। চট্‌ করে আমি ঘটনাটা ভুলব না।' চায়ে চুমুক দিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

তাঁবুর লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে সেরেদার নাক-ডাকানো বাঁশি শোনা যাচ্ছে। পুজিরেভ্‌স্কি ঘোড়ার জিনে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। দলের রাজনীতিক পরিচালক ক্রামের বসে বসে নোটবুকে কী যেন লিখছে।

পরের দিন একটা স্কাউটিং-এর কাজ থেকে ফিরে এসে পাভেল একটা গাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে ক্রামেরকে ডাকল। তার সবেমাত্র চা খাওয়া শেষ হয়েছে।

'শোন, ক্রামের, আমি যদি এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মিতে বদলি হই, তাহলে কেমন হয়? দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, বড়ো রকম কিছু হবে ওদিকে। মজা দেখবার জন্যে তো আর ওদের অমন জমায়েত করা হয় নি! আমাদের এদিকে তো বিশেষ কিছু হবে মনে হচ্ছে না।'

বিস্মিত হয়ে ক্রামের তাকাল তার দিকে, 'বদলি হতে চাও? সিনেমা দেখতে গিয়ে জায়গা বদল করার মতোই ফৌজেও দল বদল করা যায় বলে ভেবেছ নাকি? আমরা সবাই যদি এক ইউনিট থেকে আরেক ইউনিটে ছুটতে আরম্ভ করি তাহলে এ খাসা ব্যাপার হবে!'

পাভেল বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু একজন সৈন্য কোথায় লড়াই করছে তাতে কি কিছু এসে যায়? আমি তো আর পেছনে পালিয়ে যাচ্ছি না।'

কিন্তু ক্রামের সরাসরি এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিল, 'তাহলে ফৌজের শৃঙ্খলা থাকে কোথায়? তুমি মোটেই খারাপ ছেলে নও, পাভেল। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তোমার চালচলন একটু নৈরাজ্যবাদীর মতো। তোমার ইচ্ছেমতো সবকিছু করবে বলে ভেবেছ নাকি? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পার্টি আর কমসমোল কঠিন শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সব আগে পার্টি। যার যেখানে থাকা সবচেয়ে দরকার সেইখানেই তাকে থাকতে হবে, সে যেখানে থাকতে চায় সেখানে নয়। পুজিরেভ্‌স্কি তোমার বদলির দরখাস্ত একবার ফেরত দিয়েছে? এই তো তোমার কথার জবাব।'

বলতে বলতে ক্রামের এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে এক দমক কেশে উঠল সে।

লম্বা রোগা এই মানুষটা ছাপাখানার কম্পোজিটর ছিল, সীসের গুঁড়ো তার ফুসফুসের মধ্যে কায়েমী বাসা বেঁধেছে, মাঝে মাঝে তার গালে একটা অস্বাস্থ্যকর লালচে আভা দেখা দেয়।

সে শান্ত হয়ে আসার পর পাভেল নিচু গলায় কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'যা বললে সবই ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমি বুদিওনি-বাহিনীতেই যাব।'

পরের সন্ধ্যেয় তাঁবুর পাশে আগুনের কুণ্ডলীর আড্ডায় দেখা গেল — পাভেল অনুপস্থিত।

* * *

পাশের গ্রামে পাহাড়ের ওপর একটা স্কুল-বাড়ির বাইরে বুদিওনি-ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একদল সৈনিক একটা বড়ো বৃত্তাকারে জড়ো হয়েছে। দৈত্যের মতো বিরাট-দেহ একজন একটা মেশিনগানের গাড়ির পেছনে বসে মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দিয়ে অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। তার অপটু আঙুল-চালনার ফলে যন্ত্রটা থেকে বেতালা নানারকম উচ্চকিত গোঙানির সুর বেরিয়ে আসছে — যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাজনাটা। অবিশ্বাস্য রকমের চওড়া আর লাল রঙের ব্রীচেজ পরা আরেকজন ঘোড়সওয়ার চক্রটার মাঝখানে উন্মত্ত হয়ে 'হোপাক' নাচ নাচছে — কিন্তু নাচের সঙ্গে বাজনা না মেলাতে লোকটাও বেতালা হয়ে নাচছে।

মেশিনগান-টানা গাড়িটার চারপাশে আর বেড়ার উপর টেনে-হেঁচড়ে উঠে উৎসুক চোখে জড়ো হয়েছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই সৈন্যদের মজার ব্যাপার-ট্যাপার দেখবার জন্য — সৈন্যদলটা সবেমাত্র ওদের গ্রামে ঢুকেছে।

'লাগাও দেখি হে তোপ্‌তালো ! হ্যাঁ, পায়ের গুঁতোয় মাটি খুঁড়ে ফেল, তবে তো ! ধাঁই ধপাধপ — হ্যাঁ, একেই তো বলে নাচ, ভায়া ! ওহে, বলি ও বাজিয়ে, জোরসে বাজাও না !'

কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদারের বিরাট মোটা আঙুলগুলো লোহার ঘোড়ার নাল অতি সহজে বেঁকিয়ে ফেলতে পারলেও, বাজনাটার চাবির ওপর নড়াচড়া করতে লাগল অত্যন্ত আনাড়ীভাবে।

একজন তামাটে রঙের ঘোড়সওয়ার সৈন্য ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, 'মাখ্‌নোর ডাকাত-দলের হাতে আমাদের আফানাসি কুলিয়াব্‌কো মারা পড়াতে বড়ো দুঃখ হচ্ছে। ছেলেটা অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারত বড় চমৎকার। আমাদের দলের ডান দিকে থাকত ও। আহা, মারা গেল ছেলেটা ! খুব ভাল সৈনিক ছিল, আর সবার সেরা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার !'

পাভেল দাঁড়িয়ে ছিল জমায়েতের মধ্যে এক জায়গায়। ঐ শেষ কথাটা কানে গেল তার। ভিড় ঠেলে মেশিনগানের গাড়িটার কাছে এসে অ্যাকর্ডিয়নের হাপরটার ওপরে হাত রাখল সে। বন্ধ হয়ে গেল বাজনাটা।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল, 'কী চাও তুমি?'

তোপ্‌তালো থেমে পড়ল, ক্রুদ্ধ একটা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে, 'ব্যাপার কী?'

পাভেল বাজনার ফিতেটা টেনে নিয়ে বলল, 'দেখি একবার চেষ্টা করে।'

বুদিওনি-ঘোড়সওয়ারটি এই অচেনা লাল ফৌজের সৈন্যটার দিকে একটু অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ন ঝুলিয়ে দেবার ফিতেটা নিজের কাঁধ থেকে খুলে দিল।

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পাভেল তার হাঁটুর ওপর অ্যাকর্ডিয়নটা রেখে পাখার মতো খুলে ছড়িয়ে ধরল ভাঁজ-করা হাপরটা। তারপর যন্ত্রটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল মন-মাতানো ছন্দের মিষ্টি সুর-ঝংকার — অ্যাকর্ডিয়নের সবখানি বলিষ্ঠতা উপচে উঠল সে-সুরে:

আহা-হা, ছোট্ট আপেল,
চললে কোথায় হে?
'চেকা'র হাতে পড়বে ঠিকই,
আসবে না আর ফিরে।

পরিচিত সুরের তালে তালে তোপ্‌তালো একটা বিরাট পাখির মতো দুই হাত ছড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল চক্করটার মাঝখানে — অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে সুরের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নিজের পায়ে, হাঁটুতে, মাথায়, কপালে, জুতোর তলায় এবং শেষ পর্যন্ত মুখের ওপর চাপড় মেরে মেরে নাচতে লাগল।

অ্যাকর্ডিয়নটা দ্রুত থেকে দ্রুততর বেজে চলল মত্ত মন-মাতানো সুরে আর দম একেবারে ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত উদ্দাম ভঙ্গীতে পা ছুঁড়ে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে খেয়ে চক্করটার চারিদিকে নেচে চলল তোপ্‌তালো।

* * *

১৯২০-র ৫ই জুন কয়েকটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড লড়াইয়ের শেষে সেনাপতি বুদিওনির এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মি তৃতীয় আর চতুর্থ পোলিশ আর্মির মাঝখান

দিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ফেলল — পথে পোলিশ জেনারেল সাভিৎস্কির অধীনস্থ একটা ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড ধ্বংস করে দিয়ে বন্যার মতো এগিয়ে চলল রুঝিনির দিকে।

পোলিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করে একটা হানাদার দল গড়ে তুলে সেটাকে খাড়া করে দিল ব্যূহ যেখানে ভেঙে গিয়েছিল সেখানে। পগ্রেবিশ্চে স্টেশন থেকে লড়াইয়ের জায়গাটায় পাঁচটা ট্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি এনে ফেলা হল। কিন্তু পোলিশরা যেখান থেকে আক্রমণ চালাবে বলে স্থির করেছিল সেই জারুদ্‌নিৎসির পাশ কাটিয়ে গিয়ে বুদিওনি-বাহিনী পোলিশদের পশ্চাদ্‌ভাগে পেঁৗছে গেল।

পোলিশদের এই পশ্চাদ্‌ভাগে কাজাতিন হচ্ছে একটা সবচেয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা — এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মি সেইদিকেই এগুবে বলে পোলিশ কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল; পেছন দিক থেকে তাদের ওপর হামলা চালাবার হুকুম দিয়ে পোলিশ জেনারেল কর্‌নিৎস্কির ঘোড়সওয়ার-ডিভিশনটাকে পাঠানো হল। এর ফলে কিন্তু পোলিশদের অবস্থার উন্নতি ঘটল না। তারা অবশ্য ভাঙা ব্যূহটা জুড়ে দিয়ে ঘোড়সওয়ার আর্মিটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হল, কিন্তু নিজেদের সৈন্যসারির পেছনে শক্তিশালী একটা শত্রু ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর উপস্থিতির ফলে তাদের পেছনের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ দেখা দিল, কিয়েভে পোলিশ ফৌজের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়বার সম্ভাবনাও দেখা দিল — এই সবের ফলে পোলিশ ফৌজের অবস্থাটা মোটেই নিশ্চিন্ত হবার মতো রইল না। এগিয়ে যাবার পথে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার ডিভিশনগুলি পোলিশদের পশ্চাদপসরণের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ছোট ছোট রেল-সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়ে আর রেল-লাইন উপড়ে ফেলতে ফেলতে চলল।

পোলিশদের একটা আর্মির সদর ঘাঁটি আছে জিতোমির-এ (আসলে গোটা পোলিশ ফ্রন্টের সদর ঘাঁটিটাই সেখানে) — এ খবরটা পোলিশ যুদ্ধবন্দীদের কাছে জানতে পেরে, এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির কম্যাণ্ডার জিতোমির আর বের্দিচেভ্‌ দুটো জায়গাই দখল করবে বলে ঠিক করল — এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন আর প্রশাসন-কেন্দ্র। সাতই জুনের ভোরে চার-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন পুরো বেগে এগিয়ে চলল জিতোমির-এর দিকে।

পাভেল করচাগিন ঘোড়ায় চেপে চলেছে এদের একটা স্কোয়াড্রনের ডানদিকের অবস্থানে — মৃত অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার কুলিয়াব্‌কোর জায়গায়। সৈন্যদের সমবেত অনুরোধে তাকে এই দলটায় ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন চমৎকার একজন অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েকে তারা হাতছাড়া করতে চায় নি।

মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়াগুলিকে না থামিয়ে তারা জিতোমিরের দিকে এগোল পাখার আকারে ছড়িয়ে — সূর্যের আলোয় তাদের খোলা তলোয়ারগুলো ঝিকমিক করছে।

খুরের শব্দে মাটি কেঁপে উঠছে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে ঘোড়াগুলো, রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে মানুষগুলো।

পায়ের নিচে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে। বাগান আর পার্ক দিয়ে সাজানো মস্ত শহরটা ফৌজীদলটার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে দ্রুত। ঘোড়সওয়ার-বাহিনী বন্যার স্রোতের মতো বাগানগুলোর পাশ দিয়ে এসে পড়ল শহরের কেন্দ্রে — একেবারে মৃত্যুরই মতো অমোঘ একটা ভয়ংকর রণধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হল।

এই হঠাৎ আক্রমণে পোলিশরা এতোই হতচকিত হয়ে পড়ল যে তারা বিশেষ কিছু প্রতিরোধ দিয়ে উঠতে পারল না। স্থানীয় রক্ষী-সেনাদল একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

পাভেল করচাগিন তার ঘোড়াটার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে বেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। পাশাপাশি চলেছে তোপ্‌তালো সরু-পাওয়ালা একটা কালো ঘোড়ায় চেপে। এই দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারটি এক সময়ে তলোয়ারের অভ্রান্ত লক্ষ্যে একটি আঘাতেই একজন পোলিশ সৈন্যের মাথা উড়িয়ে দিল, লোকটা তার কাঁধে বন্দুক তুলে নেবারও সময় পেল না। — পাভেল দেখল দৃশ্যটা।

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে তাদের ঘোড়াগুলো, লোহার নাল লাগানো খুরের শব্দ উঠছে পাথরের বুকে। তারপরে একটা মোড়ের মাথায় তারা একটা মেশিনগানের সামনে এসে পড়ল — ঠিক রাস্তার মাঝখানে বসানো রয়েছে মেশিনগানটা, নীল রঙের উর্দি পরা চৌকোনা টুপি মাথায় তিনজন পোলিশ তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। চতুর্থ একজন লোকও রয়েছে, তার কোটের গলার বেড়ে সোনালি কারুকার্য, সে পাভেল আর তোপ্‌তালোর দিকে তার মাউজার-পিস্তলটা বাগিয়ে ধরল।

তোপ্‌তালো বা পাভেল কেউই ঘোড়ার গতিবেগ রুখতে না পেরে মেশিনগানের ওপরে একেবারে মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে পড়েছে। অফিসারটি পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল পাভেলকে লক্ষ্য করে — কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পাভেলের গাল ঘেঁষে গুলিটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল, পরমুহূর্তেই অফিসারটির মাথা ঠুকে গেল পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপরে — ঘোড়াটার গতিবেগের ধাক্কায় সে চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মেশিনগানটা বর্বর আর উম্মত্তভাবে দ্রুত-ক্রমান্বয়ে গর্জে উঠল আর ডজনখানেক গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল তোপ্‌তালো আর তার কালো ঘোড়াটা।

পাভেলের ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর করে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে একটা আতঙ্কের

হাঁক ছেড়ে ওই দু'জনের প্রাণহীন দেহের ওপর দিয়ে একটা লাফ মেরে এসে পড়ল মেশিনগানের লোকগুলির ওপরে। পাভেলের তলোয়ারটা শূন্যে একটা ঝিলিক তুলে বেঁকে নেমে এসে একটা নীল রঙের চৌকোনা ফৌজী টুপির মধ্যে কেটে বসে গেল।

আরেকবার ঝলকানি দিয়ে ওপরে উঠে এল তলোয়ারটা আরেকটা মাথার ওপরে নেমে আসার জন্য তৈরি হয়ে, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াটা লাফিয়ে পড়ল একপাশে।

ততক্ষণে পুরো স্কোয়াড্রনটা বন্যায় ফুঁসে ওঠা পাহাড়ী নদীর মতো রাস্তায় নেমে এসেছে — অসংখ্য তলোয়ারের ফলা ঝিকিয়ে উঠেছে শূন্যে।

* * *

জেলখানার লম্বা সরু বারান্দাগুলোয় চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

যন্ত্রণাবিদ্ধ শীর্ণ-মুখ মেয়ে-পুরুষে গাদাগাদি ঠাসা ছোট ছোট জেল-কুঠরিগুলোয় দারুণ চাঞ্চল্য। শহরে যে লড়াই চলেছে তার আওয়াজ তারা শুনছে — তার মানে কি মুক্তি? শহরের বুকে হঠাৎ নেমে-আসা এই বাহিনী কি এসেছে তাদের মুক্তি দিতে?

জেলের আঙিনাটায় গুলি চলছে। লোকজন ছোটাছুটি করছে বারান্দা বেয়ে। আর তারপরেই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি শোনা গেল, 'কমরেডসব, তোমরা মুক্ত!'

পাভেল ছুটে গেল একটা তালাবন্ধ দরজার কাছে — দরজাটার গায়ে ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে অনেক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে। ভীষণ জোরে তালাটার ওপর পাভেল তার রাইফেলের কুঁদোটা দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল।

পাভেলকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিরোনভ তার পকেট থেকে একটা হাত-বোমা বের করে বলল, 'দাঁড়াও, একটা বোমা ফাটিয়ে ভাঙি ওটাকে।'

তাদের দলের কম্যাণ্ডার সিগারচেংকো তার হাত থেকে বোমাটা ছিনিয়ে নিল, 'থাম, থাম, আহাম্মক কোথাকার! পাগল নাকি? এক্ষুনি চাবি নিয়ে এসে পড়বে। ভাঙতে না পারলে চাবি দিয়েই খোলাব।'

জেলখানার প্রহরীদের ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে। তারপরে জেলখানার বারান্দা ভরে উঠল ছেঁড়া পোশাক-পরা, নোংরা আনন্দে উন্মত্ত মেয়ে-পুরুষের ভীড়ে।

জেল-কুঠরিটার দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ধরে পাভেল ছুটে ভেতরে ঢুকল, 'কমরেড, মুক্ত তোমরা! আমরা বুদিওনির সৈনিক — আমাদের ফৌজ শহর দখল করে নিয়েছে!'

একটি মেয়ে জল-ভরা চোখে পাভেলের কাছে ছুটে এসে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা এই পাথুরে আঁধার কুঠরিগুলোয় পুরে দিয়েছিল পাঁচ হাজার একাত্তর জন বলশেভিককে আর লাল ফৌজের দু'হাজার রাজনীতিক কর্মীকে — এরা সবাই গুলিতে কিংবা ফাঁসিতে মরবার অপেক্ষায় ছিল; এদের উদ্ধার করতে পারাটা এই সৈন্যদলের যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধে জিতে-নেওয়া সমস্ত জিনিসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি যুদ্ধজয়ের চেয়েও এটা ঢের বড়ো পুরস্কার। সাত হাজার বিপ্লবীর চোখে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার কেটে গিয়ে ফুটে উঠল জুন মাসের উষ্ণ দিনের সূর্যের উজ্জ্বলতা।

একজন বন্দী আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটে এল পাভেলের কাছে, তার গায়ের চামড়াটা শুকনো লেবুর রঙের মতো বিবর্ণ। সে হল সামুইল লেখের — শেপেতোভ্কার সেই ছাপাখানার একজন কম্পোজিটার।

* * *

সামুইলের মুখে তার নিজের শহরের নিদারুণ রক্তাক্ত ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে পাভেলের মুখ কালো হয়ে উঠল। প্রত্যেকটা কথা যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আগুনে গলানো ধাতুর মতো কুরে কুরে দিচ্ছে।

'রাত্রিবেলায় এসে ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করল — আমাদের সবাইকে একসঙ্গে। কোন হারামজাদা আমাদের ফাঁস করে দিয়ে এসেছিল সামরিক পুলিসের কাছে। একবার ওদের হাতের মুঠোয় পড়লেই আর ওদের দয়ামায়া নেই। জান পাভেল, সাংঘাতিক মারধোর করল আমাদের। আমার তো তবু অন্যদের চেয়ে কম কষ্ট হয়েছে, কারণ গোটা কতক ঘুষি খেয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু অন্যরা আমার চেয়ে শক্তসমর্থ ছিল।

'গোপন করার কিছুই ছিল না আমাদের। ওরা সবই আমাদের চেয়েও ভাল জানত। আমরা যা যা বন্দোবস্ত করেছিলাম তার সবই ওরা জানত। আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক ছিল, সুতরাং এতে আর বিস্ময়ের কী আছে! সেসব দিনের কথা বলতেও আমার কষ্ট হয়, পাভেল। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অনেককেই তুমি জান। ভালিয়া ব্রুঝাক্, আর রোজা গ্রিৎস্মান — চমৎকার মেয়ে, সবে সতেরো বছরে পা দিয়েছে, কী সুন্দর বিশ্বাসে ভরা ওর চোখদুটি ছিল, পাভেল। তারপর সাশা বুনশাফ্ৎ, তুমি তো চেনো তাকে, আমাদের কম্পোজিটরদের মধ্যে একজন, আমুদে ছেলেটা, সবসময় ছাপাখানার মালিককে ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকত। তাকে আর হাই ইস্কুলের দু'জন ছাত্র নভোসেলস্কি আর তুঝিৎস্কে গ্রেপ্তার করেছিল — এদেরও তুমি চেনো। অন্যরাও

সবাই স্থানীয় কিংবা জেলা সদরের লোক। সব-শুদ্ধ ঊনত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় — তাদের মধ্যে ছ'জন মেয়ে। প্রত্যেকের ওপরেই অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। প্রথম দিনেই ভালিয়া আর রোজাকে ধর্ষণ করল। জানোয়ারগুলো যতো রকমে পারে বেচারীদের ওপর অত্যাচার চালায়, তারপরে মুমূর্ষু অবস্থায় ওদের জেল-কুঠরিতে টেনে-হিঁচড়ে এনে ফেলে যায়। ঘটনাটার পরেই রোজা প্রলাপ বকতে শুরু করে আর দিন কয়েকের মধ্যে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় একেবারে।

'ও পাগল হয়ে গেছে সেটা ওরা বিশ্বাস করল না। বলল, ওটা রোজার ভান মাত্র। আর প্রতিবার ওকে জেরা করার সময়ে নির্মমভাবে মার দিত। রোজাকে শেষ পর্যন্ত ওরা যখন গুলি করে মারল, তখন কী সাংঘাতিক চেহারা হয়েছিল তার! মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল মারের দাগে, উন্মত্ত চোখদুটিতে তাকে দেখাতো বুড়ির মতো।

'ভালিয়া ব্রুঝাক্ শেষ অবধি চমৎকার বীরত্ব দেখিয়েছে। ওরা সবাই সত্যিকারের সংগ্রামী সৈনিকের মতো প্রাণ দিয়েছে। জানি না কোথা থেকে ওরা এতো সহ্য করার শক্তি পেয়েছিল। ওঃ পাভেল, ওদের মৃত্যুর ঘটনা কী করে বর্ণনা করব? বড়ো বীভৎস সেই মৃত্যু!

'ভালিয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের কাজ করছিল: পোলিশ সদর ঘাঁটির বেতার-অপারেটরদের সঙ্গে আর জেলা সদরে আমাদের লোকদের সঙ্গে ভালিয়া যোগাযোগ রাখত। তাছাড়া, ওরা ওর বাড়ি তল্লাশি করার সময়ে দুটো হাত-বোমা আর একটা পিস্তল পেয়েছিল। হাত-বোমাদুটো ওকে দিয়েছিল সেই উস্কানিদাতা দালাল। সবকিছুই এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে সদর ঘাঁটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল বলে ওদের অভিযুক্ত করা যায়।

'উঃ পাভেল, শেষের সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, তুমি পীড়াপীড়ি করছ বলেই বলছি। সামরিক আদালতে ভালিয়াকে এবং আর-দু'জনকে ফাঁসি দেবার আর বাকি সবাইকে গুলি করে মারবার হুকুম হল।

'পোলিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা আমাদের পক্ষে কাজ করত, তাদের বিচার দু'দিন আগে হয়ে গিয়েছিল।

'কর্পোরাল স্নেগুরকো — অল্পবয়েসী একজন বেতার-অপারেটর, যুদ্ধের আগে লদ্জ-এ ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করত — তাকে দেশদ্রোহ আর সৈন্যদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রচার চালানোর অভিযোগে গুলি করে মারবার হুকুম হল। সে আপীল করে নি, হুকুম হবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেই গুলিতে মারা পড়ল।

'তার বিচারের সময় ভালিয়াকে সাক্ষী দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সে

আমাদের বলেছিল — স্নেগুরকো কমিউনিস্ট প্রচার চালানোর অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু দেশের প্রতি বেইমানি করেছে — এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল, 'পোলিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই আমার স্বদেশ। হ্যাঁ, আমি পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে এবং সৈন্যদলে ঢোকার পর আমার মতো অন্যান্য যারা লড়াই করবার জন্যে ফ্রন্টে চালান হয়ে এসেছে, তাদের চোখ খুলে দেবার জন্যে আমি আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করেছি। এর জন্যে তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পার, কিন্তু দেশদ্রোহী হিসেবে নয় — দেশদ্রোহী আমি কিছুতেই নই, কখনো হবও না। তোমাদের স্বদেশ আর আমার স্বদেশ এক নয়। তোমাদের দেশ ধনীদের, আমার দেশ চাষী-মজুরদের মাতৃভূমি। এবং আমার সেই স্বদেশে — যে স্বদেশ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস — সেই স্বদেশে আমাকে কেউ কোনদিন দেশদ্রোহী বলবে না।'

'দণ্ড ঘোষণার পর আমাদের সবাইকে একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। মারবার আগে আমাদের জেলে বদলি করে দেওয়া হল। রাত্রিবেলায় ওরা হাসপাতালের পাশে জেলখানার সামনের দিকটায় ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করল। গুলি করে মারবার জন্যে বনের ওধারে রাস্তার কাছাকাছি একটা বড়ো খানা-মতো জায়গা বেছে নিল। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গোর দেবার জন্যে একটা বড়ো কবর খোঁড়া হল।

'মৃত্যুদণ্ডের খবরটা সারা শহরে বিজ্ঞপ্তি লটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই জানতে পারে। জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই পোলিশরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের মারবার ব্যবস্থা করেছিল। সকাল থেকেই তারা সেই জায়গাটায় শহরের লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে দিল। কেউ কেউ গেছে কৌতূহলের বশে — যদিও দৃশ্যটা বড়ো সাংঘাতিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল-দেয়ালের বাইরে জমে উঠেছে একটা বিরাট ভিড়। আমাদের কুঠুরির মধ্যে থেকে তাদের গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জনতার পেছনে রাস্তার ওপরে ওরা সব মেশিনগান খাড়া রেখেছে। সমস্ত জায়গা থেকে ঘোড়সওয়ার-সান্ত্রী আর সাধারণ সেপাইদের এনে মোতায়েন করেছে। গোটা একটা ব্যাটালিয়ন লাগিয়েছে রাস্তাগুলো আর আশেপাশের ক্ষেত-বাগানগুলো ঘিরে রাখবার জন্যে। যাদের ফাঁসি হবে, তাদের জন্যে মঞ্চটার পাশে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

'নিঃশব্দে আমরা শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছি নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে যা বলার ছিল সবই আমাদের আগের রাত্রে বলা হয়ে গেছে, বিদায়ও নিয়ে রেখেছি। শুধু কুঠুরিটার এক কোণে বসে রোজা আপন মনে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। ভালিয়া এতদিন ধরে নিদারুণ মারধোর আর

অত্যাচার সয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে — নড়াচড়া করতে পারছে না বলে চুপ করে শুয়ে আছে বেশির ভাগ সময়। স্থানীয় দু'জন কমিউনিস্ট মেয়ে — এরা দুই বোন — পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায় নেবার সময় চোখের জল আর সামলাতে পারে নি। গ্রামের একজন জোয়ান তরুণ স্তেপানভ — ওকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দু'জন সামরিক পুলিস ঘায়েল হয়েছিল ওর হাতে — সে এগিয়ে এসে বোনদুটিকে বলল, 'কান্না নয়, কমরেড! এখানে কেঁদে যাও, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওখানে যেন কেঁদো না। ওই হারামজাদা জানোয়ারগুলোকে হাসাহাসি করার সুযোগ যেন আমরা না দিই। ওরা তো কিছুতেই কোনরকম দয়া দেখাবে না। মরতেই হবে আমাদের, সুতরাং সুন্দরভাবে মরব। নতজানু হব না আমরা। মনে রেখো কমরেডসব, আমরা মাথা উঁচু করে মরব।'

'তারপর ওরা আমাদের নিতে এল। সবার আগে শুভোরকোভ্স্কি — গোয়েন্দা-কর্তা, পাগলা কুত্তার মতো, নির্যাতন চালিয়ে আনন্দ পায়। নিজে যখন ধর্ষণ করে না, তখনও সে তার পুলিসদের ধর্ষণ করতে দিয়ে দেখে মজা উপভোগ করে। রাস্তার উপর দুই সারি পাহারাওলার মাঝখান দিয়ে আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল ফাঁসি-মঞ্চটার কাছে। এই সামরিক পাহারাওলাদের কাঁধের ওপর হলদে রঙের পটি দেখে আমরা নাম দিয়েছিলাম 'ক্যানারি' পাখি। খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে 'ক্যানারিরা' দাঁড়িয়ে ছিল।

'রাইফেলের গুঁতোয় ঠেলে ওরা আমাদের জেল-আঙিনাটায় বের করে এনে এক-এক সারিতে চারজন করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপরে ফটক খুলে রাস্তায় বের করে এনে ফাঁসি-মঞ্চের দিকে মুখ করে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল যাতে নিজের নিজের পালা আসার আগে আমরা আমাদের কমরেডদের মরণটা দেখতে পাই। মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি উঁচু ফাঁসি-মঞ্চ। মাথার ওপরে আড়কাঠটা থেকে ফাঁস লাগানো তিনটে ভারি দড়ি ঝুলছে। ফাঁসের নিচে সিঁড়িওয়ালা একটা মঞ্চ, কাঠের ছোট খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া, যাতে সেটাকে পায়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায়। উত্তাল জনসমুদ্র থেকে একটা ক্ষীণ গুঞ্জন উঠছে। প্রত্যেকের দৃষ্টি আমাদের ওপর আটকে গেছে যেন। আমাদের কিছু লোককে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম।

'কিছু দূরে একটা উঁচু বারান্দায় একদল পোলিশ অভিজাত আর অফিসার দূরবীন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলশেভিকদের ফাঁসি দেখতে এসেছে ওরা।

'পায়ের নিচে বরফ নরম ঠেকল। বনটা বরফে সাদা হয়ে আছে, পেঁজা তুলোর মতো ঘন তুষারে ঢাকা পড়েছে গাছগুলো। তুষারের কণাগুলো ধীরে পাক খেয়ে খেয়ে আমাদের উত্তপ্ত মুখের ওপর পড়ে গলে যাচ্ছে, ফাঁসি-মঞ্চের সিঁড়িগুলো বরফের গালিচায় ঢেকে গেছে। আমাদের গায়ে জামা-কাপড় সামান্যই, কিন্তু কেউই

ঠাণ্ডা বোধ করছি না। স্তেপানভ লক্ষ্যই করে নি যে সে খালি মোজা-পায়ে চলেছে।

‘ফাঁসি-মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক অভিশংসক আর বড় বড় অফিসার। শেষ পর্যন্ত ভালিয়াকে আর অন্য যে-দু’জন কমরেডকে ফাঁসি দেওয়া হবে, তাদের বের করে আনা হল জেলখানা থেকে। ওরা তিনজনেই হাত ধরাধরি করে আসছে। ভালিয়াকে মাঝখানে ধরে দু’পাশে দু’জন নিয়ে আসছে, কারণ তার নিজে হেঁটে আসার শক্তি নেই। কিন্তু, ‘সুন্দরভাবে মরব আমরা, কমরেড!’ স্তেপানভের সেই কথা মনে রেখে সে প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করছে। একটা পশমের কোর্তা তার গায়ে, কিন্তু কোট নেই।

‘ওদের হাত ধরাধরি করে আসাটা যে শ্‌ভারকোভ্‌স্কির পছন্দ হয় নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল, কারণ সে ওদের পেছন দিক থেকে ঠেলা দিল। ভালিয়া কী যেন বলে উঠতেই একজন ঘোড়সওয়ার সেপাই তার মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে চাবুক কষিয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি স্ত্রীলোক আর্তচিৎকার করে পাগলের মতো ছটফট করেছে সান্ত্রীদের বেড়া ভেঙে বন্দীদের কাছে আসার চেষ্টায়। কিন্তু ওকে ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়া হল। সে নিশ্চয়ই ভালিয়ার মা। ওরা ফাঁসি-মঞ্চের কাছাকাছি আসতেই ভালিয়া গাইতে শুরু করল। এমন স্বর আর কখনও শুনি নি — মৃত্যুর মুখে যে এগিয়ে চলেছে কেবল সে-ই ওরকম আবেগ দিয়ে গাইতে পারে। ভালিয়া গাইছিল ‘ভার্‌শাভিয়াংকা’ গানটা, তার সঙ্গে অন্য দু’জনও গলা মেলাল। ঘোড়সওয়ার পাহারাওলারা মত্ত আক্রোশে চাবুক চালাতে লাগল, কিন্তু ওদের তিন জনের গায়ে লাগছে বলেই মনে হল না। মাটিতে পেড়ে ফেলে ওদের বস্তার মতো টেনে নিয়ে তোলা হল ফাঁসি-মঞ্চে। হুকুমনামাটা তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার পরেই ওদের গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল। সেই মুহূর্তে আমরা গাইতে শুরু করলাম:

ওঠো জাগো, ভুখে-বন্দী...

‘চারদিক থেকে সেপাই-সান্ত্রীরা ছুটে এল আমাদের দিকে; শুধু এইটুকু দেখতে পেলাম — মঞ্চের নিচে ঠেকা দেওয়া কাঠের খুঁটিটা রাইফেলের কুঁদোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল আর তিনটে দেহ দড়ির ফাঁসে আটকে গিয়ে কেঁপে উঠল...

‘বাদবাকি আমাদের সবাইকেই দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন সময়ে ঘোষণা হল যে আমাদের মধ্যে দশ জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে কুড়ি বছর করে কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছে। বাকি ষোল জনকে গুলি করে মারা হল।’

সামুইল তার জামার কলারটা চেপে টানল — যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে তার।

'তিন দিন ধরে ওদের দেহ ওইখানে দড়ির ফাঁসে ঝুলে রইল। দিন-রাত্রি পাহারা দিত ফাঁসি-মঞ্চটাকে। তারপরে আর একদল নতুন বন্দী জেলখানায় এসে আমাদের বলল, 'চারদিনের দিন কমরেড তবোলদিনের দেহটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায় — তবোলদিন ওদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভারি ছিল। তারপরে ওরা বাকি দু'জনকেও নামিয়ে নিয়ে সবাইকেই সেইখানেই গোর দিয়েছে।'

'কিন্তু ফাঁসি-মঞ্চটাকে নামিয়ে নেওয়া হয় নি। আমাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা খাড়া ছিল। নতুন শিকারের জন্যে সেটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।'

চুপ করে সামুইল দৃষ্টিহীন অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে — কিন্তু পাভেলের খেয়াল নেই যে তার বলা শেষ হয়ে গেছে। তিনটি দেহ দড়িতে লটকানো আর মাথাটা ভয়ংকরভাবে একপাশে হেলে যাওয়া অবস্থায় নিঃশব্দে ঝুলতে থাকল তার চোখের সামনে।

বাইরে সমস্ত সৈন্যকে জড়ো হবার আহ্বান জানিয়ে বিউগ্‌ল্ বেজে উঠতেই পাভেল চমকে সচেতন হয়ে উঠল। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় সে বলল, 'চল সামুইল, যাওয়া যাক।'

সারি দিয়ে ঘোড়সওয়ার দাঁড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একসারি পোলিশ বন্দীকে। জেলখানার ফটকে দাঁড়িয়ে রেজিমেণ্টের কমিশার ফৌজী নোটবইয়ে একটা হুকুম লিখে নিচ্ছে।

একজন খাটো চওড়া-কাঁধ স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কমরেড আন্তিপভ, এটা নিন, আর সমস্ত বন্দীকে নিয়ে যান নভোগ্রাদ-ভলিন্স্কির দিকে ঘোড়সওয়ার-পাহারায়। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা দেখুন। তারপরে তাদের গাড়িতে তুলে সেই একই দিকে পাঠান। শহর থেকে মাইল চৌদ্দ দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন। ওদের নিয়ে ঝামেলা সওয়ার মতো সময় আমাদের নেই। কিন্তু বন্দীদের ওপর কোনরকম দুর্ব্যবহার চলবে না কিছুতেই।'

ঘোড়াটায় চেপে বসে পাভেল সামুইলের দিকে ফিরে তাকাল, 'শুনলে তো? ওরা আমাদের লোকজনকে ফাঁসি দেয়, কিন্তু সেই আমরাই ওদের আবার পাহারাধীনে পেঁছে দিই ওদের স্বপক্ষের লোকজনের কাছে, আর তাছাড়া, ভাল ব্যবহারও করি। কোথেকে শক্তি পাই তার জন্যে?'

রেজিমেণ্টের কমিশার ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল। পাভেল শুনল, সে যেন নিজেকেই বলছে, 'নিরস্ত্র কয়েদীর ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করার শাস্তি — মৃত্যু। আমরা শ্বেতরক্ষী নই!'

ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে যেতে পাভেলের মনে পড়ল ফৌজের সবাইকে যেটা পড়ে শোনানো হয়েছিল সেই বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশনামার শেষ কথা-গুলো:

'শ্রমিক-কৃষকের এই দেশ তার লাল ফৌজকে ভালবাসে, তার জন্যে গর্ব বোধ করে। সেই ফৌজের পতাকায় একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।'

আপন মনেই বলে উঠল পাভেল, 'একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।'

* * *

চার-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন যখন জিতোমির দখল করে নিয়েছে, তখন সাত-নম্বর রাইফেল ডিভিশনের কুড়ি-নম্বর ব্রিগেড কমরেড গোলিকভের নেতৃত্বাধীন একটা আক্রমণকারী দলের অংশ হিসেবে ওকুনিনোভো গ্রামের এলাকায় নীপার নদী পার হচ্ছিল।

পঁচিশ-নম্বর রাইফেল ডিভিশন এবং একটা বাশ্‌কির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড নিয়ে গড়া আর একটা বাহিনীর ওপর নির্দেশ আছে — নীপার পার হয়ে ইর্‌শা স্টেশনের কাছে কিয়েভ — কোরোস্তেন্‌ রেল-লাইনটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই কাজটা করতে পারলে কিয়েভ থেকে পোলিশদের পিছু হঠে যাবার একমাত্র পথটা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই নদী পার হবার সময়েই শেপেতোভ্‌কা কমসমোল সংগঠনের সভ্য মিশা লেভ্‌চুকভ মারা পড়ল। নড়বড়ে ভাসমান সাঁকোটার ওপর দিয়ে তারা দৌড়ে চলেছে, এমন সময় নদীর ওপারে খাড়া পাড়টার কোন জায়গা থেকে ছোঁড়া একটা গোলা মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রীভাবে শিস কেটে নদীতে এসে পড়ল জলটা তোলপাড় করে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিশা অদৃশ্য হয়ে গেল সাঁকোর একটা ভেলার নিচে। নদী গ্রাস করে নিল তাকে — ফিরিয়ে দিল না। ইয়াকিমেঙ্কো নামে একজন ছেঁড়া টুপি পরা সোনালী চুলওয়ালা সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল, 'মিশ্‌কা! আরে, ও যে মিশ্‌কা! পাথরের মতো ডুবে গেল, বেচারা!' এক মুহূর্ত সে আতঙ্কভরা চোখে কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার পেছনে যারা দৌড়ে আসছে তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল সামনে, 'হাঁ করে ওখানে দেখছ কী, মুখ্যু কোথাকার! এগিয়ে চল!'

কারুর জন্য অপেক্ষা করবার অবসর নেই — ব্রিগেডটা এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছে, আর সবাই ইতিমধ্যেই নদীর ডান পাড়টা দখল করে নিয়েছে।

সের্গেই মিশার মৃত্যুর খবরটা জানতে পারে চার দিন পরে। ততদিনে ব্রিগেডটা বুচা স্টেশন দখল করে নেবার পর কিয়েভের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পোলিশদের

প্রচণ্ড আক্রমণ রুখছে। ওরা কোরোস্তেনের ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সামনের সারিতে যারা গুলি ছুঁড়ছে, তাদের মধ্যে সের্গেইয়ের পাশে মাটির ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে ইয়াকিমেঙ্কো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। ফলে, তার রাইফেলটা এখন বড়ো বেশি গরম হয়ে গেছে — বল্টুটাকে ঠেলে পেছন দিকে সরাতে গিয়ে মুশকিল হচ্ছে। মাথাটা সাবধানে নিচু করে রেখে সের্গেইয়ের দিকে ফিরে সে বলল, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে হবে রাইফেলটাকে। তেতে লাল হয়ে গেছে একেবারে!'

গুলির আওয়াজের মধ্যে সের্গেই কোনমতে শুনতে পেল তার কথাটা। আওয়াজ একটু কমে এলে ইয়াকিমেঙ্কো যেন নেহাত প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা বলল, 'তোমার কমরেড নীপারে ডুবে মারা গেছে। আমি কিছু করতে পারার আগেই সে তলিয়ে যায়।' এইটুকুই শুধু সে বলল। রাইফেলের বল্টুটা পরখ করে নিয়ে আরেকটা ক্লিপ বের করে নিয়ে সে বন্দুকটায় আর এক দফা গুলি ভরতে লাগল।

* * *

বের্দিচেভ্ দখল করার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল, সেই এগারো-নম্বর ডিভিশনটা পোলিশদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ল। রক্তাক্ত লড়াই চলল শহরের রাস্তায় রাস্তায়। মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণের মধ্যে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়াররা এগুতে থাকল। তবুও শহর দখল হয়ে গেল, বিপর্যস্ত পোলিশ ফৌজের অবশেষটা পালিয়ে গেল। ট্রেনগুলো রেল-স্টেশনে অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু পোলিশদের সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি হল গুলি-গোলা মজুদ করা একটা গুদাম উড়ে যাবার ফলে — তাদের গোটা ফ্রন্টে গুলি-গোলা সরবরাহ করা হচ্ছিল এখান থেকে। লক্ষ লক্ষ গোলা শূন্যে ছিটকে উঠল। বিস্ফোরণের ফলে জানলার শার্সিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল।

জিতোমির আর বের্দিচেভ দখল হয়ে যাবার ফলে পোলিশরা তাদের পশ্চাদ্ভাগে একটা বড়ো রকম ঘা খেল। দু'দিক দিয়ে দুটো স্রোতের মতো তারা কিয়েভ থেকে বেরিয়ে আসছে — চারপাশের ইস্পাতের বেষ্টনীর ভেতর থেকে পথ কেটে বেরুবার জন্য তারা বেপরোয়া হয়ে লড়ছে।

যুদ্ধের এই ঝড়ঝাপটায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেলের কাছে ইদানীং তার নিজের চিন্তাটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার ব্যক্তিসত্তা মিশে গেছে সমষ্টির মধ্যে।

প্রত্যেকটি সংগ্রামী সৈনিকের মতোই পাভেলও 'আমি' কথাটি ভুলে গেছে; বাকি থাকল শুধু 'আমরা' — আমাদের রেজিমেণ্ট, আমাদের স্কোয়াড্রন, আমাদের ব্রিগেড।

ঘূর্ণিবাত্যার মতো প্রচণ্ড বেগে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ। প্রত্যেকটা দিন বয়ে আনে নতুন কিছু।

আঘাতের পর আঘাত হেনে পোলিশদের গোটা পশ্চাদ্‌ভাগ একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বুদিওনির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী — পাহাড় ভেঙে নেমে আসা তুষারস্তূপের মতো। জয়ের পর জয়ের উত্তেজনায় মাতাল ঘোড়সওয়ারের ডিভিশনগুলো নিদারুণ একটা প্রচণ্ডতা নিয়ে পোলিশদের পশ্চাদ্‌ভাগের একেবারে কেন্দ্রে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির ওপরে নেমে এসেছে।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন খাড়া পাহাড়ের পাথুরে তীরের বুকে আছড়ে পড়ে, পিছিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম তারা মাঝে মাঝে পিছিয়ে আসছে, তারপর আক্রমণ করবারই জন্য এগিয়ে গিয়ে নিদারুণ চিৎকারে বলে উঠছে 'এগিয়ে চল! আরও এগিয়ে!'

কিছুতেই রক্ষা পেল না পোলিশরা — কাঁটাতারের বেড়াজালেও না, শহরে ঘাঁটি গেড়ে মোতায়েন বাহিনীর বেপরোয়া প্রতিরোধেও না। সাতাশে জুন সকালে বুদিওনির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী ঘোড়া থেকে না নেমেই স্লুচ্ নদী পার হয়ে এসে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পোলিশদের তারা শহর থেকে বের করে দিয়ে কোরেৎসের দিকে হাঁকিয়ে দিল। সেই একই সময়ে ইয়াকিরের পঁয়তাল্লিশ-নম্বর ডিভিশন নোভি-মিরোপোলের কাছে স্লুচ্ নদী পার হয়ে এল এবং কতোভ্‌স্কির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড ছোট শহর লিউবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির বেতারকেন্দ্র ফ্রন্টের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একটা নির্দেশ পেল — রোভ্‌নো দখল করবার জন্য তাদের পুরো ঘোড়সওয়ার ফৌজকে লাগাতে বলা হচ্ছে। লাল ফৌজের ডিভিশনগুলির দুর্নিবার আক্রমণে পোলিশরা ভগ্নোদ্যম আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

এই উদ্দাম দিনগুলোর মধ্যে একদিন একজনের সঙ্গে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পাভেল করচাগিনের দেখা হয়ে গেল। তাদের ব্রিগেডের অধিনায়ক তাকে স্টেশনে পাঠিয়েছিল, সেখানে একটা সাঁজোয়া রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া হাঁকিয়ে খাড়া রেল-বাঁধের ওপর উঠে সে ইস্পাত-ধূসর রেল-কামরাটার সামনে লাগাম টানল। কামানের কালো নলগুলো গাড়িটার কামান-বুরুজের মধ্যে লুকিয়ে আছে, সাঁজোয়া ট্রেনটাকে ভয়ঙ্কর আর দুর্ভেদ্য বলে মনে হচ্ছে। গাড়িটার চাকা ঢেকে রাখা ভারি ইস্পাতের সাঁজোয়া-পাতটা তুলে ধরে জনকতক লোক তেল-লাগা পোশাকে কাজ করছিল।

চামড়ার কোর্তা পরা লাল ফৌজের একজন এক-বালতি জল বয়ে আনছিল, তার কাছে গিয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'এই ট্রেনের কম্যাণ্ডার কোথায় ?'

ইঞ্জিনটার দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওইখানে।'

ইঞ্জিনের কাছে ঘোড়া থামিয়ে পাভেল বলল, 'আমি কম্যাণ্ডারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

বসন্তের দাগওয়ালা-মুখ আপাদমস্তক চামড়ায় ঢাকা একজন লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমিই কম্যাণ্ডার।'

পাভেল পকেট থেকে একটা খাম বের করল, 'আমাদের ব্রিগেডের অধিনায়ক এই নির্দেশনামাটা দিয়েছেন। খামটা সই করে দিন।'

কম্যাণ্ডার খামটা হাঁটুর ওপরে রেখে নাম সই করে দিল। একজন লোক একটা তেলের টিন নিয়ে ইঞ্জিনের মাঝখানের চাকাটায় কাজ করছিল। পাভেল শুধু তার চওড়া পিঠের দিকটা আর তার চামড়ার পাতলুনের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়া পিস্তলের বাঁটটা দেখতে পাচ্ছিল।

ট্রেন-কম্যাণ্ডার খামটা পাভেলের হাতে ফিরিয়ে দেবার পর সে লাগাম টেনে রওনা হতে যাবে, এমন সময় তেলের টিন হাতে লোকটা খাড়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যেন একটা ভীষণ দমকা হাওয়ার ঝাপটায় পাভেল নেমে পড়ল তার ঘোড়ার ওপর থেকে।

'দাদা, তুমি !'

লোকটা চটপট মাটিতে রাখল তেলের টিনটা। ভালুকের মতো সর্বাঙ্গ দিয়ে সে তরুণ লাল ফৌজের সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরল।

'পাভকা ! আরে হতভাগা ! তুই !' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে সে চিৎকার করে উঠল।

সাঁজোয়া ট্রেনের কম্যাণ্ডার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আর জনকতক গোলন্দাজ পাশে দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে দেখছিল দুই ভাইয়ে হঠাৎ দেখা হবার আনন্দের দৃশ্যটা।

* * *

উনিশে অগস্ট ল্ভোভ্ অঞ্চলে একটা যুদ্ধ চলার সময়ে ব্যাপারটা ঘটল। লড়াইয়ের সময়ে টুপিটা হারিয়ে ফেলে পাভেল তার ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরেছে। সামনের স্কোয়াড্রনগুলো ইতিমধ্যেই পোলিশ বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেছে। এমন সময়ে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে দেমিদোভ এসে পাভেলের পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের ডিভিশনের কম্যাণ্ডার মারা পড়েছেন !'

চমকে উঠল পাভেল। তার আদর্শ বীর কম্যাণ্ডার লেতুনভ, অসীম বীরত্বে ভরা মানুষটি মারা পড়েছেন। একটা উন্মত্ত ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

তলোয়ারটার উল্টো পিঠ দিয়ে সে তার ঘোড়া গ্নেদ্কোকে তাড়া দিল — ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার মুখের দুই পাশে লাগামে রক্তমাখা ফেনা জমে উঠেছে। তবু পাভেল তার পিঠে চেপে লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'মেরে ফেল, খতম করে ফেল নরকের কীটগুলোকে। এই সব পোলিশ শ্লিয়াখ্তাকে* দাও শেষ করে! ওরা লেতুনভকে মেরে ফেলেছে!' অন্ধের মতো সে তলোয়ারের চোট বসিয়ে দিল সবুজ উর্দি-পরা একটা লোকের ওপর। ডিভিশনের কম্যাণ্ডারের মৃত্যুতে উন্মাদ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়াররা একটা গোটা পোলিশ পল্টনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

লড়াইয়ের মাঠের ওপর দিয়ে শত্রুসৈন্যের পেছন পেছন ওরা তাড়া করে ঘোড়া হাঁকাল — কিন্তু এতক্ষণে একটা পোলিশ গোলন্দাজদল গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। চারিদিকে মৃত্যু হেনে গোলার টুক্রোগুলো বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র সবুজ আলোর বিদ্যুৎ খেলে গেল পাভেলের চোখের সামনে। বাজের শব্দে কানে তালা ধরে গেল তার। মাথার খুলির মধ্যে ফুঁড়ে ঢুকে গেল আগুনে লাল করে তাতানো লোহার শিক। অদ্ভুতভাবে ভয়ানক রকম টলছে মাটিটা, যেন উল্টে যাচ্ছে পৃথিবীটা।

একটা কুটোর মতো পড়ে গেল পাভেল তার জিনের ওপর থেকে। সোজা গ্নেদ্কোর মাথার ওপর দিয়ে ধুপ্ করে সে মাটির ওপর গিয়ে পড়ল।

কালো রাত্রি ঘনিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে...

নবম অধ্যায়

অক্টোপাসের ঠেলে-বেরোন চোখটা বেড়ালের মাথার মতো বড়ো, জ্বলজ্বলে লাল একটা চোখ, মণিটা সবুজ, সজীব দ্যুতিতে দপদপ করছে। অক্টোপাসের কুৎসিত আর ভয়ংকর শুঁড়গুলো — জট-পাকানো কতকগুলো সাপের মতো কুণ্ডলী বেঁধে পাক খেয়ে এপাশ-ওপাশ করছে, কর্কশ আঁশে ঢাকা চামড়া আতঙ্ক জাগিয়ে খসখস শব্দে নড়াচড়া

---

* শ্লিয়াখ্তা (পলীয় ভাষায় szlachta) — মধ্য ইউরোপের অনেকগুলি দেশে (পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি) অভিজাত সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত সামন্তরা এই আখ্যায় অভিহিত হত। — সম্পাঃ

করছে। নড়ে উঠল অক্টোপাসটা। একেবারে চোখের ওপরই ও যেন অক্টোপাসটাকে দেখতে পাচ্ছে। অক্টোপাসের শুঁড়গুলো এবার ওর শরীরের ওপর দিয়ে সুড়সুড় করে এগিয়ে এল। ঠাণ্ডা শুঁড়গুলোর স্পর্শে বোলতার কামড়ের যন্ত্রণা। হুল বের করে অক্টোপাসটা তার মাথার মধ্যে কামড় বসাচ্ছে জোঁকের মতো। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে অক্টোপাসটা ওর রক্ত শুষে নিচ্ছে। ও স্পষ্ট অনুভব করছে — ওর দেহের রক্ত বেরিয়ে গিয়ে ঢুকছে অক্টোপাসটার ফুলে-ওঠা দেহের মধ্যে। হুলের মধ্যে দিয়ে রক্ত শুষেই চলেছে অক্টোপাসটা — কী অসহ্য রক্ত-শোষণের সেই যন্ত্রণা!

কোথায় যেন অনেক অনেক দূরে ও মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে:

'ওর নাড়িটা এখন কেমন?'

আরেকটা নারী-কণ্ঠ নরম স্বরে জবাব দিচ্ছে, 'নাড়ির গতি এক-শো-আটত্রিশ। জ্বরের তাপমাত্রা ১০৩·১। সমস্তক্ষণ ভুল বকছে।'

অক্টোপাসটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণাটা থেকে গেল। পাভেল অনুভব করল কে যেন তার কব্জিটা ধরেছে। চোখদুটো খুলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পাতাদুটো এতো ভারি যে মেলে ধরবার শক্তি নেই তার। এতো গরম লাগছে কেন? মা নিশ্চয় উনুনটায় আগুন দিয়েছে। আবার সে শুনতে পাচ্ছে সেই গলার স্বর:

'নাড়ির গতি এখন এক-শো-বাইশ।'

চোখের পাতাটা খুলবার চেষ্টা করল পাভেল — কিন্তু শরীরের ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

নিদারুণ তেষ্টা পেয়েছে — এক্ষুনি তাকে উঠে পড়ে খানিকটা জল খেতেই হবে। কিন্তু উঠছে না কেন সে? নড়তে চেষ্টা করছে — কিন্তু হাত-পাগুলো তাকে মানছে না কিছুতেই, দেহটা যেন নিজের নয়। মা তাকে এক্ষুনি খানিকটা জল এনে দেবে। মাকে বলবে পাভেল, 'জল খাব আমি।' কী যেন নড়ে উঠছে তার পাশে — অক্টোপাসটা আবার তার ওপরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে নাকি? ওই যে আসছে, লাল চোখটা তার দেখতে পাচ্ছে ও...

বহু দূর থেকে সেই কোমল গলার স্বরটা আসছে:

'ফ্রাসিয়া, একটু জল আনুন!'

'কার নাম ওটা?' কিন্তু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মানসিক অবসাদে আর একবার অন্ধকার এসে আচ্ছন্ন করল তাকে। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই তার মনে পড়ল, 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

আবার গলার স্বর শুনতে পেল:

'জ্ঞান ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

আরও কাছে, আরও স্পষ্ট সেই মিষ্টি গলার স্বর:

'জল খাবে, কমরেড ?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছে নাকি ? আমি কি অসুস্থ ? ও হ্যাঁ, আমাকে ওই টাইফাসের অসুখে পেড়েছে।' তৃতীয় বারের মতো সে তার চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করল। এবং শেষ পর্যন্ত পারল। চেতনা ফিরে আসতেই, তার অল্প খোলা চোখের সংকীর্ণ দৃষ্টিপথে প্রথমেই নজরে পড়ল — তার মাথার ওপরে ঝুলছে একটা লাল গোল জিনিস। কিন্তু কি একটা কালো জিনিস তার দিকে ঝুঁকে এগিয়ে আসতেই তার পেছনে আড়াল হয়ে গেল ওই লাল গোল জিনিসটা। তারপর তার ঠোঁটের ওপর গেলাসের শক্ত কাচের স্পর্শ, জলের স্পর্শ — প্রাণদায়িনী জল। শরীরের ভেতরের আগুনটা তার নিভে গেল।

তৃষ্ণা মিটতে শান্ত স্বরে ফিসফিসিয়ে পাভেল বলল, 'এবার একটু ভাল লাগছে।'

'দেখতে পাচ্ছেন আমায়, কমরেড ?'

তার ওপরে ঝুঁকে পড়া সেই কালো মূর্তিটা জিজ্ঞেস করল — তারপর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে কোনরকমে বলল, 'দেখতে পাচ্ছি না, তবে শুনতে পাচ্ছি...'

'কেই বা বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে ও সামলে উঠবে ? তবু ও আবার টেনে-হেঁচড়ে বেঁচে উঠেছে ! অত্যন্ত মজবুত ওর শরীর। নিনা ভ্লাদিমিরভ্না, আপনি গর্ব করতে পারেন। আপনি সত্যিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

মেয়েটি অল্প একটু কেঁপে ওঠা গলায় জবাব দিল, 'ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার !'

তেরো দিন ধরে অচৈতন্য হয়ে থাকার পর পাভেল করচাগিনের জ্ঞান ফিরে এল।

তরুণ দেহখানা তার মৃত্যুকে মেনে নিতে চায় নি, ধীরে ধীরে সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। যেন নতুন করে জন্ম নেবার মতো সবকিছু নতুন আর আশ্চর্য ঠেকছে। শুধু মাথাটা তার অনড় হয়ে পড়ে আছে — প্ল্যাস্টারের ছাঁচে আটকানো দুর্বিষহ রকমের ভারি — মাথাটাকে নড়াবার শক্তি ওর নেই। কিন্তু অন্যান্য প্রত্যঙ্গের অনুভূতি শিগগিরই ফিরে এল, অল্প কয়েকদিনেই ও নিজের আঙুলগুলো বাঁকাতে পারল।

* * *

সামরিক ক্লিনিক্যাল হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিনা ভ্লাদিমিরভ্না তার ঘরে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে লাইলাক্-ফুলের মতো রঙের মলাট দেওয়া একটা মোটা নোটবইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। নোটবইটার পাতায় পাতায় পরিষ্কার হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে সংক্ষিপ্ত নোট লেখা আছে:

২৬ অগস্ট, ১৯২০

অ্যাম্বুল্যান্স ট্রেনে আজ কয়েকজন গুরুতর রকম আহত লোককে আনা হয়েছে। একজন আহতের মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগেছে। কোণের দিকে জানলাটার পাশে ওকে আমরা রেখেছি। মোটে সতের বছর বয়েস। ওর পকেটে পাওয়া কাগজপত্র আর ও কীভাবে আহত হল তার পূর্ণ বিবরণ সমেত আমাকে ওরা একটা খাম দিয়েছে। ওর নাম করচাগিন, পাভেল আন্দ্রেয়েভিচ। ওর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে — ইউক্রেনের কমসমোলের বেশ জীর্ণ সভ্য-কার্ড (নং ৯৬৭), ছেঁড়া একটা লাল ফৌজের পরিচয়পত্র আর ফৌজী নির্দেশের একটা কপি, যাতে বলা হয়েছে যে লাল ফৌজের সৈন্য পাভেল করচাগিন একটা স্কাউটিংয়ের কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে করেছে বলে তাকে সাধুবাদ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে তার নিজেরই লেখা একটা নোটও আছে: 'যদি আমি মারা যাই, তাহলে দয়া করে এই ঠিকানায় আমার আত্মীয়দের চিঠি দেবেন: শেপেতোভ্কা শহর, ডিপো, কারিগর আর্তিওম করচাগিন।'

১৯ অগস্ট একটা গোলার টুকরোর আঘাত পাবার পর থেকেই ও অজ্ঞান হয়ে আছে। কাল আনাতোলি স্তেপানভিচ ওকে পরীক্ষা করবেন।

২৭ অগস্ট

আজ করচাগিনের ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ক্ষতটা খুব গভীর, খুলি ফেটে গেছে এবং মাথার ডান দিকের গোটাটাই অসাড় হয়ে গেছে। ডান চোখের একটা রক্তবাহ ফেটে গিয়ে চোখটা ভয়ানক রকম ফুলে উঠেছে।

প্রদাহ এড়াবার জন্য আনাতোলি স্তেপানভিচ চোখটা তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফোলাটা কমে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হওয়ায় আমি তাঁকে সেটা না করতে মিনতি করেছি। উনি সম্মত হয়েছেন।

ছেলেটির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে — একমাত্র এই কারণেই আমি তাঁকে সেটা করতে দিই নি। ছেলেটি সেরে উঠতে পারে; সেক্ষেত্রে তার অঙ্গহানি হলে ভারি দুঃখের কারণ হবে।

ছেলেটি সমস্তক্ষণ ভুল বকছে আর ভয়ানক ছটফট করছে। আমাদের মধ্যে একজন করে সবসময় ওর বিছানার পাশে ডিউটিতে রয়েছে। আমি ওর পেছনে অনেক সময় দিই। মারা যাবার পক্ষে ওর বয়স নিতান্তই অল্প। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি

মৃত্যুর মুঠো থেকে এই তরুণ প্রাণটিকে আমি ছিনিয়ে আনবই। হয়ত সফল হব।

কাল আমার কাজের সময় শেষ হয়ে যাবার পরে ওর ওয়ার্ডে আমি কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, সেখানে ওর অবস্থাটাই সবচেয়ে গুরুতর। বসে বসে আমি ওর ভুল বকা শুনলাম। মাঝে মাঝে সেগুলো একটা গল্পের মতো শোনায় — ওর জীবনের অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ছেলেটি অতি বিশ্রীরকম গালাগাল দিতে থাকে। ওর ভাষাটা জঘন্য। ওর মুখে এরকম গালাগালি শুনে কি জানি কেন আমার বড়ো ক্ষোভ হচ্ছে। ও বাঁচবে বলে আনাতোলি স্তেপানভিচ মনে করেন না। বুড়ো মানুষটি অভিযোগের সঙ্গে সক্ষোভে বিড়বিড় করে বললেন, 'এই সব প্রায় বাচ্চাদের কেন ফৌজে আনে তা বুঝি নে। ভারি বিশ্রী ব্যাপার।'

৩০ অগস্ট

করচাগিন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। যেসব রুগীদের সম্বন্ধে কোন আশা নেই, তাদের যে ওয়ার্ডে পাঠানো হয়, তাকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে। নার্স ফ্রসিয়া প্রায় সদাসর্বদাই তার পাশে আছে। দেখা গেল, সে ছেলেটিকে চেনে। এক সময়ে ওরা একসঙ্গে কাজ করেছে। কী অসীম যতন করছে সে ছেলেটাকে। এখন আমিও বুঝছি তার কোন আশাই নেই।

২ সেপ্টেম্বর

রাত ১১টা। আজ আমার বড় চমৎকার দিন। আমার রুগী করচাগিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সংকট কেটে গেছে। গত দু'দিন আমি বাড়ি ফিরি নি, হাসপাতালেই সমস্তক্ষণ কাটিয়েছি।

আরও একটি জীবন রক্ষা পেল — এতে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের ওয়ার্ডে একটা মৃত্যুর সংখ্যা কমল। আমার এই দারুণ খাটুনির কাজে একজন রুগীর সেরে ওঠাটাই সবচেয়ে ভাল ব্যাপার। ওরা শিশুর মতো স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে আমার প্রতি।

ওদের বন্ধুত্ব সরল আর আন্তরিক এবং ওদের বিদায় নেবার সময়ে আমিও প্রায়ই কেঁদে ফেলি। এটা যে একটু হাস্যকর তা জানি। কিন্তু তবু কিছুতেই সামলাতে পারি না।

১০ সেপ্টেম্বর

করচাগিন আজ তার বাড়িতে প্রথম চিঠি পাঠাল — ও যা যা বলে গেল, সেই মতো আমিই চিঠিখানা লিখে দিলাম। ও জানাচ্ছে — আঘাতটা ওর এমন কিছু গুরুতর নয়, শিগগিরই সেরে উঠে ও একবার বাড়ি যাবে। দারুণ রক্তক্ষয় হয়েছে ওর, মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এখনও ও খুব দুর্বল।

১৪ সেপ্টেম্বর

করচাগিন আজ প্রথম হাসল। ওর হাসিটা বড় সুন্দর। সাধারণত ওর বয়সের তুলনায় ও খুবই গম্ভীর। খুব আশ্চর্য দ্রুত সেরে উঠছে ও। করচাগিন আর ফ্রসিয়ার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। প্রায়ই ফ্রসিয়াকে ওর বিছানার পাশে দেখি। সে নিশ্চয়ই ওকে আমার কথা বলেছে — আমার গুণকীর্তন করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে — ইদানীং করচাগিন আমাকে দেখলেই একটা ক্ষীণ হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানায়। গতকাল সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার হাতে ওই কালো কালো দাগ কিসের, ডাক্তার?'

আমি ওকে বলি নি যে ওই দাগগুলো ওরই আঙুলের চিহ্ন — জ্বরের ঘোরে ভুল বকার সময়ে সে সজোরে আঙুল দিয়ে আমার বাহু চেপে ধরেছিল।

১৭ সেপ্টেম্বর

করচাগিনের কপালের ক্ষতটা চমৎকার সেরে উঠছে। ক্ষতটা ধুয়ে বেঁধে দেবার সময়ে যে আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে এই ছেলেটি যন্ত্রণা সহ্য করে, তা দেখে আমরা ডাক্তাররা বিস্মিত হয়েছি।

সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে রুগীরা দারুণ চেঁচায় আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের নিয়ে মহা অসুবিধেয় পড়তে হয়। কিন্তু এই রুগীটি শান্তভাবে শুয়ে থাকে। খোলা ক্ষতটা যখন আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় তখন সে শক্ত হয়ে নিজেকে টান টান করে রাখে তারের মতো। মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যায় — কিন্তু একবারও আমরা ওর মুখ থেকে যন্ত্রণার আওয়াজ বেরুতে শুনি নি।

এখন সবাই বুঝতে পারি, করচাগিন যখন কাতরায় তখন সে অজ্ঞান। কি জানি, কোথা থেকে ছেলেটি এই প্রচণ্ড সহ্যশক্তি পেল।

২১ সেপ্টেম্বর

আজ আমরা প্রথম করচাগিনকে ঠেলা-চেয়ারে করে বড়ো বারান্দাটায় এনে বসাই। বাগানটা দেখে কী উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ, কী রকম লোভীর মতো ও মুক্ত বাতাস টেনে নিল নিঃশ্বাসের সঙ্গে! ওর মাথাটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, মাত্র একটা চোখ খোলা। সেই প্রাণোজ্জ্বল চোখটা পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে— পৃথিবীর সঙ্গে যেন এই প্রথম তার দৃষ্টি-বিনিময়।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ দুটি তরুণী হাসপাতালে এসেছিল করচাগিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাইরের লোকদের বসার নিচের ঘরটায় আমি নেমে গেলাম। মেয়েদুটির মধ্যে একজন ভারি সুন্দরী। ওরা নিজেদের নাম বলল, তোনিয়া তুমানভা আর তাতিয়ানা বুরানোভ্স্কায়া। তোনিয়ার কথা আমি শুনেছি— জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময়ে করচাগিন নামটা বলত। তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমি দিলাম ওদের।

৮ অক্টোবর

করচাগিন এখন প্রথমবার নিজে নিজেই বাগানে হেঁটে বেড়িয়েছে। ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞেস করছে— হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে কবে। আমি বলেছি— শিগগিরই। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট দিনে মেয়েদুটি ওকে দেখতে আসে। কেন যে করচাগিন কাতরায় নি তা এখন জানতে পেরেছি। আমি জিজ্ঞেস করতে ও বলল, ' 'দি গ্যাড্‌ফ্লাই' বইটা পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

১৪ অক্টোবর

করচাগিন ছাড়া পেয়ে গেছে। গভীর আবেগের সঙ্গে সে আমার কাছে বিদায় নিল। চোখের ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা তার খুলে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু তার মাথাটা বাঁধা। ডান-চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে বেশ স্বাভাবিকই আছে। এই চমৎকার তরুণ কমরেডটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে গভীর বেদনা জমে উঠল মনে।

কিন্তু এই তো রীতি: সেরে উঠলেই ওরা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, হয়ত আর দেখা হবে না কখনও।

বিদায় নেবার সময় করচাগিন বলল, 'আহা, বাঁ-চোখটা গেল না কেন? এখন আমি গুলি ছুঁড়ব কী করে?'

ও এখনও ফ্রণ্টের কথা ভাবছে।

* * *

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পাভেল কিছুদিন বুরানোভ্স্কির বাড়িতে রইল — তোনিয়া এখানেই আছে।

পাভেল তোনিয়াকে অবিলম্বে কমসমোলের কাজকর্মের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করল। শহরের কমসমোলের একটা সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তোনিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে এ ব্যাপারের সূত্রপাত করল। তোনিয়া যেতে রাজি, কিন্তু সভায় যাবার জন্য পোশাক বদলে সে যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তাকে দেখে পাভেল দারুণ বিরক্তির সঙ্গে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। খুব কেতাদুরস্ত পোশাক পরে নিজেকে রীতিমত চটকদার করে তুলেছে সে — পাভেল বুঝতে পারল যে এটা তার মহলে একেবারেই বেখাপ্পা হয়ে পড়বে।

তাদের মধ্যে প্রথম ঝগড়ার কারণ ঘটল এই নিয়ে। কেন ওরকম পোশাক পরতে গেল — পাভেল এই প্রশ্ন তোলাতে তোনিয়া অসন্তুষ্ট হল।

'কেন যে আমাকে আর-সবার মতোই দেখতে হতে হবে, তা তো বুঝে উঠতে পারছি না। আমার পোশাকে যদি তোমার না পোষায়, তাহলে আমি না হয় বাড়িতেই থাকি।'

ক্লাব-ঘরে আর-সবার বিবর্ণ কোর্তা আর অতি সাধারণ ব্লাউজের মধ্যে তোনিয়ার সুন্দর পোশাকটা এতো চোখে ঠেকল যে পাভেল দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তরুণ-তরুণীরা সবাই তাকে বাইরের লোক হিসেবে ধরে নিল, সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে তোনিয়াও সবাইকে অগ্রাহ্য করার একটা উন্নাসিক মনোভাব দেখাল।

মোটা সুতী জামা পরা চওড়া-কাঁধ ডক-খালাসী জাহাজ-ঘাটার কমসমোল সংগঠনের সম্পাদক পানক্রাতভ পাভেলকে একপাশে ডেকে চোখের ইসারায় তোনিয়াকে দেখিয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, 'এই পুতুলটিকে তুমিই এখানে নিয়ে এসেছ নাকি?'

'হ্যা,' কাটা জবাব দিল পাভেল।

'হুম,' পানক্রাতভ মন্তব্য করল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার সঙ্গে ও

ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বড্ড বেশি রকম বুর্জোয়া গোছের দেখতে। এখানে ঢুকতে পেল কী করে?'

রাগদুটো দপদপ করে উঠল পাভেলের।

'ও আমার এক বন্ধু। আমিই ওকে এনেছি এখানে। বুঝলে? আমাদের প্রতি ওর মোটেই কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নেই, যদিও নিজের সাজপোশাকের দিকে ওর বড়ো বেশি নজর। তবু কে কী রকম পোশাক পরছে তাই দেখে সবসময়ে মানুষকে যাচাই করা উচিত নয়। তুমি যেমন জানো তেমনি আমিও জানি কাকে এখানে আনা যায় না-যায় — সুতরাং তোমার অতো খবরদারি করার কোন দরকার নেই, কমরেড!'

সে বেশ একটু ঝাঁজালো আর অপমানজনক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পানক্রাতভ যে সবার সাধারণ মতটাকেই প্রকাশ করেছে সেটা বুঝতে পেরে সে সামলে নিল। এবং তার ফলে তোনিয়ার ওপর রাগটা বেড়েই গেল। 'যা ওকে বলেছিলাম, ঠিক তাই হল! কী দরকারটা পড়েছিল ওর ওমনি ধারা চাল দেখাতে যাবার?'

সেইদিন সন্ধ্যায় তাদের বন্ধুত্বের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। পাভেল যে সম্পর্কটাকে এতদিন চিরস্থায়ী বলে ভেবে এসেছে, গভীর ক্ষোভ আর হতাশার সঙ্গে সেই সম্পর্কটার ভাঙন লক্ষ্য করতে লাগল সে।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল — প্রত্যেকবার দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে, প্রত্যেকটা সংলাপের মধ্যে দিয়ে তারা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকল। তোনিয়ার খেলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাভেলের কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

দু'জনেই অনুভব করছে — ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা অনিবার্য।

আজ তারা শেষবারের মতো কুপেচেস্কি-বাগানে মিলিত হয়েছে। শুকনো পাতায় পথগুলো ঢেকে গেছে। উঁচু খাড়াইটার মাথায় ওরা বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে নিচে নীপারের ধূসর জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সাঁকোটার মস্ত উঁচু খিলানের ওপাশ থেকে একটা গাধা-বোট পেছনে দুটো ভারি বজরা টেনে নিয়ে ক্লান্তভাবে নদী বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য ওপারের ত্রুখানভ দ্বীপের বুকে সোনার ছোপ দিয়েছে — ঘরবাড়িগুলোর জানলায় আগুন ধরে গেছে যেন।

সূর্যের ফালি ফালি সোনালী আলোর দিকে তাকিয়ে তোনিয়া গভীর বিষাদের সঙ্গে বলল, 'ওই ডুবন্ত সূর্যের মতোই আমাদের বন্ধুত্বও কি মিলিয়ে যাবে?'

পাভেল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। কঠিন চোখে ভ্রূকুটি করে নিচু গলায় উত্তর দিল, 'তোনিয়া, আমাদের মধ্যে এসব কথা আগেও হয়ে গেছে। তুমি তো জানো, আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে, এখনও আমার ভালবাসা ফিরে আসতে পারে —

কিন্তু তার জন্যে তোমাকে মিলতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমি আর সেই আগেকার পাভ্‌লুশা নই। পার্টির চেয়ে তোমাকে বড়ো করে দেখব — একথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে আমি খারাপ স্বামী হব। কারণ, আমি সর্বদা পার্টিকে আগে স্থান দেব, তারপরে স্থান দেব তোমাকে আর অন্যসব আত্মীয়স্বজনদের।'

নিবিড় বেদনাভরা চোখে তোনিয়া তাকিয়ে রইল নিচের ঘন নীল জলের দিকে — তার চোখ ভরে উঠল জলে।

পাভেল তার বাদামী রঙের ঘন চুলের দিকে, তার পাশ-ফেরানো মুখখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল — যে-মুখখানাকে সে এতো নিবিড়ভাবে চেনে। মেয়েটির প্রতি একটা করুণার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল তার মন — সে তার কাছে এক সময়ে এত প্রিয় ছিল! তোনিয়ার কাঁধের ওপরে আস্তে হাতখানা রাখল সে।

'তোনিয়া, তোমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আমাদের সঙ্গে এসে মিলে যাও। একসঙ্গে আমরা মালিক-শ্রেণীকে খতম করব। আমাদের মধ্যে বহু চমৎকার মেয়ে আছে — তারা এই নিদারুণ লড়াইয়ের সবরকম বোঝা বইছে, সবরকমের কষ্ট আর অসুবিধে সইছে। তারা তোমার মতো শিক্ষিতা না হতে পারে কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাদের মধ্যে আসতে চাও না? তুমি বলেছ — চুঝানিন তোমাকে চরিত্রভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল — কিন্তু চুঝানিনটা তো একটা অধঃপতিত লোক, ও যোদ্ধা নয়। তুমি বলেছ, কমরেডরা নাকি তোমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে নি। কিন্তু তুমিই বা কেন সেদিন ওরকম বড়লোকদের নাচের আসরে যাবার মতো পোশাক পরেছিলে? দোষটা তোমারই ঠুনকো আত্মাভিমানের: আর-সবাই পরছে বলেই আমাকেও এই পুরনো নোংরা ফৌজী কোর্তা পরতে হবে কেন? — এই রকম ভেবেছিলে তুমি। একজন শ্রমিককে ভালবাসার সাহস তোমার ছিল — কিন্তু তুমি একটা আদর্শকে ভালবাসতে পারছ না। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, তোমাকে নিয়ে ভাল কথাই মনে রাখতে চাই।'

আর কিছু বলল না পাভেল।

পরের দিন পাভেল রাস্তায় দেখতে পেল আঞ্চলিক 'চেকা' কমিটির সভাপতির একটা নির্দেশ লটকানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে — তাতে নাম-সই করা আছে — ঝুখ্‌রাই। তার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। অনেক হাঙ্গামার পর সে সেই জাহাজীর দপ্তরে ঢুকতে পেল। সান্ত্রীরা কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। ফলে, পাভেল এমন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল যে প্রায় গ্রেপ্তার হয় আর-কি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেল সে।

ফিওদর তাকে আন্তরিক খুশির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। তার একটা হাত কাটা

গেছে — গোলা লেগে উড়ে গিয়েছিল হাতখানা। ওদের কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ কাজের আলোচনায় মোড় নিল।

'ফ্রণ্টে ফিরে যাবার জন্যে উপযুক্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তুমি আমাকে এখানকার প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাত করার কাজে সাহায্য করতে পারো। কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও,' বলল ঝুখ্রাই।

* * *

পোলিশ শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। লাল ফৌজ শত্রুপক্ষকে প্রায় একেবারে ওয়ারশ'এর দেয়াল পর্যন্ত হঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বৈষয়িক আর শারীরিক শক্তি কমে আসায় এবং রসদ জোগান দেবার ঘাঁটি অনেক পেছনে পড়ে থাকায় তারা পোলিশদের এই শেষ ঘাঁটিটা দখল করে নিতে পারে নি। তাই তারা ফিরে এসেছে। ওয়ারশ থেকে লাল ফৌজের এই পিছিয়ে আসার ব্যাপারটাকে পোলিশরা নাম দিয়েছে 'ভিস্টুলার অলৌকিক ঘটনা'। এর ফলে, অভিজাতদের করায়ত্ত পোল্যাণ্ড আরও কিছুদিনের মতো আয়ু ফিরে পেল — পোলিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন কার্যকরী করে তুলতে কিছুটা দেরি থেকে গেল।

রক্তাক্ত দেশ এখন খানিকটা বিশ্রাম চায়।

পাভেল তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল না, কারণ শেপেতোভ্কা আবার পোলিশদের দখলে চলে গেছে এবং সেটা সাময়িকভাবে একটা সীমান্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তি-আলোচনা চলছে। 'চেকা'র জন্য নানান ধরনের কাজে পাভেলের দিনরাত্রি কাটছে। থাকল ঝুখ্রাইয়ের ঘরে। তার নিজের শহর পোলিশদের দখলে চলে গেছে শুনে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ঝুখ্রাইকে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন যদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে আমার মা কি সীমান্তের অন্য দিকে পড়ে যাবে?'

ফিওদর তার ভয় দূর করল, 'খুব সম্ভব গোরিন নদীটার গতিপথ ধরে সীমান্ত নির্দিষ্ট হবে। তার মানে, তোমাদের শহরটা আমাদের এলাকার মধ্যে পড়বে। যাই হোক, খুব শিগগিরই জানতে পারব আমরা।'

পোলিশ সীমান্ত থেকে দক্ষিণে ডিভিশনের পর ডিভিশন চালান করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, ওদিকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যখন পোলিশ সীমান্তে তার সমস্ত মনোযোগ সংহত করেছে, তখন ভ্রাঙ্গেল এদিকে এই বিরতির সুযোগে ক্রিমিয়ায় তার গোপন ঘাঁটি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে নীপারের ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে তার অব্যবহিত লক্ষ্য ইয়েকাতেরিনস্লাভ এলাকা দখল করবার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

পোলিশদের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ায় সোভিয়েত সরকার প্রতিবিপ্লবীদের এই শেষ ঘাঁটিটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য অবিলম্বে ফৌজ পাঠিয়ে দিল ক্রিমিয়ায়।

ট্রেন-ভর্তি সৈন্যদল, ঠেলা-গাড়ি, রান্নার সরঞ্জাম আর কামান দক্ষিণ দিকে যাবার পথে কিয়েভের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে যানবাহন-চলাচলের জন্য যে 'চেকা' আছে তারা ইদানীং প্রাণপণে পরিশ্রম করছে। যানবাহন-চলাচল অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে চলাচল একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সেসব দিনরাত নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। স্টেশনগুলোয় সব ট্রেন আটকে আছে, খালি লাইন পাওয়া না যাওয়ায় চলাচল প্রায়ই বন্ধ থাকছে। কোন না কোন ডিভিশনের চলার পথ পরিষ্কার করে দেবার হুকুম দিয়ে টেলিগ্রাফ-অপারেটররা অসংখ্য জরুরী তার পাঠাচ্ছে টরে-টক্কা শব্দে। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মধ্যে থেকে ফুটকি আর ড্যাশ্ চিহ্নিত অন্তহীন লম্বা কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসছে — প্রত্যেকটাই সর্বাগ্রে বিবেচনার জন্য দাবি জানাচ্ছে, 'অন্য সবকিছুর আগে এটা করা চাই... এটা সামরিক হুকুম... অবিলম্বে পথ পরিষ্কার করে দাও...'। প্রায় প্রত্যেকটা তারবার্তাতেই একবার করে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই হুকুম না মানা হলে দোষীদের বিপ্লবী সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হবে।

যানবাহন বিনা বাধায় চলাচলের দায়িত্ব পড়েছে স্থানীয় পরিবহন সংক্রান্ত 'চেকা'র উপর।

বিভিন্ন সৈন্যদলের অধিনায়করা অনবরত 'চেকা'র সদর দপ্তরে রিভলভার বাগিয়ে ঢুকে পড়ে দাবি জানাচ্ছে যে ফৌজের সর্বাধিনায়কের সই করা অমুক নম্বরের টেলিগ্রাম অনুযায়ী তাদের ট্রেনগুলোকেই আগে রওনা করে দেওয়া হোক।

সেটা করা যে অসম্ভব — এ কৈফিয়ত শুনতে কেউই রাজি নয়, 'আমাদের ট্রেনটা রওনা করে দিতেই হবে — তা করতে গিয়ে যদি তোমাদের কলিজা ফেটেও যায়, তবুও!' এবং একদমক ভীষণ গালাগাল বেরিয়ে আসছে তারপর। বিশেষ গুরুতর ব্যাপারগুলোয় ঝুখ্রাইয়ের জরুরী তলব পড়ে। তখন এই সব উত্তেজিত মানুষগুলো — যারা পরস্পরকে ওইখানেই যেন গুলি করে মারবার জন্য তৈরি — তারা শান্ত হয়ে পড়ে।

এই লৌহদৃঢ় মানুষটির শান্ত আর বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার স্বরের কাছে কোন আপত্তি টেকে না — তার উপস্থিতির ফলেই খাপের মধ্যে রিভলভারগুলো ফের ঢুকে যায়।

মাথার মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে পাভেল অফিস থেকে টলতে টলতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে আসে। 'চেকা'র কাজে তার স্নায়ুর ওপরে ভয়ানক রকম চাপ পড়ছে।

একদিন সে হঠাৎ একটা গুলি-গোলার বাক্সে বোঝাই ছাদখোলা গাড়ির ওপরে

সের্গেই ব্রুঝাককে দেখতে পেল। সের্গেই গাড়িটার ওপর থেকে লাফিয়ে পাভেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় তাকে চিৎপাত করে ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে।

'পাভ্‌কা, ওরে শয়তান! তোর ওপর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছি — এ তুই ছাড়া আর কেউ নয়।'

এই দুই তরুণ বন্ধুর মধ্যে এত কথা বলার আছে যে কোথা থেকে তারা শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। ওদের দু'জনের শেষ দেখা হবার পর কত কী ঘটে গেছে! পরস্পরকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওরা কথা বলে যেতে লাগল। ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ তাদের কানে যায় নি। ট্রেনটা যখন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য চলা শুরু করেছে, তখন মাত্রই ওরা আলিঙ্গনমুক্ত হল।

তখনও তাদের অনেক কথা বলতে বাকি ছিল পরস্পরকে। কিন্তু ট্রেনটা ক্রমশই দ্রুতগতি নিচ্ছে। সের্গেই তার বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে কী একটা বলে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে ছুটতে ছুটতে একটা মাল-কামরার খোলা দরজা ধরে ফেলল। ভেতর থেকে কয়েকটা হাত বেরিয়ে এসে তাকে ধরে টেনে তুলে নিল ভেতরে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাভেলের মনে পড়ল, ভালিয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে সের্গেই কিছুই জানে না। কারণ, শেপেতোভ্‌কা ছাড়ার পর ও আর সেখানে যায় নি — আর, আজকের এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার এই সময়টুকুর মধ্যে পাভেলেরও সে কথাটা বলতে ভুল হয়ে গেছে।

পাভেল ভাবল, 'না-জানাটাই ভাল। ওর মনের শান্তি তাতে বজায় থাকবে।' সে জানত না যে বন্ধুর সঙ্গে আর কোনদিন তার দেখা হবে না। শরতের বাতাসের দিকে বুক-খোলা অবস্থায় গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সের্গেইও জানত না যে সে তার মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে।

দরোশেঙ্কো নামে একজন লাল ফৌজের সৈন্য সের্গেইকে তাড়া দিল, 'ওখান থেকে নেমে এসো, সেরিওঝা।' — দরোশেঙ্কোর গায়ে একটা কোট যার পেছন দিকটা পুড়ে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

হেসে বলল সের্গেই, 'ঠিক আছে, বাতাসের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে।'

এক সপ্তাহ বাদে প্রথম লড়াইয়ের দিনেই একটা এলোপাতাড়ি বুলেট এসে সের্গেইয়ের বুকে বিঁধল।

টলতে টলতে একটু এগোল, যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে গেল বুকটা, শূন্যে কী যেন মুঠো করে ধরবার চেষ্টা করল, তারপর বুকে হাতদুটো জোরে চেপে ধরে কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেল সে মাটির ওপর ভারি একটা বোঝার মতো। ইউক্রেনের সীমাহীন স্তেপভূমির দিকে তার দৃষ্টিহীন নীল চোখদুটি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

* * *

'চেকা'র স্নায়ুপেষা কাজকর্ম পাভেলের দুর্বল শরীরের ওপরে দারুণ একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। সেই পুরোন ক্ষতের জন্য প্রচণ্ড মাথাধরাটা তার ক্রমশই বাড়ছে। একবার একাদিক্রমে দু'রাত্রি জাগার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর তবেই সে ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করবে বলে ঠিক করল।

'তোমার কী মত, ফিওদর — আমি যদি অন্য কোন কাজে লাগার চেষ্টা করি, তাহলে কেমন হয়? আমার নিজের সবচেয়ে পছন্দ রেল-কারখানায় আমার নিজের কাজটাই করি। ভয় হচ্ছে — আমার মাথার মধ্যে কী যেন গোলমাল হয়েছে। চিকিৎসা কমিশনে ওরা আমাকে ফৌজের কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কাজ ফ্রন্টে লড়াইয়ের কাজের চেয়েও খারাপ। এই দু'দিন ধরে সুতির-এর ডাকাত-দলটাকে পাকড়াও করতে গিয়ে আমার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই সব মারামারির কাজ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই কিছুদিনের জন্যে। দেখতেই পাচ্ছ ফিওদর, আমি যদি খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই না পারি তাহলে আর তোমার কী কাজে লাগব বল?'

উদ্বেগভরা চোখে ঝুখ্‌রাই পাভেলের মুখখানা ভাল করে দেখল।

'হ্যাঁ, তোমাকে বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না। আমারই দোষ। অনেক আগেই আমার তোমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বড্ড ব্যস্ত ছিলাম বলে লক্ষ্য করি নি।'

এই কথাবার্তার অল্পকিছু পরেই পাভেল কমসমোলের আঞ্চলিক কমিটিতে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা কাগজ — যাতে বলা হয়েছে যে তাকে কাজ দেবার জন্য কমিটির কাছে পেশ করা হল।

টুপিটা কায়দা করে প্রায় নাকের ওপর ঠেলে দেওয়া একটি ছেলে কাগজটার ওপরে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধূর্তভাবে বলল, ' 'চেকা' থেকে আসছ, অ্যাঁ? ভারি ফুর্তির ওই সংগঠনটা। এখানে আমরা তোমার জন্যে এক্ষুনি কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি। ছেলেদের আমাদের দরকার। কোথায় যেতে চাও তুমি? খাদ্য জন-কমিশারিয়েট? না? আচ্ছা, তাহলে জাহাজ-ঘাটায় প্রচার-আন্দোলনের বিভাগ সম্বন্ধে কী মনে কর? তাও না? তাহলে তো মুশকিল হল। ওখানকার কাজটা সুবিধের — আলাদা বিশেষ রেশনও পাওয়া যায়।'

পাভেল তার কথায় বাধা দিল।

'আমি রেলওয়ের মেরামত কারখানাটায় যেতে চাই,' বলল সে।

'রেলওয়ে কারখানায়?' হাঁ হয়ে গেল ছেলেটির মুখ, 'হুম্... সেখানে আমাদের

কাউকে দরকার পড়বে বলে আমার মনে হয় না। তবে, তুমি উস্তিনোভিচের কাছে একবার যাও। সে তোমাকে একটা কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবে।'

ঘোর রঙের এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার পর অল্পক্ষণ কথাবার্তার শেষে ঠিক হয়ে গেল, পাভেল রেলওয়ে কারখানায় কাজ করবে আর সেখানকার কমসমোল সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হবে।

* * *

ইতিমধ্যে শ্বেতরক্ষীরা ক্রিমিয়ার প্রবেশপথটায় জড়ো হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এককালে এই সরু ভূখণ্ডটি ছিল ক্রিমিয়ার তাতার আর জাপোরোঝিয়ে-কসাকদের বাসভূমির মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা — এখন এটা আধুনিক সশস্ত্র সৈন্যব্যূহে সাজানো পেরেকপ্-এর ফ্রন্ট।

এই ক্রিমিয়াতেই পেরেকপের পেছনে গোটা দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে পুরনো দুনিয়াটা, তার বিনাশ অবধারিত; এখানে নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবে তারা মদের নেশায় চুর হয়ে হুল্লোড় করে বেড়ায়।

শরতের এক শীতার্ত স্যাঁতসেঁতে রাত্রে শ্রমজীবী মানুষের হাজার হাজার সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল সিভাশের হিম-শীতল জলের বুকে — অন্ধকারের আড়ালে প্রণালীটা পার হয়ে এসে দুর্গের ভেতরে সুরক্ষিত হয়ে অবস্থিত শত্রুকে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন ইভান ঝার্কি — মেশিনগানটা যাতে জলে ভিজে না যায় তার জন্য সেটাকে মাথার ওপরে তুলে ধরে সে জল কেটে চলেছে।

তারপর, ভোরবেলায় পেরেকপের উপর যখন মরিয়া সংগ্রাম শুরু হয়েছে, সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ চলেছে দুর্গের উপর, তখন সিভাশ্ প্রণালী পার হয়ে আসা প্রথম দলটি লিতোভ্স্কি উপদ্বীপের ওপর তীরে উঠে পড়েছে শ্বেতরক্ষীদের পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য। এবং প্রথম যারা টেনে-হেঁচড়ে পাথুরে ডাঙাটায় এসে উঠেছে, তাদের মধ্যে ইভান ঝার্কি একজন।

এরকম হিংস্র লড়াই আগে কখনো হয় নি। জল থেকে উঠে আসা লাল ফৌজের সৈন্যদের ওপর বর্বর নির্মমতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্বেতরক্ষী ঘোড়সওয়াররা। ঝার্কির মেশিনগান অনর্গল মৃত্যু উদ্গিরণ করে চলল একবারও না থেমে। সীসের বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়া আর মানুষের দেহের স্তূপ জমে উঠল। দ্রুত ক্রমান্বয়ে নতুন গোলার মালা পরিয়ে নিচ্ছে ঝার্কি তার মেশিনগানে।

শত শত কামানের গোলার আওয়াজে পেরেকপ্ গর্জন করে উঠল। গোটা পৃথিবীটাই যেন একটা অতল গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার মৃত্যুবাহী গোলার কান-ফাটানো আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে আকাশকে, গোলাগুলো বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে ফেটে পড়ছে। ছিন্নভিন্ন মাটি কালো মেঘ হয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে।

বীভৎস জানোয়ারটার মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। ক্রিমিয়ার ভেতরে বয়ে চলল এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লাল বন্যা — ওরা চলেছে শেষ অমোঘ আঘাতটা হানবার জন্য। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা শ্বেতরক্ষীরা আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলল বন্দর ছেড়ে-যাওয়া জাহাজগুলোয় চাপবার জন্য।

লাল ফৌজের বহু ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তার গায়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার সোনার 'লাল পতাকা অর্ডার' আটকে দিল। ওই কোর্তাগুলির মধ্যে একটা কোর্তা — কমসমোলের মেশিনগান-গোলন্দাজ ইভান ঝার্কির।

* * *

পোলিশদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়ে গেল এবং ঝুখ্রাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেপেতোভ্কা সোভিয়েত ইউক্রেনেই থেকে গেল। শহর থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে একটা নদী এখন সীমান্তের চিহ্ন।

১৯২০-র ডিসেম্বরের এক স্মরণীয় সকালে পাভেল তার নিজের শহরে ফিরে এল। বরফে ঢাকা প্ল্যাটফর্মটার ওপরে নেমে সে একনজর তাকাল 'শেপেতোভ্কা-১' লেখা সাইনবোর্ডটার দিকে। তারপর বাঁয়ে ঘুরে সোজা স্টেশনের ডিপোয় গিয়ে আরতিওমের খোঁজ করল। কিন্তু তার দাদা সেখানে নেই। গায়ের ওপরে সামরিক কোটটা আঁট করে নিয়ে পাভেল বনের মধ্যে দিয়ে শহরের দিকে চলল।

দরজায় ঘা পড়তে মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনা উঠে বলল, 'ভেতরে আসুন।' দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটা বরফে ঢাকা মূর্তি — মা তার ছেলের প্রিয় মুখখানা দেখতে পেল। হাতদুটো বুকের ওপর চেপে ধরল সে। আনন্দের আচ্ছন্নতায় সে মুখের কথা হারিয়ে ফেলেছে।

ছেলের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল সে তার মুখ। গাল বেয়ে ঝরে পড়ল আনন্দের অশ্রু।

আর পাভেল সেই হালকা ছোট্ট দেহখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মায়ের দুশ্চিন্তার ছাপ-ধরা, কষ্টের আর উদ্বেগের বলি-চিহ্নিত মুখের দিকে। তার শান্ত হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে।

অনেক কষ্ট সয়েছে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা। এবার আবার তার চোখের দৃষ্টিতে সুখের উজ্জ্বলতা ফিরে এল। যে ছেলেকে আর কোনদিন দেখতে পাবার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, সেই ছেলে আবার ফিরে আসায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন তার আশ মেটে না। তিন দিন পরে একদিন গভীর রাত্রে কাঁধের ওপর সৈনিকের বোঁচকাটা বেঁধে যখন আরতিওমও ফিরে এসে ছোট্ট ঘর-খানাকে ভরাট করে তুলল, তখন মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনার সুখের আর সীমা রইল না।

করচাগিন পরিবার এতদিনে আবার পুনর্মিলিত হয়েছে। দুই ভাই-ই মৃত্যুকে এড়িয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। নিদারুণ কষ্ট আর নানান পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে তারা।

মা তার ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবি তোরা?'

হালকা সুরে আরতিওম জবাব দিল, 'আমি আবার ওই রেল-কারখানাতেই গিয়ে ঢুকব, মা!'

আর পাভেল দু'সপ্তাহ বাড়িতে কাটানোর পর কিয়েভে ফিরে গেল — সেখানে কাজ পড়ে রয়েছে তার।

প্রথম ভাগ শেষ

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

বাড়ি নম্বর ৩৩, সী – ১৪

তাশখন্দ – ৭০০০১১

সোভিয়েত ইউনিয়ন

"Raduga" Publishers
House No. 33, C-14
Tashkent—700011
Soviet Union

ইস্পাত আরও, আরও মজবুত করে তোলা হয় আগুনের পোড় খাইয়ে-খাইয়ে... কিন্তু, মানুষের চরিত্র? কী করে মানুষের চরিত্র আরও, আরও মজবুত করে তোলা যায়, যাতে সে-চরিত্র হবে ইস্পাতের চেয়ে দৃঢ়, বিপদে অবিচলিত, বন্ধুত্বে নির্ভরযোগ্য, আর ভালবাসায় একনিষ্ঠ?

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির 'ইস্পাত' উপন্যাসখানায় তার উত্তর আছে।

উপন্যাসখানির বেশির ভাগ চরিত্রই সত্য, বাস্তব জীবনের প্রতিকৃতি। প্রধান চরিত্র পাভেল করচাগিন হলেন লেখক নিজেই।

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির জীবন (১৯০৪—১৯৩৬) ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু বীরত্বপূর্ণ। গৃহযুদ্ধে ভীষণভাবে আহত এই যুবক বিশ বছর বয়সেই অন্ধ হয়ে যেতে থাকলেন, তাঁর চলৎশক্তিহীনতা অবধারিত হয়ে গেল। আর সেই অবস্থায়ই তিনি লিখলেন এই চমৎকার বইখানি, — যৌবন, ভালবাসা আর সংগ্রাম, এবং প্রথম যুগের সোভিয়েত কমসমোল তরুণ-তরুণীদের জীবন নিয়ে এই উপন্যাসখানি। উপন্যাসখানির রচনাই হল মহৎ মানবিক কীর্তি।

বইখানা লেখা শেষ হলে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন, 'এবার বেরিয়ে পড়েছি লৌহকঠোর বেষ্টনীর ভিতর থেকে... এখন আমি আবার এসে দাঁড়িয়েছি যোদ্ধাদের সারিতে।'

সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচক সেমিয়ন ত্রেগুবের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির সঙ্গে, — এই বইয়ে ত্রেগুবের লেখা ভূমিকা থেকে পাঠক অস্ত্রভ্স্কির সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

'রাদুগা' প্রকাশন · তাশখন্দ

ISBN 5-05-000723-2
ISBN 5-05-000724-0